সাজাহান

নাটক

[ভূমিকা, আলোচনা ও টীকা সহ]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার
এম. এ., ডি-ফিল,
কর্তৃক সম্পাদিত
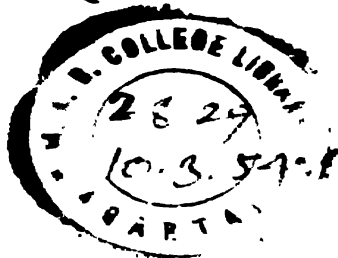
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ বিধান সরণী • কলিকাতা-৬

ভূমিকা

নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

সাজাহানের রাজত্বকাল সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধিময়। ১৬৫৭ সালের ৭ই মার্চ তাঁর রাজত্বের ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হল। সম্রাট কৃষকের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছেন, অত্যাচারী শাসনকর্তাকে স্থানান্তরিত করেছেন, দয়ালু এবং বিবেচক বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন। রাজ্যের আয়তন এর পূর্বে কখনও এত বিস্তৃত ছিল না। বোখারা, পারস্য, তুর্কী ও আরব দেশ থেকে রাজদূতেরা, ফ্রান্স ও ইটালী থেকে পর্যটকেরা এসে মুগ্ধ বিস্ময়ে ময়ূর সিংহাসন, কোহিনূর ও অপর রত্নরাজি দেখে শতমুখে প্রশংসা করেছেন। রাজসভায় গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ সাজাহানের (১৬৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী তিনি ৬৭টি চান্দ্র বৎসর অতিক্রম করেছেন) রাষ্ট্রীয় জীবনের বহু সুখদুঃখের স্মৃতির সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক ছিল নিবিড় তাঁরা একে একে চোখের সামনে পরপারে যাত্রা করেছেন। নিজের মৃত্যুর পরে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ কী হবে এ নিয়ে সাজাহানের দুশ্চিন্তা ছিল এবং দুশ্চিন্তার কারণ ছিল।

৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে মূত্রকৃচ্ছ্র ও কোষ্ঠ কাঠিন্যে সাজাহান অকস্মাৎ গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সপ্তাহকাল হকিমেরা বৃথা চেষ্টা করলেন, তাঁর পাদুটি ফুলে গেল। প্রাত্যহিক দরবার বন্ধ হল। দেহলী থেকে প্রজাদের দর্শন দানও সাধ্যের বাইরে চলে গেল। এক সপ্তাহ পরে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম দেখা গেল এবং তাজমহল চোখের সামনে

রেখে আগ্রা দুর্গে শান্তিতে মারা যেতে পারবেন ভেবে তিনি আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং ২৬শে অক্টোবর পুরী প্রবেশ করলেন।

রোগশয্যায় জ্যেষ্ঠপুত্র দারা একান্ত যত্নে অনুক্ষণ তাঁর শুশ্রূষা করে। রোগমুক্তি সম্পর্কে নিরাশ্বাস সাজাহান একদিন পদস্থ রাজকর্মচারীদের ডেকে তাঁদের সামনে তাঁর শেষ উইল করেন এবং অতঃপর দারাকে তাঁদের প্রভু বলে সম্মান করতে আদেশ করেন। দারা কিন্তু পিতার জীবৎকালে তাঁর এই আদেশ সত্ত্বেও সম্রাটের পদ গ্রহণ করেন নি; রাজকীয় আদেশ পিতার নামেই তিনি প্রচার করেন।

নভেম্বরের মাঝামাঝি সাজাহান কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। রাজ্যের যে সব সংবাদ তাঁর অসুস্থতার জন্য এযাবৎ তাঁকে দেওয়া হয়নি এইবার সেগুলি তাঁর কর্ণগোচর করা হতে লাগলো। প্রথমেই যে খবরগুলি শুনলেন সেগুলির একটি এই যে সুজা বাংলাদেশে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছে এবং আগ্রার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ৩০শে নভেম্বর দারার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শুকোহ ও মির্জা রাজা জয়সিং-এর বাইশ হাজার সৈন্য সাজাহানের সম্মতি নিয়ে সুজার বিরুদ্ধে প্রেরিত হল। এর পরে খবর এল ৫ই ডিসেম্বর গুজরাটে মোরাদ সম্রাট বলে নিজেকে ঘোষণা করেছে এবং ঔরংজীবের সঙ্গে সখ্য-মূলক সামরিক চুক্তিতে লিপ্ত হয়েছে। আগ্রা থেকে মালব অভিমুখে দুটি বাহিনী প্রেরিত হল। একটির অধিনায়ক যশোবন্ত সিং। দাক্ষিণাত্য থেকে অভিযানকারী ঔরংজীবের গতি তিনি রুদ্ধ করবেন। দ্বিতীয়টির অধিনায়ক করা হল কাশিম খাঁকে। মোরাদকে গুজরাটের শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারিত করে তিনিই সেখানে নোতুন শাসনকর্তা হবেন।

পুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্বন্ধে সাজাহান মনে মনে স্নেহবশতঃ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। "Shah Jahan besought these generals to spare the lives of his younger sons, to try at first to send them

back to their provinces by fair words if possible, otherwise by a demonstration of force, and not, except in extreme need, to resort to a deadly battle."

১৬৫৮ খৃস্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী মোরাদ আহমদাবাদ থেকে যাত্রা করে মালবের দিপালপুরে ১৪ই এপ্রিল ঔরংজীবের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হল। ১৫ই এপ্রিল ধর্মাটের যুদ্ধে ঔরংজীবের জয় হল। কাশিম খাঁ যুদ্ধের সময় বরাবর তার সৈন্য নিয়ে গা বাঁচিয়ে চলল এবং যুদ্ধের অবস্থা প্রতিকূল দেখে যথাসময় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল।

ঔরংজীবকে দ্বিতীয় যুদ্ধ করতে হল দারার সঙ্গে আগ্রার নিকটে সামূগড়ে। এই যুদ্ধে (২৯শে মে ১৬৫৮) দারা পরাজিত হল। (বিস্তারিত বিবরণ টীকায় দ্রষ্টব্য।) দারা মাত্র কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে রাত ৯ টায় আগ্রা শহরে পালিয়ে এসে তার নিজের বাড়িতে উঠল। সাজাহানের সঙ্গে পরাজয়ের লজ্জায় দেখা করল না এবং রাত ৩টায় দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করল,—সঙ্গে স্ত্রী পুত্র কন্যা ও জনা বারো অনুচর এবং খচ্চরের পিঠে বোঝাই নিজের ধনরত্ন এবং সাজাহানের অশ্রুসিক্ত আশীর্বাদের সঙ্গে প্রেরিত স্বর্ণমুদ্রারাশি।

সামুগড়-যুদ্ধের পরের দিনই, সম্রাটবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছে বলে অনুতাপ ও ক্ষমাপ্রার্থনা জানিয়ে ঔরংজীব সাজাহানকে একখানি পত্র লেখে। যুদ্ধের দু'দিন পরে নূর মঞ্জিলের বাগানে এসে ঔরংজীব দশদিন অবস্থান করে। হাওয়া কোনদিকে বইছে লক্ষ্য করে সম্রাটের বহু সভাসদ ও কর্মচারী এখানে এসে ঔরংজীবের পক্ষে যোগ দেয়। এখানেই সাজাহানের স্বহস্ত-লিখিত উত্তরপত্র তার হস্তগত হল। পত্রে আগ্রাদুর্গে সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ঔরংজীবের বন্ধুরা, বিশেষ করে শায়েস্তা খাঁ ও খলিলুল্লা, ঔরংজীবকে নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে দিল না। যুক্তি দেখালো, আগ্রাদুর্গে প্রবেশ-

কালেই সাজাহানের দুর্ধর্ষ তাতার রক্ষি-রমণীরা তাকে খুন করে ফেলবে। সাজাহান ও ঔরংজীবের জীবনে আর সাক্ষাৎকার ঘটেনি।

৩রা জুন জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ সুলতানকে আগ্রা শহর দখল করতে পাঠিয়ে ৫ই জুন ঔরংজীব আগ্রাদুর্গ অবরোধ করল। সাজাহান দুর্গদ্বার রুদ্ধ করে অবরোধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সেকালে যে'কটি অতি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল আগ্রাদুর্গ তাদের অন্যতম। ঔরংজীবের গোলন্দাজ বাহিনীর কয়েক মাসের, এমন কি বৎসরের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে এমন দুর্গ। অবরুদ্ধ থেকে কালহরণ করা এই ভরসায় যে ইতোমধ্যে দারা নোতুন সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে কিন্তু অবরোধ স্থায়ী হল মাত্র ৩ দিন। যমুনা থেকে দুর্গের জল সরবরাহ হত, ঔরংজীব সরবরাহ-নালীর মুখ বন্ধ করে দিলেন। দুর্গমধ্যে যে কয়েকটি পুরাতন কূপ ছিল তার জল বিবর্ণ কটু অপেয়। দুর্গরক্ষী-দের দলে ভাঙন ধরল। সম্রাট বার্ধক্যের ও পিতৃত্বের অভিমান নিয়ে ঔরংজীবকে পত্র লিখলেন। লিখলেন, হিন্দুরা মৃত পিতাকেও জল দেয়, তুমি মুসলমান হয়ে তোমার জীবিত পিতাকে জল থেকে বঞ্চিত করবে? উত্তর এল, এ আপনার স্বকৃত কর্মেরই ফল। ৮ই জুন, চারিদিকে যখন বিদ্রোহ বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৃষ্ণার্তের হাহাকার অসহ হল তখন সাজাহান দুর্গদ্বার খুলে দিলেন। বিজয়ী সৈন্যদল দুর্গে প্রবেশ করল, সাজাহান আপন প্রাসাদে বন্দী হলেন। আগ্রাদুর্গে বহুকাল সঞ্চিত ধনরত্ন ঔরংজীবের আয়ত্ত হল। ১০ই জুন জাহানারা ঔরংজীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সম্রাটের পুত্রগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবিভাগের একটা প্রস্তাব করে গৃহযুদ্ধের শান্তিপূর্ণ অবসানের চেষ্টা করল। বিজয়ী ঔরংজীব সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করল না।

রাজাধিরাজের দাসত্বের জীবন শুরু হল। দারা ও সুজার কাছে লেখা তাঁর পত্র দুর্গ পার হতে পারল না। পত্রবাহকেরা কঠিন শাস্তি

পেল। সাজাহানের কাছ থেকে লেখবার উপকরণ সরিয়ে নেওয়া হল। ঔরংজীবের লোকেরা তাঁকে ঘিরে রইল। বন্দী দশার প্রথম বৎসর পিতা-পুত্রে বহু পত্র-বিনিময় ঘটেছে। সাজাহান ঔরংজীবের অমার্জনীয় অপরাধের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন, ঔরংজীব স্বপক্ষ-সমর্থনে সাজাহানের রাজ্যশাসনকে অপশাসন ও কাফের দারার প্রভুত্ব বলে আখ্যাপিত করেছে এবং বলেছে যে তার থেকে প্রজাদের মুক্তি দিয়ে সে মহৎ কর্তব্য পালন করেছে।

রাজমুকুটের মণিরত্ন এবং দারার স্ত্রীদের ও কন্যাদের ২৭.লক্ষ টাকার অলঙ্কার আগ্রা দুর্গে রক্ষিত ছিল, শেষ পর্যন্ত ঔরংজীবের হাতে তা তুলে দিতে হল। সম্রাটের পোষাক-পরিচ্ছদ, বহুমূল্য তৈজস, আসবাবপত্র সব কিছু সাজাহানের অধিকার থেকে বাজেয়াপ্ত হল। আগ্রা দুর্গ থেকে মহম্মদ সুলতানের চলে যাবার পর খোজা মুতামদ হল সর্বেসর্বা। পীড়নে ছিল তার আনন্দ। সম্রাট ক্রীতদাসের মত ব্যবহার পেতে লাগলেন। বিলাস-প্রিয় সম্রাটকে পরতে দেওয়া হল শক্ত চামড়ার দু'টাকা দামের জুতো! একে একে বুকভাঙা খবর এসে পৌঁছতে সুরু করল। প্রথমে দারা শুকোহ্ (৩০শে আগস্ট, ১৬৫৯), তার পরে মোরাদ বক্স (৪ঠা ডিসেম্বর ১৬৬১), তার পরে সুলেমান শুকোহ্ (মে, ১৬৬২) নিহত হয়েছে। বন্য মগদের রাজ্যে গিয়ে সুজা সপরিবার বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে। এই দুর্দিনে তাঁকে রক্ষা করেছে তাঁর মাতৃসমা কন্যা জাহানারার সান্ত্বনা ও অক্লান্ত শুশ্রূষা এবং সর্বোপরি তাঁর ধর্মচিন্তায় আত্মনিয়োগ। প্রার্থনা, কোরাণ পাঠ, মহাপুরুষদের জীবনকথা শ্রবণে তাঁর সমস্তটা দিন তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর নির্ভরস্থল ছিলেন তার নিয়ত সঙ্গী কনৌজের ধর্মপ্রাণ সৈয়দ মহম্মদ।

জীবন্মৃতবৎ যে-মুক্তির অপেক্ষায় সুদীর্ঘকাল সাজাহান দুঃখভোগ করেছেন, বিস্ময়কর প্রশান্তি নিয়ে দিবস গণনা করেছেন, সেই মুক্তি এল।

১৬৬৬ সালের ৭ই জানুয়ারী তাঁর জ্বর হল। আগ্রার প্রবল শীতে চুয়াত্তরটি চান্দ্র বৎসর উত্তীর্ণ তাঁর ক্ষীণ দেহ থেকে জীবনীশক্তি একেবারেই অন্তর্হিত হল। ২২শে জানুয়ারী, যখন বুঝলেন সময় আর নেই, তখন শেষ উইল করলেন এবং দাস-দাসী অন্তঃপুরিকা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে প্রত্যেককে নিজের স্মারক কিছু যা ছিল দান করলেন। অন্তঃ-পুরিকাদের ভার জাহানারার হাতে তুলে দিলেন। তার-পরে সমবেত সকলের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে কোরাণ পাঠ শ্রবণ করতে করতে শেষ প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করে তাজমহলের দিকে চোখ রেখে শেষ পর্যন্ত অপ্রতিহত চৈতন্যে জাগরূক থেকে রাত্রি ৭টা ১৫ মিনিটে জীবন-জ্বর থেকে সাজাহান মুক্তি লাভ করলেন।

আগ্রা দুর্গের তোরণ পথে তাঁর শবদেহ নিষ্ক্রান্ত হল না। দুর্গ-মিনারের নিচের একটা দরজা দেয়াল গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সাজাহানের বন্দীদশায়। সেই দেয়াল ভেঙ্গে শব নিয়ে নৌকাযোগে যমুনা পার হয়ে তাজমহলের নিচে মমতাজের সমাধির পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হল। এ সংবাদ যখন লোক শুনল তখন তাঁর দোষ ত্রুটি ভুলে তাঁর গুণ ব্যাখ্যা করে আগ্রার আপামর জনসাধারণ শোক প্রকাশ করতে লাগল।

সাজাহানের মৃত্যুর প্রায় এক মাস পরে ঔরংজীব এসে জাহানারার সঙ্গে দেখা করে। অবশ্য জাহানারার সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহারই সে করেছে। সাজাহানের মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বে তাঁকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে ঔরংজীবকে মার্জনা জানিয়ে লেখা একখানা পত্রে তাঁকে স্বাক্ষর করায়। পত্রখানি জাহানারা ঔরংজীবকে দিল। একদিন জীবিত সাজাহানের স্বাক্ষর না দারার স্বাক্ষর—এই নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষায় আগ্রা থেকে প্রেরিত পত্র তার সময় হরণ করেছে। আজ ঔরংজীব একবার ভালো করে দেখল-ও না যে দস্তখতটা স্বয়ং সাজাহানের কি না। এই দস্তখতেই বাইরের জগতে অনেক কাজ দেবে। পাওয়া মাত্র ঔরংজীব মার্জনাপত্র-

খানি পকেটসাৎ করল।—যেন এটা তার নিজেরই আজস্ত মহামূল্য প্রশংসাপত্র।

গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ

বাদশাহী তক্তের উত্তরাধিকার সুনির্দিষ্ট ছিল না। আরব দেশে খলিফারা যোগ্যতার মানদণ্ডে নির্বাচিত হতেন। ভারতের মোগল সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসন পাবে এমন কোন আইন বা নিয়ম ছিল না অথচ আরবে যোগ্যতার মানদণ্ড যে-সম্মান পেত তার দূরস্মৃতি উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন যখনই দেখা দিত তখনই ক্রিয়াশীল হয়ে উঠত। সম্রাট আকবরের শেষ রোগশয্যায় এই কারণেই জাহাঙ্গীর ও তৎপুত্র রাজপুত-সহায় খসরুর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে উঠতে পেরেছিল। অবশ্য তীক্ষ্ণধী আকবর মৃত্যুশয্যায় শয়ান অবস্থায়ও জাহাঙ্গীরের সিংহাসন লাভের পথ নিষ্কণ্টক করে যান। সাজাহানের অসুস্থতার সময়ে যে গৃহযুদ্ধ ঘটে তার অন্যতম কারণ এই অব্যবস্থিত উত্তরাধিকারনীতি।

দারার অদূরদর্শিতা এই যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছে। সাজাহানের অসুস্থতার প্রথম দিকে তার একান্ত বিশ্বস্ত দু'-একজন মন্ত্রী ছাড়া আর কাউকে সাজাহানের কাছে যেতেই দেওয়া হত না। সুজা, ঔরংজীব ও মোরাদের কাছে আগ্রা থেকে চিঠিপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আগ্রার রাজ-সভায় তাদের যে প্রতিনিধিরা ছিল তারাও যাতে চিঠিপত্র না দিতে পারে সে দিকেও দারা দৃষ্টি রেখেছে। যোগাযোগ রক্ষার পথ বন্ধ হবার ফল হল ভয়ঙ্কর। সাজাহানের স্বাক্ষর সম্বলিত মুদ্রাঙ্কিত পত্র অবশ্য প্রেরিত যে হয় নি এমন নয় কিন্তু সাজাহানের স্বাক্ষরের যথাযথ অনুলিপি করবার কাজে দক্ষ দারার স্বাক্ষরিত বলে পত্রগুলিকে গ্রহণ করা হল এবং পত্রে সাজাহানের নামাঙ্কিত মুদ্রা

যে দারার হস্তগত হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রইল না। সাজাহান প্রাণত্যাগ করেছেন এই জনরব সহজেই দৃঢ় হল। জমিদাররা বিদ্রোহী হয়ে উঠল, রাজস্ব আদায় দুরূহ হল, দেশ অরাজক মনে করে দস্যু-তস্কর মাথা তুলে দাঁড়াল। তিন ভ্রাতাই স্বভাবতঃ স্বচক্ষে তাদের পিতার অবস্থা দেখতে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করল এবং কিছু আগে-পরে তিনজনই নিজেদের সম্রাট বলে ঘোষণা করল। শেষ পর্যন্ত যোগ্যতমের যে উত্তরাধিকার নির্বাচন-বলে আরবে স্বীকৃত হত তাই তরবারি মুখে প্রতিষ্ঠিত হল। লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি, অক্লান্তকর্মা, রণকুশল, চক্রী ঔরংজীবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দারা সুজা ও মোরাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে দারা ও ঔরংজীবের পারস্পরিক বিদ্বেষ বহুকালের। দারার ধর্ম বিষয়ে উদার দৃষ্টি এবং ঔরংজীবের নিষ্ঠাবান অথবা গোঁড়া মুসলমানের জীবনদর্শন উভয়কে উভয়ের কাছে অসহ করে তুলেছিল। দারার প্রতি সাজাহানের অতিমাত্র পক্ষপাতিত্ব এই বিদ্বেষের অন্যতম কারণ।

সাজাহানের প্রতি এই কারণেই ঔরংজীব যে অভিযোগ মনে মনে পোষণ করে এসেছে তা আরো বেশি পুষ্ট হয়েছে দাক্ষিণাত্যে দ্বিতীয় বার শাসনকর্তা রূপে প্রেরিত হবার পর। যে জায়গীরগুলি তাকে দেওয়া হল সেগুলি যথেষ্ট উর্বর নয়। ঔরংজীব আপত্তি জানিয়ে এর পরিবর্তে উর্বরতর জায়গীর চেয়ে পাঠাল। সিন্ধুতে যে জায়গীর সে পেয়েছে এখানে তার চেয়ে ১৭ লক্ষ টাকা কম লভ্য হবে, তাই এই আপত্তি। দ্বিতীয়তঃ ঔরংজীবের অনুমোদিত কয়েকটি কর্মচারীর নিয়োগ ও পদোন্নতি সম্রাট বহাল রাখলেন না। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজসভায় মোগল প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি সম্রাট পত্র ব্যবহার না করে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার মধ্যবর্তিতায় আদেশ নির্দেশ

পাঠালে শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খল হয় বলে ঔরংজীব পত্র লিখল। এই অতি যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবও সম্পূর্ণ গৃহীত হল না। ঔরংজীবকে সাজাহান ভুল বুঝলেন, তিরস্কার করলেন, পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা দেখা দিল। এই তিক্ততা কেমন করে বিষময় হয়ে উঠল এবং দারার সঙ্গে ঔরংজীবের মনোমালিন্য-ও ক্রমশঃ ভয়াবহ করে তুলল—কেমন করে গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণে নোতুন শক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল তা জানতে হলে গোলকুণ্ডার সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের বিরোধের ইতিহাস স্মরণ করতে হবে।

সে-যুগে গোলকুণ্ডার রাজধানী হায়দরাবাদ সর্ব এসিয়ার নয়, সমস্ত পৃথিবীর হীরক ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল ছিল। তামাক ও তাড়ি থেকে লভ্য আবগারি শুল্ক এবং বনচর হস্তিযূথ গোলকুণ্ডারাজের সম্পদ হীরক-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুদিন যাবৎ ঔরংজীবের লোভ ও বিদ্বেষের কারণ রূপে অবস্থান করছিল। কিন্তু লুব্ধবাহু-প্রসারের একটা অব্যবহিত রাজনৈতিক কারণ চাই। কৈফিয়ৎ একটা ছিল। গোলকুণ্ডাধিপতি আবদুল্লা কুতুব শা'র মোগলসম্রাটকে প্রদেয় কর বাকি ছিল। এই বাবদ কুড়িলক্ষ টাকা অবিলম্বে বাদশাহী কোষে আদায় দেবার নির্দেশ দেওয়া হল। ঠিক এই সময় উজির মীর জুমলার সঙ্গে কুতুব শার বিরোধ বাধলো। প্রভুকে ছাপিয়ে রাজ্যে তার সম্পত্তি প্রভাব ও প্রতিপত্তি সাধারণ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। কর্ণাটক অভিযানে গিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে সেখানে প্রায় ১৫০০০ বর্গ মাইল ভূমিখণ্ডে সে রাজা হয়েই বসল। দেবমন্দির লুণ্ঠনে ও ভূমিগর্ভ থেকে লুকান ধনরত্ন-ও সে উদ্ধার করল প্রচুর। তার রাজ্যের আয় দাঁড়াল বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকা। কুড়ি মন হীরার সে মালিক। কুতুব শাহ মীর জুমলাকে তলব করল। মীর জুমলা মোগল বাদশাহের শরণ নেবার উদ্দেশ্যে ঔরংজীবের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করল, কুতুব শাহ যখন মীর জুমলাকে শাস্তি দেবার

জন্য তোড়জোড় করছে এমন সময় মীর জুমলার পুত্র আমীন খাঁ এক কাণ্ড করে বসল। কুতুব শা'র দরবারে সে ছিল পিতার প্রতিনিধি। বাপের শক্তি ও টাকা বেড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে যুবকটির মাথা ঘুরে গেল। কুতুব শাহ্‌কে সে প্রকাশ্য দরবারে অমান্য করতে সুরু করেছিল। একদিন মাতাল অবস্থায় এসে রাজার গালিচাই তার পানীয়-বমনে ভাসিয়ে দিল। আমীন খাঁ ও তার পরিবারকে ক্রুদ্ধ কুতুব শাহ্‌ কারাগারে পাঠাল।

এইবার ঔরংজীবের সুযোগ জুটল। সাজাহান ঔরংজীবের পত্রযোগে প্রেরিত পরামর্শে মীর জুমলা ও আমীন খাঁকে মোগল সরকারে কাজ দিয়ে তাদের সে-কাজে যোগদানে সুযোগ দিতে কুতুব শাহকে নির্দেশ দিলেন এবং এ-নির্দেশের প্রতিকূল আচরণের ফলে তার রাজ্য দখল করে নেওয়া হবে বলে ভয় দেখালেন। ঔরংজীব এই চিঠি কুতুব শা'র হস্তগত হবার পূর্বেই মোগল বাহিনী গোলকুণ্ডায় পরিচালনা করলেন। চিঠি যখন কুতুব শা'র হস্তগত হল তখনই সে সন্ধির চেষ্টা করল। ঔরংজীব সে চেষ্টা গ্রাহ্য করল না। নির্মমভাবে গোলকুণ্ডা লুণ্ঠিত হল। ঔরংজীবের নির্দেশ ছিল আবদুল্লাকে হত্যা করবার কিন্তু পলায়ন করে সে প্রাণ বাঁচাল।

আবদুল্লার যে-প্রতিনিধি মোগল দরবারে ছিল সে দারাকে বহু পারিতোষিকে অনুকূল করে দারা ও জাহানারাকে দিয়ে গোলকুণ্ডা অধিকারের প্রকৃত তথ্য সাজাহানের কর্ণগোচর করল। সাজাহান অকারণ এক অনুগত মুসলমান রাজার রাজ্য কেড়ে নেওয়া, তাকে হত্যা করা—এ সকল ব্যাপারের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। সাজাহানের নির্দেশ অবহেলা করে ঔরংজীব রাজ্য গ্রাস করেছে। সাজাহান ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ ঔরংজীবকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন (৩০ শে মার্চ, ১৬৫৬)। ২১ শে এপ্রিল মোগল বাহিনী গোলকুণ্ডা ছেড়ে যাত্রা করল। লুঠের ধনরত্ন আগ্রা অভিমুখে চলল। কিন্তু হায়দরাবাদ থেকে

সাজাহানের কানে খবর পৌঁছল যে বহু ধনরত্ন ঔরংজীব নিজে রেখে দিয়েছে—বাদশাহী কোষে জমা দেয়নি। ঔরংজীব জানাল যে গোলকুণ্ডা অভিযানে লব্ধ অর্থের একটা অংশ ঔরংজীবকে দেওয়া হবে কথা ছিল, নতুবা অভিযানের ব্যয়, সৈন্যদের বেতন সে কোথা থেকে দেবে? জানাল যে অভিযান লব্ধ সম্পদের পরিমাণ জনরবে অতিস্ফীত হয়ে সম্রাটের কর্ণগোচর হয়েছে। কুতুব শা'র কাছ থেকে ব্যক্তিগত-ভাবে যে উপহার সে পেয়েছে তা মোটেই অসামান্য মূল্যের নয়। সাজাহান এসব কথায় কর্ণপাত করলেন না। সাজাহান ও দারার সঙ্গে ঔরংজীবের সম্পর্ক বিষিয়ে উঠল।

পরের বৎসর ঔরংজীব সাজাহানের অনুমতি নিয়ে বিজাপুর আক্রমণ করল (২৯ শে মার্চ, ১৬৫৭)। যুদ্ধ জয় হল কিন্তু জয়ের ফল ঔরংজীব আয়ত্ত করতে না করতে বিজাপুরের প্রার্থনা অনুসারে সাজাহান সন্ধি করলেন। মালব ও উত্তর ভারত থেকে প্রেরিত সম্রাট-বাহিনী আবার ঔরংজীবের নিয়ন্ত্রণ থেকে আপন আপন স্থানে ফিরে এল। ঔরংজীব বাহু দংশন করতে লাগল।

এদিকে দারা আত্মপক্ষ শক্তিশালী করে তোলবার উদ্দেশ্যে সাজাহানকে দিয়ে গুজরাটের শাসনকর্ত্তার পদ থেকে মোরাদকে অপসারিত করিয়ে এবং ঔরংজীবের অধীন বেরার সুবা মোরাদকে হস্তান্তরিত করিয়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে কলহের পথ প্রশস্ত করে তুলল। মালব থেকে ঔরংজীবের একজন প্রধান সমর্থক শায়েস্তা খাঁকে সে আগ্রায় তলব করে পাঠাল। মীর জুমলাকেও দাক্ষিণাত্য থেকে আসতে বলা হল। কিন্তু মীর জুমলাকে ঔরংজীব মিথ্যা ষড়্‌যন্ত্র করে আসতে দিল না। দারা ঔরংজীবের অন্যান্য পদস্থ সামরিক কর্মচারীকে সম্রাটের নামে তলব করে পাঠাল। ঔরংজীব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এমন সময় সাজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিজাপুর ত্যাগ করে দৌলতাবাদের দুর্গে নিজের হারেম নিরাপদে রেখে পুত্র

মুয়াজ্জমকে ঔরঙ্গাবাদে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার সাময়িক ভাবে অর্পণ করে ঔরংজীব উত্তর ভারতে ভাগ্যান্বেষণে যাত্রা করল।

গৃহযুদ্ধের পূর্ববর্তী এই ইতিহাস অনুধাবন করলে সাজাহান ও দারার প্রতি ঔরংজীবের মনে কেন কি পরিমাণ বিদ্বেষ সঞ্চিত হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। কালের পরিবর্তনে সাজাহান ও দারার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের অধিকার যখন ঔরংজীবের হাতে এল তখন স্বভাবতঃই ক্ষমাহীন ঔরংজীব আপন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে।

সাজাহান নাটকের ঘটনাকাল মোটামুটি সাত বৎসরের কিছু বেশি। নাটকের প্রথম দৃশ্যে দারা বলছে, সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে বটে কিন্তু সে এখনও সম্রাট নাম নেয় নি। কিন্তু মোরাদ গুজরে সম্রাট নাম নিয়ে বসেছে। আর দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কিন্তু সুজা সম্রাট বলে নিজেকে ঘোষণা করে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে এবং মোরাদ তার কিছু পরে,—৫ই ডিসেম্বর। ডিসেম্বরের শেষ দিকে যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খাঁর অধীনে ঔরংজীব ও মোরাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। অতএব ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় নাট্যব্যাপারের আরম্ভকাল।

নাটকের ঘটনাকাল

ন্যটকের শেষ দৃশ্যে সাজাহান বলছেন,—'সাত বৎসর দুঃখে কেটেছে, এতদিন বড় জ্বালায় জ্বলেছি।' ১৬৫৭ সালের ডিসেম্বর থেকে সাত বৎসর গণনায় ১৬৬৪-র ডিসেম্বরে নাটকের অন্ত্যদৃশ্যের কাল বিবেচনা করতে হয়। কিন্তু সাজাহানকে বন্দী করা হয় ১৬৫৮ সালের ৮ই জুন। সে হিসাবে নাটকের শেষদৃশ্যের ঘটনাকাল ১৬৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়। বোধহয় দ্বিতীয় কালপরিগণনাই যুক্তিযুক্ত।

এই প্রসঙ্গে মনে হতে পারে যে সাজাহান ও ঔরংজীবের এই সাক্ষাৎকার-ই যদি অনৈতিহাসিক তবে কালনিরূপণের প্রয়াসের সার্থকতা কোথায়? পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই সাক্ষাৎকার কাল্পনিক ব্যাপার

হলেও মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে জাহানারার অনুরোধে সাজাহান যে ঔরংজীবকে ক্ষমা করেছিলেন তা ঐতিহাসিক সত্য। দ্বিতীয়তঃ সাজাহানের মুখে দুঃখভোগের কাল সম্পর্কে উল্লেখ দ্বারা নাট্যকার সামাজিকদের মনে নাট্যব্যাপারের সময়-পরিমাণ সম্পর্কে যে একটা ধারণা পৌছে দিতে চান এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ কাল-নির্ভর যে ঘটনাবলী থেকে ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান গ্রহণ করা হয় সে ঘটনা যদি সামাজিকগণের কাছে সুপরিচিত থাকে এবং ঘটনা-কালের পারম্পর্য্যের উপর ভিত্তি করে যদি কাহিনী অগ্রসর হয় তবে নাটকের মধ্যেও সে সব ঘটনার কালসম্পর্কে এবং স্থান সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত অভিনয়ের ফলে ফুটে ওঠা দরকার। দারা সুজা ও মোরাদের পরিণাম প্রদর্শনে নাট্যকার কাল পারম্পর্য রক্ষা করেছেন বটে কিন্তু এদের মৃত্যুর মধ্যে সময়ের ব্যবধানটা স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। ধর্মাট যুদ্ধ যে কখন কিভাবে হয়ে গেল সামাজিকরা বুঝেই উঠতে পারলেন না। বিভিন্ন দৃশ্যে সুজার ভাগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে স্থান পরিবর্তনের ইঙ্গিত দৃশ্যারম্ভে শিরোনামে আছে মাত্র কিন্তু আরাকানে পৌছবার পূর্বে কাশী-মুঙ্গের-টাণ্ডায় তার অবস্থানে পারিপার্শ্বিকতাগত পরিবর্তন সংলাপের মধ্যে প্রায় কিছুই ধরা পড়ে নি।

নাটক-বিচার

সাজাহান নাটক দ্বিজেন্দ্রলালের নাট-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। চরিত্র সৃষ্টির বহুধা বৈচিত্র্যে, কাহিনীর বহু দিগ্‌দেশব্যাপী বিপুল বিস্তারে, নাট্য ক্রিয়ার তীব্র গতিবেগে, জয়-পরাজয় জীবন-মৃত্যুর পারস্পরিক সংঘাতে ভারত-ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায় এই নাটকে প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ ইতিহাসের এই অধ্যায়টির মধ্যে ভাগ্য-বিধাতার আপন হস্তে সঞ্চিত যে নাট্য উপাদান ছিল তা যে কী পরিমাণ

রহস্যঘন ও বিস্ময়কর তা ইতিহাস অনুরাগী পাঠকমাত্রেরই জানা আছে। স্রষ্টার প্রতিভার স্পর্শে কাহিনীমাত্রেই যে নাট্যোপযোগী হয়ে উঠতে পারে শেক্‌সপীয়রের নাটকগুলি তার প্রমাণ। তথাপি তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার শেষ পর্যায়ে অভিজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রলাল যে আলোচ্য নাটকের কাহিনীতে নাট্যবস্তুর সন্ধান করেছেন তার জন্য তিনি সমালোচকগণের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করেছেন। (বিপুল নাট্যোপকরণের বিন্যাসে নৈপুণ্য এবং বিচিত্র অবস্থায় মানব হৃদয়-বৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাত তোলনে আপন সামর্থ্য সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় এই নাটকে তাঁকে, নূরজাহান ও চন্দ্রগুপ্ত নাটকের রচয়িতাকে. দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা দান করেছে।) মোগলযুগ অবলম্বনে রচিত তাঁর নাটকাবলির মধ্যে শেষ নাটক সাজাহান। হিন্দু ইতিহাস নিয়ে এর পরে যে দুখানি নাটক তিনি রচনা করেন তার অন্যতর চন্দ্রগুপ্ত নাটকে এবং নাট্যশক্তির পরিচায়ক নূরজাহান নাটকে উল্লেখযোগ্য চরিত্রাবলির সংখ্যা সাজাহান নাটকের অনুরূপ চরিত্রের সংখ্যার তুলনায় কম. ঘটনাস্রোতের বেগ মন্থর ও ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ, মঞ্চসাফল্যের দিক থেকে নূরজাহান নিষ্প্রভ, এবং অনেকটা এক-চরিত্র-নির্ভর নাটক চন্দ্রগুপ্ত নিম্নতর সোপানে।

নামকরণ ও নায়ক-নির্দেশ

এ-নাটকের নামকরণ ও নায়ক-নির্দেশের ব্যাপারে সমালোচকদের মধ্যে কেমন করে একটা অনৈকমত্য দেখা দিয়েছে। নাটকের নাম সাজাহান না হয়ে যদি ঔরংজীব হত তাতে নাটকের কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টি সম্পর্কে স্পষ্টতর ইঙ্গিত পাওয়া যেত বলে অনেকে মনে করেন, কারণ ঔরংজীব সর্বাপেক্ষা সক্রিয় চরিত্র, অপরাপর চরিত্রের ও ঘটনার চরম পরিণতির সে নিয়ন্তা। অন্যপক্ষে সাজাহানের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর ভূমিকা (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন)। নাটকখানির রসবিচারে প্রবৃত্ত হতে হলে প্রথমেই এই সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

সাজাহান নাটকের কেন্দ্রগত আখ্যানকে দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক দিক

থেকে দেখা যেতে পারে। বৃদ্ধ রোগক্ষীণ সম্রাটের শ্লথ-মুষ্টি থেকে রাজ্য-রশ্মি কেড়ে নেবার উদ্দেশ্যে তাঁর পুত্রদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ ও যোগ্যতম ঔরংজীবের জয়লাভ। অপর পক্ষে হৃদয়বান স্নেহাতুর (নাটকে যেমন দেখান হয়েছে) ভারত সম্রাটের চোখের সম্মুখে বিরাট সর্বনাশ সমুদয় সাম্রাজ্যকে গ্রাস করছে, এখানে স্নেহশীল পিতাকে আপন পুত্র বন্দী করে, এক সন্তান অপর সন্তানের বুকে ছুরি বসায়। এক অশুভ কালরাত্রির ছায়া সমস্ত সংসারকে গ্রাস করছে এবং স্বাভাবিক দিবালোক অকালে নিভে আসছে। যা কিছু মানুষের পুণ্যময় আদর্শ তা নিষ্ফল মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। অসুরেরা সুরলোক গ্রাস করছে। পরিত্রাণের কোন ক্ষীণ সম্ভাবনা, নবীন প্রভাতের কিছুমাত্র প্রতিশ্রুতি এই নীরন্ধ্র তমসার মধ্যে কোথাও নেই। অথচ এমন একদিন ছিল, আজ-ও সে-দিন সম্রাটের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল, যে-দিন এমন অঘটন স্বপ্নের অতীত ছিল। 'এ কি! —একদিনে কি সংসারের নিয়ম সব উল্‌টে গেল! একদিন যার রোষ-কষায়িত চক্ষু দেখে ঔরংজীব ভয়ে অর্ধেক মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেত— তার—তার—পুত্রের হাতে সে বন্দী!' (১ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য।)

প্রভুভক্তি ও ন্যায়বোধের দুর্মর আদর্শ সাজাহানের কণ্ঠে ভাষা পেয়েছে একাধিক উক্তিতে। তবু যদি জাহানারা আজ দুর্গের বাইরে গিয়ে আমার সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতে পার্তাম, তা হলে এখনও এই বৃদ্ধ সাজাহানের জয়ধ্বনিতে ঔরংজীব মাটিতে নুয়ে পড়তো!' 'আমি আজ বৃদ্ধ, শীর্ণ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে ; কিন্তু সম্রাট সাজাহান এ ভারতবর্ষ এত-দিন ধরে এমন শাসন করে এসেছে যে, যদি সে একবার তার সৈন্যদের সম্মুখে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা হলে শুদ্ধ তাদের মিলিত অগ্নিময় দৃষ্টিতে শত ঔরংজীব ভস্ম হয়ে পুড়ে যাবে।' (১ম অঙ্ক ৭ম দৃশ্য।) ক্ষমতা-মদিরার যে মাদক স্বাদ অন্তিম-নিঃশ্বাসপাত পর্যন্ত চিত্তকে রাজ্য-ভোগলিপ্সাগত করে রাখে এখানে তার লেশ মাত্র নেই। সামাজিক ও

পারিবারিক জীবনের ভারকেন্দ্র যে নৈতিক আদর্শের শিলাখণ্ডের উপর অটল বিশ্বাসে সুরক্ষিত ছিল তার আকস্মিক স্থানচ্যুতি এই বিস্ময়-বিহ্বলতা, এই নিষ্ফল বাহুদংশন, এই মর্মন্তুদ হাহাকারের মূলে ক্রিয়াশীল।

সাজাহান চরিত্রের দ্বন্দ্ব এখানে যে তিনি তাঁর সমগ্র শক্তি নিয়ে যুদ্ধে তার প্রহরণ উদ্যত করতে পারছেন না। এক হস্তে তিনি বরাভয় দাতা ও অন্য হস্তে, দুর্বলতর হস্তে তিনি খড়্গপাণি। যুদ্ধটা তাঁকে যতটা করতে হচ্ছে বিদ্রোহী পুত্রদের সঙ্গে তার চেয়ে বেশি করতে হচ্ছে নিজের সঙ্গে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে তিনি চিন্তাকুল। চিন্তা রাজ্যরক্ষা নিয়ে নয়, প্রতিপক্ষ কতদূর প্রবল তা ভেবে নয়, যুদ্ধ হলে যে জয়লাভ তাঁর অনিবার্য এ বিষয়ে যেন সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। তাঁর ভাবনা এই যে এ 'ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ'। তাঁর চিন্তা দুর্বিনীত পুত্রদের কী করে শাসন করবেন! ('আমার হৃদয় এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন! বেচারী মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন করবো কোন্ প্রাণে জাহানারা।') বিদ্রোহী পুত্রগণ নয়, করুণার পাত্র তিনি নিজে, এই নিষ্ঠুর সত্যটা ইতিহাসজ্ঞ সামাজিকগণের কাছে সুবিদিত বলে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সাজাহানের রোগ-পাণ্ডুর মুখশ্রীতে একটা করুণ মধুর স্নিগ্ধ দ্যুতি সঞ্চার করেছে।

সাজাহানের বিষাদময় পরিণাম শুধুই কর্মহীন ভাবরসপুষ্ট কাব্যোচিত মননসর্বস্বতার ফল নয়। যে দ্বিধা-সংশয় তাঁকে সমস্ত শক্তি নিয়ে বিদ্রোহ দমনে উৎসাহিত করবার পক্ষে অন্তরায় ছিল নাট্যোচিত ট্র্যাজেডি সংঘটনের পক্ষে তাই একটি প্রবল শক্তি। সাজাহান-চরিত্রের কল্পনা স্নেহ ও রাজধর্মের দ্বন্দ্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাঁর সমস্যা এই, 'যে পক্ষের-ই পরাজয় হয় আমার সমান ক্ষতি। এ যুদ্ধে তুমি পরাজিত হলে আমায় তোমার ম্লান মুখখানি দেখতে হবে।

আবার তারা পরাজিত হয়ে ফিরে গেলে তাদের ম্লান মুখ কল্পনা করতে হবে।' দারা, সুজা, মোরাদ এদের প্রত্যেকের ভয়ঙ্কর পরিণাম যাঁকে শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত ভাবে আঘাত করেছে তিনি সাজাহান। কিন্তু শুধু নিষ্ক্রিয় ভাবে এ আঘাত বহন করা ছাড়া তাঁর গতি ছিল না বলে যে তিনি এই নাট্যব্যাপারের নায়ক তা নয়, এ আঘাত ত্বরান্বিত করায় তাঁর নিজের কর্ম কম দায়ী নয়। এই কারণেই তাঁর চরিত্রের নায়কত্ব ও নাট্যধর্ম প্রশ্নাতীত।

নাটকের প্রথম দৃশ্যে দারাকে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে বলতে হয়েছে 'পিতা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভাইদের কাউকে পীড়ন বা বধ করব না, তাদের বেঁধে পিতার পদতলে এনে দেবো। পিতা তখন তাদের ইচ্ছা হয়, ক্ষমা করবেন। তারা জানুক, সম্রাট সাজাহান স্নেহশীল—কিন্তু দুর্বল নয়।' স্পষ্টতঃ সাজাহানের ইচ্ছা দারার আশ্বাসবাণীতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই উক্তিটি একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ভিত্তিকে আশ্রয় করে নাটকে স্থান পেয়েছে। সামুগড়ের যুদ্ধে যে-সব কারণে দারার পরাজয় হল তার অন্যতম কারণ সাজাহানের স্নেহাতুর মনের দুর্নিবার শান্তিকামনা। স্যর যদুনাথ লিখছেন, 'And he was also hampered by Shāh Jahān. Even now (তখন ধর্মাটের যুদ্ধে যশোবন্তের পরাজয় ঘটেছে) the Emperor urged him to avoid war ; he still fondly hoped that the quarrel among his sons could be peacefully ended by diplomatic messages.'

ইতিহাস বলছে ধর্মাটের যুদ্ধে পরাজিত যশোবন্ত সিংহের হাত-ও তিনি অনেকটা এমনি করেই বেঁধে দিয়েছিলেন। 'Jaswant was severely handicapped by Shāh Jahān's instructions to send the two rebellious princes (মোরাদ ও ঔরংজীব) back

to their own provinces with as little injury to them as possible, and to fight them only as a last resource. While Aurangzib followed his own judgment only and knew his own mind, Jaswant was hesitating, diatracted by the conflict between the instructions from Agra and the exigencies of the actual military situation in Malwa, and entirely dependent for his o vn line of action on what his opponents would do.' কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যে-শান্তিকামী স্নেহাতুর সাজাহান দেখা দিয়েছেন তিনি ইতিহাসের পাতা থেকে সোজা নাটকে এসে প্রবেশ করেছেন। নিজের ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করতে, যুদ্ধ প্রয়াসকে দ্বিধান্বিত করতে যিনি সেনাপতির হাত বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি নাট্য প্রবাহে যে গতি সঞ্চার করেছেন একথা বলতে সাজাহানের যুদ্ধ-বিমুখতা ও দারার আশ্বাস-বাক্য স্মরণ করলে সমালোচকের আর সংশয়ক্লিষ্ট হবার প্রয়োজন নেই।

নাট্যব্যাপারে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের উদাহরণ নাটকে আরও আছে। ইতিহাস বলে [সাজাহান নাটকের ঐতিহাসিক উপাদান দ্রষ্টব্য] সাজাহান ঔরংজাবের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য আগ্রা-দুর্গে স্বেচ্ছাবরোধ স্বীকার করেছিলেন। অবশেষে জলাভাবে সঙ্কটাপন্ন হয়ে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করতে বাধ্য হন। নাট্যপ্রয়োজনে, সাজাহান চরিত্রের ভাবানুষঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষা কল্পে, নাটকে বলা হয়েছে দুর্গদ্বার আপন দুর্ভাগ্যকে ও মহম্মদকে তিনি নিজে খুলে দিয়েছিলেন। [‘আমি দিয়েছি জাহানারা। সব দোষ আমার। আমি স্নেহবশে ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল, সব দিয়েছিলাম। ওঃ, আমি এ স্বপ্নেও ভাবিনি—’ ১ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য।] অতএব ভারতসম্রাট রূপে তাঁর যে স্বাভাবিক গৌরব মহৎ দুঃখের স্বেচ্ছাবরণে তা মহিমান্বিত হয়েছে,

মানবীয়তা-সমুচিত ভ্রম তাঁকে সাফল্যের পথ থেকে দূরে নিক্ষেপ করে লোকোত্তর মর্যাদা অর্পণ করেছে, শোচনীয় দুর্দৈবের দুঃসহ আঘাতে বিকলপ্রায় আপন চৈতন্যকে আঁকড়ে থাকবার প্রাণপণ চেষ্টায় [চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে সাজাহানের উক্তি 'সত্যই ত আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি !—না, না, না। আমি পাগল হব না !' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য] তাঁর মননশীলতা তাঁকে ট্রাজেডির নায়কের পদবী অর্পণ করেছে।

সাজাহানের প্রকৃত পরাজয় তাঁর বিশ্বাসভঙ্গে, বাহুবলের ন্যূনতার ফলে পরাভবের মধ্যে নয়। তাঁর দুর্মর বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে যে-দৃশ্যে মহম্মদ তাঁকে বন্দী করে সেই দৃশ্যে। ঔরংজীবের প্রতীক্ষায় তিনি আছেন; জাহানারাকে বলছেন, 'আমি তাকে স্নেহে বশ করব। তাতেও যদি সে বশ না হয়—তা হলে তার কাছে, পিতা আমি—তার সম্মুখে নতজানু হয়ে আমাদের প্রাণ ভিক্ষা মেগে নেবো। বল্‌বো আমরা আর কিছুই চাই না, আমাদের বাঁচতে দাও, আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসার অধিকার দাও।' সাজাহানের যে দুঃসহ পরাজয় সে স্নেহের পরাজয়, ক্ষমার পরাজয়, পিতৃত্বের পরাজয়, যৌবনের নিষ্ঠুর পীড়নে বার্ধক্যের চিরন্তন পরাজয়, জগতের স্থিতিস্থাপকতার মূল ভিত্তি যে আদর্শ ও নীতি তার উপর অবিচল বিশ্বাসের শোচনীয় পরাজয়। এ পরাজয় শুধুই করুণ নয়, এর মধ্যে মানুষের চিরন্তন ট্রাজেডির বীজ রয়েছে। সাজাহান নামক মানুষটির জীবনে এই সার্বভৌম ভাবসত্যটি মোহ ও মোহভঙ্গের মধ্যে নাট্যরূপ পেয়েছে।

সিংহাসনের অধিকার নিয়ে যে-গৃহযুদ্ধ নাট্যবস্তুরূপে গৃহীত হয়েছে তার অবসান ঘটেছে ঔরংজীবের রাজ্যপ্রাপ্তিতে। ঔরংজীব পরস্পর যুযুধান ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি। বিপক্ষকে কেমন করে পরাস্ত করে, বিতাড়িত করে, বন্দী করে, হত্যা করে সে সিংহাসনে

পৌঁছবার পথ নিষ্কণ্টক করেছে ইতিহাসের ধারার অনুসরণে তা উপস্থাপিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ঔরংজীবের যে চরিত্র ফুটে উঠেছে তার পরিচয় এই, সে লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ, কুশাগ্রীয়ধী, দুঃসাহসী, অক্লান্তকর্মা যোদ্ধা এবং চক্রান্ত, শাঠ্য, প্রতারণা তার নিঃশ্বাসবায়ু। জয়লাভ তার উদ্দেশ্য এবং সৎ অসৎ যে-কোন উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি তার একমাত্র লক্ষ্য। দারা ও সুজার স্নেহ-প্রেম, মোরাদের অকপট জীবনদর্শন—তার জীবনে এ সকল বৃত্তি অজ্ঞাত। এ নাটকে ঔরংজীবের জীবন একান্ত ভাবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সংঘর্ষের মধ্যে চরিতার্থতালাভের প্রয়াসে ব্যাপৃত ; তার পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের ইতিহাসকে নাট্যকার এখানে সতর্কভাবে বর্জন করেছেন। পুত্র মহম্মদ নাটকে একটি বিশিষ্ট চরিত্র বটে কিন্তু ঘরোয়া জীবনের বাইরে রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য সাধনকল্পে যন্ত্ররূপে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সিংহাসন প্রাপ্তির প্রয়াসে ঔরংজীবের সাফল্যলাভ যদি এই নাটকে রসের দিক থেকে প্রাধান্যলাভ করত তবে সেই সাফল্যের অনুযায়ী সহানুভূতি—বিজয়ী বীরের সহজলভ্য সামাজিকগণের সহানুভূতি—ঔরংজীবের প্রাপ্য হত ; ঔরংজীব সে সহানুভূতি, সে সশ্রদ্ধ প্রশস্তি কখনও পায় নি। জয়লাভের পথে যখনই তার একটি একটি শত্রুপাত ঘটেছে তখনই দর্শক এক-একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছে। দারার সপরিবার দুঃখ-নির্যাতন ভোগ, নাদিরার মৃত্যু ও দারার হত্যা, সুজার অপমান ও মৃত্যুবরণ, মোরাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা—এর প্রত্যেকটি ঘটনা ঔরংজীবের বিজয়গৌরবকে ম্লান করেছে এবং যারা বাহুবলে ক্ষীণ এবং ছলনায় অপারদর্শী তাদের সমস্ত দুর্বলতাকে এক স্নিগ্ধ করুণ মহিমায় দীপ্ত করে তুলেছে। এই সকল শোচনীয় পরাজয়ের পুঞ্জীভূত সঞ্চয় স্নেহমাত্র-সম্বল স্মৃতিমাত্রসঞ্চয় অপরিণামদর্শী সাজাহানের লোলবক্ষে সকল ভ্রম-প্রমাদের ঋণ নিঃশেষে আদায় করবার দাবীতে আঘাতের পর আঘাত করছে।

নাটকখানির যে চরম ফলশ্রুতি, যে স্থায়ী আবেদন, তার বিচারে এই কারণে ট্রাজেডির শ্রেণীতে এর স্থান এবং সে ট্রাজেডি সাজাহানের। নাটকখানি নায়ক-নামাঙ্কিত এবং প্রথা ও যুক্তি উভয় দিক থেকে বিচারেই এই নামকরণ সমর্থনযোগ্য।

ট্রাজেডির সুর নাটকের প্রথম থেকেই বেজে উঠেছে এবং কোন জায়গায় এই মূল সুরের পরিপন্থী কোন লঘু আশাবাদ ক্ষীণভাবেও ধ্বনিত হয় নি। আদর্শের অপঘাত এখানে নিয়তির অমোঘ বিধান, নাট্যব্যাপারের ভাবদেহ রচনার একমাত্র উপাদান। রাজপুতগণের মহৎ ঐতিহ্যও এখানে এর বশ মেনেছে। যশোবন্ত সিংহের বিশ্বাস-ঘাতকতা দারার পরাজয়কে সহজসাধ্য করেছে, জিহন খাঁর কৃতঘ্নতা দারার হত্যা সংঘটিত করেছে, সোলেমানের চরিত্রবল তাকে কাশ্মীরে নিরাশ্রয় করেছে। ছলনা প্রতারণা নিষ্ঠুরতা কৃতঘ্নতা মানুষের সুকুমার হৃদয়বৃত্তিকে উপহাস করে চলেছে। নৈতিক স্থিতিস্থাপকতা ও চিরন্তন মানবধর্ম তাদের প্রাপ্য মূল্য পাচ্ছে না। এর মধ্যে রাখালের মুখে পরোপকার-মাহাত্ম্য (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) শূন্যগর্ভ বক্তৃতা মনে হয়, মোরাদের প্রতি মহম্মদের স্ত্রীর সান্ত্বনা-বাক্য (৫ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য) প্রলাপের মত শোনায় এবং শেষ দৃশ্যে জহরতের দীর্ঘ অভিশাপোক্তি উৎকট অতিনাটকীয় পরিহাসের মত বাজে।

আপাত দৃষ্টিতে ধরা না পড়লেও সাজাহান চরিত্রে নাট্যোপযোগী চলিষ্ণুতা বর্তমান। তার ভিতরে ও বাইরে বিপুল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যে সাজাহানকে আমরা দেখেছি তিনি জরাতুর বৃদ্ধ হলেও তার সর্বত্র বার্ধক্যোচিত একটা মহিমা প্রকাশমান। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে তাঁর মানসিক প্রশান্তি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে কিন্তু সম্রাট দুর্বলতার, পরাজয়-শঙ্কার উর্ধ্বে। দারা যখন বলল, 'পিতা, আপনি চিন্তিত হবেন না। এ বিদ্রোহ দমন করতে আমি জানি,'

তখন সম্রাটের উত্তর, 'না, আমি তার জন্য ভাবছি না দারা, তবে এই—ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—তাই ভাবছি।' কঠিন হস্তে বিদ্রোহ দমনের অপেক্ষা স্নেহের শাসনে দুর্বিনীত পুত্রকে অভিভূত করতেই তাঁর হৃদয় তাঁকে প্রেরণা দিচ্ছে। জাহানারার যুক্তিতে অবশেষে তিনি এক রকম অনিচ্ছায় যুদ্ধে সম্মতি দিলেন। কিন্তু সামাজিকরা বুঝলেন যে এ সেই সাজাহান যাঁর 'হৃদয় এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন।' এই প্রবল বিশ্বাসের উপর ভর করে তাঁর 'উদ্ধত বিজয়ী পুত্র' ঔরংজীবের সৈন্যকে দুর্গপ্রবেশের অনুমতি পর্যন্ত দিয়েছেন এবং তাঁর এই বিশ্বাস খান খান হয়ে ভেঙে গিয়েছে। এক সময় একান্ত স্নেহাস্পদ একমাত্র নির্ভরস্থল কন্যাকে তিনি বলছেন (চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য), 'তোকে আশীর্বাদ করি—'

জাহানারা। কি বাবা ?

সাজাহান। যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।

এই দুই সাজাহান এক নয়।

মানুষের উপর বিশ্বাস তিনি হারিয়েছেন। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস তিনি হারিয়েছেন। ['আমি এমন কি পাপ করেছিলাম খোদা—যে আমার নিজের পুত্র—ওঃ !' ইত্যাদি বিলাপোক্তিতে ঐতিহাসিক উপাদানকে সাহিত্যোচিত গ্রহণ-বর্জনের নীতির অনুসারে নোতুন করে ব্যবহার করার প্রয়াস লক্ষণীয়। সাজাহানের কান্দাহার অভিযানে যাত্রায় অসম্মতি ও বিদ্রোহ জাহাঙ্গীর এক সময়ে ক্ষমা করেছিলেন। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যদি ঔরংজীবের অপরাধ হয়ে থাকে সে অপরাধ থেকে ইতিহাসের সাজাহান অব্যাহতি পাবেন না। সাজাহান পরাস্ত হয়েছিলেন জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মহাবৎ খাঁর হাতে। যদি জয়লাভ করতেন তবে জাহাঙ্গীরের দশা বৃদ্ধ সাজাহানের মতোই হত কিনা কে জানে। কিন্তু নায়ক-চরিত্রে

নবীন মহিমার আরোপের ফলে তাকে গৌরবান্বিত করে তার পতন ও দুর্দশার চিত্র মর্মন্তুদ করে তোলবার ট্রাজেডি-সিদ্ধ রীতির অনুসরণ করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল এবং নাটকীয় ভ্রান্তি সৃষ্টিতে তিনি যে সাফল্যলাভ করেছেন এ বিষয়ে সংশয় নেই।] অথচ এত বড়ো শাস্তি পাবার মতো পাপ তিনি তো করেন নি। আজ যে-জগতে এসে তিনি পৌঁছেছেন সে জগতের সঙ্গে জীবনে কোনদিন তাঁর পরিচয় ঘটে নি— কৃতঘ্নতা, অনিয়ম, অত্যাচার, অবিচারের অস্বাভাবিক জগতে তিনি অসহায় আগন্তুক। অথচ অপ্রকৃতিস্থের বিস্মৃতিলোকে প্রাপ্য সর্বদুঃখহর শান্তিও তাঁর অদৃষ্টে নেই।

সাজাহান যে ঔরংজীবকে ক্ষমা করেছিলেন এই ঐতিহাসিক সত্যের উপর ভিত্তি করে কল্পনার আশ্রয়ে ঔরংজীব ও সাজাহানের সাক্ষাৎকার ও মিলন প্রদর্শন করে ট্রাজিক নাটকের ঐতিহ্যগত প্রশান্তিময় অবসান এই নাটকে সাধিত হয়েছে। ঐতিহাসিক সত্যটি নাট্যকার নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন মাত্র। এতে কারও যদি মনে হয় যে সাজাহান স্নেহ ও বিশ্বাসের দুর্গে পূর্ববৎ সুরক্ষিত আছেন তবে যে-নাট্যপ্রয়োজনে এ দৃশ্যের কল্পনা তার মর্মে তিনি প্রবেশ করেননি বুঝতে হবে। নাট্যকারের চোখে তাজমহলের স্রষ্টা সাজাহান মহাকবি। নাটকে সাজাহানের শেষ উক্তিতে সন্ধ্যার আকাশ, যমুনাবক্ষ, কুঞ্জবন, 'প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু' তাজমহলের দিকে তাকিয়ে জাহানারাকে যদি তিনি অনুরোধ করে থাকেন 'ঔরংজীবকে ক্ষমা কর— আর ভাববার চেষ্টা কর যে এ সংসারকে যত খারাপ ভাবিস তত খারাপ সে নয়' তাতে একথা সপ্রমাণ হয় না যে নাটকের আরম্ভে সাজাহান যেখানে ছিলেন অবসানেও সেখানেই আছেন। বরঞ্চ দর্শকের কাছে এই সত্যটাই বড়ো হয়ে ওঠে যে এ-সাজাহান নাটকের আরম্ভে যাঁকে দেখা গিয়েছে তাঁর ঝড়-ঝঞ্ঝাহত রিক্ত নিঃস্ব-শ্মশানচারী ছায়ামূর্তি।

নাটকের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত, সর্বাপেক্ষা গতিশীল চরিত্র ঔরংজীব। ইতিহাসের ভগ্নস্তূপ থেকে তাকে সংগ্রহ করে স্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাণবায়ুর ফুৎকারে তাকে সজীব রক্ত মাংসের মানুষ গড়ে তুলে নাট্যজগতে স্থান দিয়েছেন। নাটকে তার ভূমিকা সুদীর্ঘ কিন্তু বিনা প্রয়োজনে তার মুখে নাট্যকার একটি কথাও প্রয়োগ করেন নি। তার ভাষা যুক্তির ভাষা, চিন্তার ভাষা; ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস তার জীবনে কোথাও নেই, তার মুখের ভাষাও তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলেছে। যুদ্ধের সমস্ত প্রহরণ তার হাতে এবং তাদের বিচিত্র প্রয়োগ তার আয়ত্ত। চিত্তবিক্ষেপ ঘটাবার মত কোন বস্তু বা ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য সাধনের পথ রুদ্ধ করে এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারে না, এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত। মোরাদ ভাগ্যের পরিহাসে তার যুদ্ধজয়ের অস্ত্র; সে-অস্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র তাকে বন্দী করে সে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ ও পরে হত্যা করেছে। যশোবন্ত সিংহকে সে সন্দেহ করে কিন্তু যে-পর্যন্ত তাকে দিয়ে কাজ আদায় হতে পারে ততক্ষণ তার সসৈন্য আনুকূল্য লাভের পূর্ণ সুযোগ সে গ্রহণ করতে তৎপর। ছলনা ও প্রতারণার পথে সে দ্বিধাহীন স্বচ্ছন্দচারী পথিক। সুজার সঙ্গে কপট সন্ধিতে, মহম্মদের কাছে কপট পত্র প্রেরণে তার চরিত্রের যে দিকটা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সে দিকটা নাট্যকারের কল্পনামাত্র নয়, ইতিহাসে তার সমর্থন পাওয়া যায়।

ঔরংজীব

অথচ ঔরংজীব চরিত্র মনুষ্যত্ব-বিগর্হিত কতকগুলি বৃত্তির সঞ্চয় মাত্র নয়, সে রক্তমাংসের মানুষ। তার প্রবলতম আকর্ষণ তার শক্তিমত্তা। লোকনায়কের সহজ জয়টীকা ললাটে ধারণ করেই যেন তার আবির্ভাব। বিপদে সে স্থিরবুদ্ধি, অচঞ্চল; যুদ্ধক্ষেত্রের যে-অংশ সর্বাধিক সংকটময় সেখানে তার স্থান; চক্রান্তে ও ভেদনীতিতে সে স্বভাবনিপুণ। কোন

প্রকার বিলাসের কোন প্রলোভন তার চিত্তে সাড়া তোলে না। পানদোষ বা নারী-ঘটিত দুর্বলতা তার চরিত্রে—কি ইতিহাসে, কি নাটকে—দুর্লভ ; রঙ্গ-পরিহাস তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। সে মূর্তিমান পৌরুষ, কর্মশক্তির মূর্ত প্রতীক। নাট্যকারের কৃতিত্ব এখানে যে দর্শক তাকে ঘৃণা করবার অবকাশ পায় না, অগ্নিস্রাবী উত্তুঙ্গ গিরিশিখরের ভয়াবহ রমণীয়তায় বিমূঢ় দর্শকের মতো তাকে নিরীক্ষণ করে এক প্রকার ভীতিমিশ্র প্রসাদ লাভ করে।

ঔরংজীবের চরিত্র কোন প্রকার একমুখী গুণ-ধর্মের নির্দিষ্ট প্রকাশে বর্ণ-বিরল হয়ে ওঠে নি। বহুধা-প্রসার সূক্ষ্মতন্তুজালের জটিলতা তার মানসলোকের গঠনে বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে। চতুর্থ অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে বশংবদ কাজীর স্বাক্ষরিত দণ্ডাজ্ঞা হাতে নিয়ে বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়াসে দোলাচল-চিত্ত ঔরংজীব সামাজিকচিত্তে কৌতূহলোদ্বেগ (suspense) সৃষ্টি করেছে। কখনও তার ক্ষমার, কখনও দণ্ড-বিধানের সংকল্প প্রবল হয়ে উঠছে। একবার সে বলছে 'এতখানি পাপ—যাক্, এ মৃত্যুদণ্ড ছিঁড়ে ফেলি—(ছিঁড়িতে উদ্যত)' সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলছে 'না, এখন না। শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে এটা ছিঁড়ে এ মহত্ত্বটুকু কাজে লাগাবো—।' যে-মুহূর্তে ক্ষমাবৃত্তি প্রবলতর হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তে স্বভাবসিদ্ধ কুটিলতা চিত্তের ওই বিশেষ প্রবণতাকে এক তির্যক্ মিশ্র ভাবনা ও অনুভূতিতে রূপান্তরিত করে তার রম্যতা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু এই স্বল্পজীবী suspense যে এক সময় মৃত্যুদণ্ড বিধানের মধ্যেই অবসান লাভ করবে দর্শকগণের সুপরিজ্ঞাত এই সত্যের প্রতিষ্ঠা এই দৃশ্যেই নাট্যকার যে ভাবে সাধন করেছেন তা সবিশেষ লক্ষণীয়। শায়েস্তা খাঁ নানাভাবে দেখাবার চেষ্টা করছে যে দারার প্রাণদণ্ড প্রত্যাহারের অর্থ বিপদের আশঙ্কাকে চিরদিন জাগরূক রাখা,—ঔরংজীব সংকল্পে অবিচল।

শায়েস্তা খাঁ প্রবলতর যুক্তিতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে অবশেষে যখন বলল, 'পিতাকে সিংহাসনচ্যুত, ভ্রাতাকে বন্দী—বড় বেশি দূর এগিয়েছেন জাঁহাপনা,' ঔরংজীব তখন দ্বিধা-চঞ্চল। জিহন খাঁ এই বার তার তূণের অমোঘ বাণটি নিক্ষেপ করল, 'খোদাবন্দ, দারা কাফের। কাফেরকে ক্ষমা করবেন আপনি? খোদাবন্দ, এই ইসলাম ধর্মের রক্ষার জন্য আপনি আজ ঐ সিংহাসনে বসেছেন—মনে রাখবেন। ধর্মের মর্যাদা রাখবেন।' মুহূর্তে ঔরংজীব নিজেকে খুঁজে পেল। এতক্ষণ শায়েস্তা খাঁ যে যুক্তি প্রদর্শন করেছে তাতে প্রাণ সাড়া দিয়েছে কিন্তু জগৎসমক্ষে তা প্রকাশ করা চলে না। একটা জোরালো কৈফিয়ৎ এতক্ষণে পাওয়া গেল। ঔরংজীব বলছে 'সত্যকথা জিহন খাঁ। আমি নিজের প্রতি সব অন্যায় অবিচার ঘাড় পেতে নিতে পারি। কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রতি অবমাননা সইব না। শপথ করেছি—হাঁ দারার মৃত্যুই তার যোগ্য দণ্ড।' মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা-পত্রে সে স্বাক্ষর করে দিল। আবার এই ঔরংজীবই যখন শুনতে পেল যে জিহন খাঁ তার প্রজাদের দ্বারা নিহত হয়েছে তখন বিনা দ্বিধায় বলে উঠল 'পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড খোদা দিয়েছেন।' এর মধ্যে শুধু যে ঔরংজীব চরিত্রের কপটতা ধরা পড়েছে তা নয়, সত্যকার মনোবিপ্লবের মধ্যে বিরুদ্ধবৃত্তির সংঘাত-লীলা সৃষ্টি করে নাট্যকার বাস্তব সত্যের পথে উত্তীর্ণ হবার জন্য চরিত্রের কেন্দ্রীয় বৃত্তিকে অবলম্বন করে সূক্ষ্মদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, যে-জিহন খাঁ দারার দয়ায় জীবন দান পেয়েছিল তারই মুখে ধর্মের দোহাই পাড়া ও ঔরংজীব কর্তৃক তার সমর্থন এবং পরিশেষে ঔরংজীবের মুখেই 'পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড খোদা দিয়েছেন'—এতে যে irony-র প্রকাশ রয়েছে তার নাটকীয় মূল্য অস্বীকার করা চলে না।

পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে বিবেক-দংশন-পীড়িত ঔরংজীবের বিভীষিকা-দর্শন। নাট্যোপকরণ হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের এ অতি প্রিয় বিষয়। মেবার-পতন নাটকে অনুতাপ-পীড়ার প্রথম সঞ্চারে সগর সিংহের বিভীষিকা-দর্শন তার চরিত্রের পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করেছে, ঔরংজীবের চরিত্রের উপর এর কোন স্থায়ী প্রভাব নেই। নেই, কারণ ঔরংজীব শক্তিমান, নেই, কারণ ঔরংজীবের পরবর্তী দীর্ঘকালব্যাপী জীবনেতিহাস এর প্রতিবাদ। এ দৃশ্যের একমাত্র সার্থকতা পরবর্তী দৃশ্যে সাজাহানের ক্ষমাভিক্ষার পূর্ব-প্রস্তুতিকল্পে।

জীবনের বাহির মহল ও অন্তঃপুরের সমন্বয়ে যে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গড়ে ওঠে ঔরংজীবের চরিত্রকে রূপ দিতে গিয়ে নাট্যকার তাকে খর্ব করেছেন। নাটকে ঔরংজীবের মন্ত্রণা, উদ্‌যোগ, চক্রান্ত সব মিলে তার জীবনের বহিরঙ্গ ভাগ প্রকাশ পেয়েছে। ঔরংজীব সেখানে একান্ত একাকী, তার সুখ-দুঃখের কোন শরিক সেখানে নেই। অবশ্য ঔরংজীবের জীবনের প্রায় সবটাই বহিরঙ্গনচারী। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুল-ভ্রান্তি তার নিয়ম-শাসিত বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্য-বিমুখ কঠিন শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত, অনুদার জীবন তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও ভয় ও সম্ভ্রমের বিষয় ছিল। তার জীবনটা কাজে ঠাসা, প্রয়োজনের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা, চিত্র-শিল্প-সঙ্গীত সেখানে নির্বাসিত, ভাবাবেগ রুদ্ধকণ্ঠ। এই কারণেই বোধ হয় জীবনের যে ভাগ তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে শুধু তাকেই নাটক আশ্রয় করেছে। নাট্যকার এর ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করেছেন দারা ও সুজার আখ্যানে। ঘরোয়া দিকটাই সেখানে প্রাধান্য, একটু অতি-প্রাধান্য পেয়েছে। করুণ ও কৌতুক রসের দ্বিধারা মুক্ত প্রবাহে অগ্রসর হয়েছে দারা ও সুজার কাহিনীতে এবং পরিশেষে এক বেণীবন্ধে অনিবার্যভাবে গিয়ে পরিণাম লাভ করেছে।

দারা সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র, সম্রাটের মনোনীত উত্তরাধিকারী।

Talmud, নববিধান (New Testament), মুসলমান সূফীদের রচনা ও বেদান্ত সে পাঠ করেছে। হিন্দু যোগী লাল দাস ও মুসলমান ফকির সরমদ—উভয়ের কাছে উভয় ধর্মের সার সত্য সম্বন্ধে সে উপদেশ লাভ করেছে। কিন্তু সে দীক্ষা নিয়েছে মুসলমান সাধু মিঞা মীরের কাছে, খাঁটি মুসলমান ছাড়া এই দীক্ষা লাভ সম্ভব ছিল না। তার ইচ্ছা ছিল প্রপিতামহ আকবরের মতো সব ধর্মের সার সঙ্কলন করে ধর্মভেদজাত জাতি-বিদ্বেষ দূর করতে পারে এমন এক সর্বধর্মসমন্বয়ের মহাভিত্তি রচনা করা। অথচ স্বধর্ম ইসলাম যে সে ত্যাগ করেনি তার রচনার ভূমিকাগুলিই তার প্রমাণ। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানরা যে ঔরংজীবের তুলনায় তাকে অ-মুসলমান বা কাফের বলবে এ বিষয়ে বিস্মিত হবার কারণ নেই। ইতিহাসের এই দারাকে স্মরণ করেই দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের দারার মুখে এই উক্তি দিয়েছেন, 'আমি এ সাম্রাজ্য চাই না। আমি দর্শনে উপনিষদে এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য পেয়েছি। আমি যাচ্ছি আপনার সিংহাসন রক্ষা করতে।' [১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য।] তার উক্তি যে আন্তরিক তার প্রমাণ এই যে সাজাহানের সমক্ষে শুধু নয়, পরোক্ষেও [৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য] সে অনুরূপ কথাই বলেছে।

দারা

কিন্তু ঔরংজীব চরিত্র থেকে তার মৌলিক ভেদ নির্দেশ করবার জন্যই নাট্যকার তার বৈরাগ্যের, ঐহিকতা-বিমুখ মনের এই পরিচয় প্রকাশ করেছেন। দারা একান্তভাবেই মোগল, তৈমুরের রক্তের প্রবাহ তার ধমনীতে স্তিমিত হলেও স্তব্ধ হয় নি। দারা ও ঔরংজীবের পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা দীর্ঘ কালের। সাজাহানের কাছে দূরের কথা, সাধারণেও সেটা অগোচর ছিল না। দারাকে সাজাহান নিজের কাছ থেকে দূরে সরান নি, ঔরংজীবকে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার দিয়ে আগ্রা দরবার ও দারার থেকে দূরে রক্ষা করে উভয়কে পরস্পরের বিদ্বেষ-বহ্নি থেকে

বাঁচিয়ে এসেছেন। এর ফল শেষ পর্যন্ত ঔরংজীবের পক্ষে শুভ হয়েছে, দারার পক্ষে হয় নি। যুদ্ধ-বিগ্রহ শাসনকর্ম লোকচরিত্র-জ্ঞান ইত্যাদিতে ঔরংজীবের যেমন অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, সম্পদে-সঙ্কটে শত্রু-মিত্রকে চেনবার ও কর্তব্য স্থির করবার প্রয়োজন ঘটেছে, দারার তা হয় নি। কান্দাহারে তৃতীয়বার অভিযানে সৈনাপত্য করা ছাড়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তার কিছুই ছিল না। স্বার্থলুব্ধ সভাসদ্বর্গের চাটুবাদ শ্রবণে অভ্যস্ত সাজাহানের এই প্রিয়তম পুত্রটি অভিমান-স্ফীত ও রাজ-সম্মানে ভূষিত হয়ে অপরিমেয় ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তিতে নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করেছে। বাহুবল ও মস্তিষ্ক শক্তির যে চরম পরীক্ষায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে রাজলক্ষ্মীকে জয় করে নিতে হবে তার জন্য প্রস্তুতি ঔরংজীবের যেমন সহজেই ঘটেছিল দারার তা কিছুই ছিল না। তবে দারার মানবোচিত গুণ সম্পর্কে ইতিহাস মুখর। 'Dara was a loving husband, a doting father, and a devoted son,' নাদিরার মৃত্যুতে দারা যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। "Dara was frantic with grief at losing his life's companion. 'The world grew dark in his eyes. He was utterly bewildered, His judgment and prudence were entirely gone." পরাস্ত ও পলায়নপর এবং মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ এই দারাকেই আমরা নাটকে পেয়েছি। দিল্লীর রাজপথে ভিখারী বেশে হস্তিনীর পৃষ্ঠে বাহিত এই দারার দুর্দশায়ই মানুষ কেঁদেছে। এই ধর্মপ্রাণ দারার মুখে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘোষণায় নাট্যকার তার চরিত্রের গতিশীলতা সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছেন।

এই নাটকের মধ্যে প্রথম প্রেমের রঙীন স্বপ্ন ও তরল ভাবোচ্ছ্বাস কোথাও নেই। মূল নাটকের সুরের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কল্পনা করা যায় না। এই কারণে লঘুতর দৃশ্যের সংস্থান যেখানে নাটকের

শঙ্কা-সঙ্কট বিষাদ-গম্ভীর দৃশ্যাবলীর 'পরে উপযোগী সেখানেও নাট্যকার তার সঙ্গে নাটকের মূলসুরের অন্তর্যোগ বিধান করেছেন। জীবনের সঙ্কট-ময় পথে চরম দুঃখ-সংঘাতের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রৌঢ় প্রেমের বিজয়-যাত্রার রক্তাক্ত ইতিহাস দারা ও সুজার কাহিনীর মধ্যে ধরার চেষ্টা হয়েছে। জীবনের প্রতি একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নাটকের সর্বত্র প্রকাশ পেয়েছে।

দারার দৃশ্যাবলীতে করুণ রসের আতিশয্যই বোধহয় এর একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। দারাকে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আমরা যুদ্ধব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত দেখেছি, সাম্রাজ্যলাভ সম্পর্কে সে উদাসীন। প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে জানা গেল আগ্রার সন্নিহিত স্থানে ঔরংজীবের সঙ্গে প্রথম সঙ্ঘর্ষেই তার পরাজয় ঘটে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দারার সঙ্গে সামাজিকগণের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ, দারা তখন সপরিবারে রাজপুতনার মরুপথ ধরে পলায়নপর। এই দৃশ্যের সংস্থান অনেকটা অতর্কিত। যুদ্ধপর্বের উন্মাদনার অভাব এখানে যেন একটা বৃহৎ শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। দারার চরম দুর্দশার মধ্যে এই দৃশ্যের আরম্ভ। যে ব্যক্তি দর্শনে উপনিষদে ভারত সাম্রাজ্য অপেক্ষা বড় সাম্রাজ্য পেয়েছে (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য) ভাগ্যবিপর্যয়ে নিরুপায় অবস্থার মধ্যে আসার প্রথম মুহূর্তেই সে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে হত্যা করে আত্মহত্যা করতে উদ্যত—এ দেখার জন্য আমরা যেন প্রস্তুত ছিলাম না। এর জন্য যেন একটা উদ্যোগপর্বের আবশ্যকতা ছিল। ইতিহাসের দারা হিন্দু-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ছিল; শাস্ত্রচর্চায়, উপনিষদের পারস্যভাষায় অনু-বাদ প্রণয়ন ব্যাপারে সে নিযুক্ত ছিল। এই দারার চরিত্র প্রথম দৃশ্যের কেবল একটি ফাঁকা কথায় ধরা পড়ে নি। ঔরংজীবের মত যুদ্ধদীক্ষা তার ঘটে নি কিন্তু তার এই দুর্বলতাও কোন ঘটনার মধ্যে ফুটে ওঠে নি। তবে নাটকে একটি জিনিস স্বচ্ছন্দ সাবলীলভাবে প্রকাশ পেয়েছে,

কোমলহৃদয় গৃহস্থের সর্বনাশের মুহূর্তে অসহায় আর্ত অবস্থা। অক্ষম স্নেহ ও তার অপর দিকে অমানুষিক হিংস্রতা যুগপৎ তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে। আবার তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে অক্ষমতার ফলে নিষ্করুণ ঔদাসীন্যে প্রেমের রূপান্তরণ চারিত্রটিকে সহজ মানবতার বৈশিষ্ট্যে উজ্জল করে তুলেছে! নাদিরা বলছে—'একবার আয়নায় নিজের চেহারাখানি দেখ দেখি নাথ—এই অস্থিসার দেহ, এই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, এই শুভ্রায়িত কেশ—

দারা। আজ যদি আমার এ চেহারা তোমার পছন্দ না হয়—কি কর্ব।

নাদিরা। আমি কি তাই বলেছি!

দারা। তোমাদের জাতির স্বভাব।—তোমাদের কি। তোমরা কেবল অনুযোগ করতে পারো। তোমরা আমাদের সুখে বিঘ্ন, দুঃখে বোঝা!

নাদিরা। (ভগ্নস্বরে) নাথ! সত্যই কি তাই! (হস্তধারণ)

দারা। যাও! এ সময়ে আর নাকিস্থর ভালো লাগে না।

(হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান)

নাদিরা। (কিছুক্ষণ চক্ষে বস্ত্র দিয়া রহিলেন পরে গাঢ় স্বরে কহিলেন) দয়াময় আর কেন।—এইখানে যবনিকা ফেলে দাও।

আবার কিছুকাল পরেই ফিরে এসে দারা বলছে,—'নাদিরা! আমায় ক্ষমা কর! আমার অপরাধ হয়েছে! বাইরে গিয়েই বুঝতে পেরেছি।'

নাদিরা। (নাদিরা প্রবলবেগে কাঁদিতে লাগিলেন)

দারা। নাদিরা আমি অপরাধ স্বীকার কর্ছি, ক্ষমা চাচ্ছি। তবু—ছিঃ। নাদিরা যদি জানতে—'

নাটকে দারার দৃশ্যগুলিতে বহুস্থলে করুণ রসের আতিশয্য প্রকাশ

পেয়েছে সত্য, চরিত্রটি যতখানি pathetic হয়ে উঠেছে ততখানি tragic হয় নি, কিন্তু উদ্ধৃত অংশে ট্রাজেডির অবিসংবাদিত স্পর্শ চরিত্রটিকে রূপান্তরিত করেছে। এ জীবনেরই এক অংশ ; এর বাস্তবতা স্বপ্রকাশ, দারার চরিত্রে বীরত্ব নয়, অপর কোন বৈশিষ্ট্য নয়, স্নেহ-প্রেম-ঈশ্বরানুরাগই বড় করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু অবস্থা-বিপর্যয়ে আজ এমন অবস্থায় সে এসে পৌঁছেছে যাতে হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস ও সুকুমারবৃত্তি শিথিলমূল হয়ে পড়েছে। অবশ্য শেষপর্যন্ত স্নেহ-করুণা-ঔদার্য তাকে পরিত্যাগ করে নি কিন্তু পুরুষোচিত দৃঢ়তার ও ভাবসংবরণক্ষমতার অভাব তার মহৎবৃত্তিগুলিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে পারে নি বলে মনে হয় এবং দারার অন্তিমদৃশ্যে "tear a passion to tatters, to the very rags"—এর কিছু আভাস যেন রসিকচিত্তকে পীড়িত করে। চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে দিলদার যে দারার পতনকে " একটা পর্বত ভেঙে পড়ে গেয়েছে, একটা সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছে, একটা সূর্য মলিন হয়ে গিয়েছে" বলে উচ্ছ্বসিত ভাষায় একে 'এ বড় মহিমময় দৃশ্য' আখ্যা দিয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেই মহিমাই নাট্যকার সম্যক প্রকাশ করতে পারেন নি। দারার চরিত্র সম্বন্ধে এই একমাত্র অভিযোগ যে এই মহিমা সামাজিকগণকে শুধুই কল্পনা করে নিতে হবে। দারা বৃদ্ধ সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রিয়তম পুত্র. রাজ্যপরিচালনাব্যাপারে তাঁর দক্ষিণহস্ত—এ ছাড়া এমন কোন বৃহত্তর চরিত্রগৌরব, যার শিখর থেকে স্খলন সামাজিক-চিত্তে ট্রাজেডির অনুভূতি ঘনিয়ে আনবে, তা নাটকে সূচিত হয় নি।

সাজাহানের যে-উক্তিতে নাটকের আরম্ভ—'তাই ত! এ বড়—দুঃসংবাদ দারা!'—সেই উক্তিই নাটকের বীজ। প্রতিটি দৃশ্যে নোতুন নোতুন অঘটন সেই পূর্বতন সংকটকে ক্রমশঃ অধিকতর ভয়াবহ করে তুলেছে। ক্রমিক আশঙ্কা ও উদ্বেগের দুঃসহ মুহূর্তগুলিতে সুস্থ জীবনের অনুকূল লঘু পরিবেশের

সুজা-পিয়ারা

স্নিগ্ধতা সঞ্চারের কোন ঐকান্তিক চেষ্টাও যেন নাট্যকারের নেই। দিলদারের উক্তিগুলির মধ্যে হাসির অপেক্ষা ক্ষুরধার ব্যঙ্গের প্রকাশই সমধিক। সুজা ও পিয়ারার দৃশ্যগুলিতেও নাট্যকার নির্মল হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াসে ব্যাপৃত নন। দিলদারের হাসির পিছনে যেমন ব্যঙ্গ, পিয়ারার হাসির পিছনে তেমনি অশ্রুভারের স্তম্ভিত গোপন সঞ্চয়। সুজা-পিয়ারার দৃশ্যগুলিতে অবান্তর লঘুতার আতিশয্য, স্থান কাল অবস্থার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ না করবার একটা কষ্টসাধ্য কমেডি-সুলভ প্রয়াস যেন লক্ষিত হয়। সুজার উক্তিতেও এমনি একটা মন্তব্যে ('পিয়ারা তুমি কি কঠিন, ঘটনার রাজ্যে একবার ভুলেও এসে নামবে না ?'—৫ম অঙ্ক. ২য় দৃশ্য) প্রমাণ মিলবে যে নাট্যকারের মনেও এই আতিশয্য সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজনের কথা জেগেছে ; সামাজিকদের মনে এমন প্রশ্ন উঠতে পারে বলে যেন তিনি আশঙ্কা করেছেন।

নাদিরা-চরিত্রের ধীরতা ও গাম্ভীর্য এবং দারা-নাদিরা দৃশ্যের শোকাবহতা সুজা-পিয়ারার দৃশ্যে যাতে দ্বিতীয়বার আরোপের ফলে ক্লান্তিকর না হয়ে ওঠে সেই প্রয়োজনে তীক্ষ্ণ বৈপরীত্যের দ্বারা উক্ত দৃশ্য-নিচয়ে এবং বিশেষ করে পিয়ারার চরিত্রে অভিনবত্বের কল্পনা। নারী-চরিত্রের রূপ-বৈচিত্র্য-ও যেন কিছুটা নাটক-নিরপেক্ষ স্বকীয় প্রয়োজনে নাট্যকারের কল্পনাকে অধিকার করেছে।

পিয়ারার উপরে নাট্যকার দুরূহ কর্মভার অর্পণ করেছেন এবং সে ভার সে ব্রতের মতো গ্রহণ করেছে। যুদ্ধোন্মাদ ও প্রবল আত্মাভিমান যার চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য সেই সুজাকে সে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে চায়। চিত্তের বাসনাকে প্রেমে শুদ্ধ করে সহজ-সুন্দর এই পৃথিবীতে অমরাবতী রচনার ভার তার উপর। সাম্রাজ্যলোভ-দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের হিংস্র পরিবেশ থেকে দূরে শান্তি ও সৌন্দর্যের লীলানিকেতন গড়ে তোলবার নিষ্ফল

সাধনা তার। তার সর্বদা আশঙ্কা 'হয় ত যা আমাদের নাই, তা পাবো না ; যা আছে তা হারাবো' (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)। এই দিক দিয়ে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের নাদিরার সঙ্গে তার সাদৃশ্য স্পষ্ট। বস্তুতঃ নাদিরার সঙ্গে তার চরিত্রের বহিরঙ্গ ভেদ যতই থাক, অন্তশ্চর সাদৃশ্য অতি প্রবল। কিন্তু তার আপন সাধনার পথে সে একক। তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে সুজা বলছে, 'পিয়ারা, ঈশ্বর তোমাকে তৈরী করেছিলেন কেন? ঐ রূপ, ঐ রসিকতা, ঐ সঙ্গীত এমন একটা ব্যাপার ঈশ্বর এই কঠিন মর্ত্যভূমে তৈরী করেছিলেন কেন?' পিয়ারার উত্তর, 'তোমার জন্য প্রিয়তম।' নারীর সমস্ত শক্তি সামর্থ্য সম্পদ নিয়ে যে সাধনায় সে রত তা যে সফল হবার নয় তা সে জানে। ['তোমায় উপদেশ দেওয়া বৃথা। বীর তুমি। সাম্রাজ্যের জন্য যদিও না যুদ্ধ করতে, যুদ্ধ করবার জন্য তুমি যুদ্ধ করবে। তোমায় আমি বেশ চিনি—যুদ্ধের নামে তুমি নাচো!' (২য় অঙ্ক, ৪র্থ-দৃশ্য)] তথাপি তার ব্রতভঙ্গ চলবে না।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য সুজা-পিয়ারার শেষ দৃশ্য। এতদিনে গভীরতর অনুভূতির মুহূর্তে আরাকান-রাজের চরম অপমানকর প্রস্তাবে এবং সুজার মর্মস্পর্শী হাহাকারে তার মধুর ছলনার বাঁধ ভেঙে অশ্রু উদ্গত হয়েছে। সাম্রাজ্যলাভের প্রয়োজনে যে যুদ্ধ তাকে প্রতিহত করবার প্রয়াসে যে নিরত ছিল আজ সে—সম্রাট সাজাহানের পুত্রবধূ—স্বেচ্ছায় যুদ্ধ বরণ করছে। যে-যুদ্ধে পরাজয় ও মৃত্যু একমাত্র সুপরিজ্ঞাত পরিণাম তাতে স্বামীর সহযোগিনী হয়ে প্রাণত্যাগই যুদ্ধ থেকে স্বামীকে বিরত করে শান্তির নীড় রচনা করবার স্বপ্ন-সাধনার শেষ পুরস্কার।

সুজা-পিয়ারার দৃশ্যগুলিতে পিয়ারাই পাদপ্রদীপের সবটুকু আলো অধিকার করে সুজাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। সঙ্গীতে, কৌতুক-রসিকতায়, অশ্রু-চকিত হাস্যের উৎসারে সুজা ও প্রেক্ষাগারের দর্শকগণ

ভুলে আছেন যে খরধার একখানি অসি-ফলক সুজাকে কাশী থেকে খিজুয়ায়, মুঙ্গের থেকে রাজমহলে, রাজমহল থেকে ঢাকায় ও ঢাকা থেকে আরাকানে বিতাড়িত করে নিয়ে এসেছে। সুজার যুদ্ধোদ্যম, মন্ত্রণা, রণসজ্জা, যুদ্ধ,—এর কোনটাই মঞ্চের উপর ঘটে নি; যুদ্ধের আবহাওয়াটাও এই বিলাসকুঞ্জের কাছাকাছি বিশেষ কোন প্রভাব যে বিস্তার করেছে এমন অনুভব নাট্যকার সামাজিক-চিত্তে সঞ্চার করতে পারেন নি। যোদ্ধা বলে সুজা মাত্র দু'খানা প্রশংসা-পত্র পেয়েছে, একখানা পিয়ারার কাছ থেকে, আর একখানা বাহাদুরপুরের যুদ্ধে বিজয়ী নৈশ আক্রমণকারী সোলেমানের কাছ থেকে—'কাকা প্রকৃত যোদ্ধা। তিনি নৈশ আক্রমণের সম্ভাবনা জানতেন না?' (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) দিলদার যে-ভাবে মহম্মদের সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগবাহী পত্র সুজার হাতে দিয়ে উভয়ের মধ্যে ভেদ ঘটিয়েছে তাতে সুজাকে বুদ্ধিমান বলা কোন ক্রমেই চলে না। সাজাহানের এই পুত্রটির ঐতিহাসিক পরিচয় কী এবং নাটকে তার অনুসরণ অথবা তার চরিত্রের মৌলিক কল্পনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব কতটুকু?

সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, রুচি মার্জিত এবং ব্যবহার অমায়িক ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে ১৭ বৎসর নিরুদ্বেগ সংকটহীন শাসনকার্যের ফলে এবং এ-দেশেয় জলবায়ুর বিশেষ গুণে কর্মে অনুৎসাহ ও আলস্য তাকে গ্রাস করেছিল, এবং সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার ভোগলিপ্সা, নৃত্যগীতপ্রিয়তা। এরই ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনের মুহূর্তে তার কর্মতৎপরতা দেখা দিত এবং দেহ আয়েসী হয়ে পড়লেও বুদ্ধি সমান ক্ষুরধার ছিল। ইতিহাসে যার এই পরিচয় সেই সুজা দিলদারের অনতিপ্রচ্ছন্ন চাতুরীতে ভুলল কেন? সুজা যে অপদার্থ সামাজিকদের মনে এই ধারণাটাই কি বদ্ধমূল হয়নি?

দারা প্রথমে সামুগড়ে ও পরে আহমদাবাদের শাসনকর্তা সাহা-

নওয়াজের সহায়তায় দেওরাইয়ে—এই দু'বার যুদ্ধ করে ও পরাস্ত হয়। ১৬৫৮ সালের ২৯শে মে সামুগড়ের যুদ্ধ এবং পরের বৎসর ১২ই থেকে ১৪ই মার্চ দেওরাই-এর যুদ্ধ। দেওরাই-এর যুদ্ধে যশোবন্ত দারাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং সাহানওয়াজ তার সহায়তা করে একথা ইতিহাস থেকে নাটকে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সুজা যুদ্ধ করেছে দীর্ঘতর কাল এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্রে। কাশীর ৫ মাইল উত্তর-পূর্বে বাহাদুরপুরে জয়সিংহ ও দিলির খাঁর সহায়তায় সুলেমান নৈশ আক্রমণের ফলে (১৪ই ফেব্রুয়ারী—১৬৫৮ সাল) সুজাকে নৌকাযোগে পলায়নে বাধ্য করে। সাসারামের পথে পাটনা অভিমুখে পলায়নপর তার সৈন্যদের গ্রাম-বাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়। সুজা মুঙ্গেরে পৌছে পশ্চাদ্ধাবনপর সুলেমানকে বাধা দিতে মুঙ্গেরের পথ রুদ্ধ করল। সুলেমান মুঙ্গেরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৫ মাইল দূরে সুরযগড়ে হানা দিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করতে লাগল। এমন সময়ে ধর্মাটের যুদ্ধে সম্রাট বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ শুনে ৭ই মে বাংলা, পূর্ব-বিহার ও উড়িষ্যা সুজাকে ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করে আগ্রার পথে অগ্রসর হল।

২১শে জুলাই দিল্লীতে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে ঔরংজীব সুজাকে একখানি পত্রে বিহারের শাসনকর্তার পদ ও অন্যান্য সুবিধা সুযোগ দেবার প্রস্তাব করে।

পাঞ্জাবে দারার অনুসরণে ঔরংজীব ব্যস্ত জেনে অক্টোবরে সুজা সাজাহানকে মুক্ত করতে আগ্রার পথে অগ্রসর হল। কিন্তু এলাহাবাদের কিছু দূরে খিজুয়ায় (খাজোয়া) গিয়ে দেখে মহম্মদ সুলতান তার পথ রুদ্ধ করে অপেক্ষমাণ। দারার অনুসরণ ত্যাগ করে ঔরংজীব এবং দাক্ষিণাত্য থেকে মীর জুমলা এসে (২রা জানুয়ারী, ১৬৫৯) মহম্মদের সঙ্গে যোগ দিল। ৪ঠা জানুয়ারী শেষ রাত্রিতে ঔরংজীবের পক্ষের থেকে যশোবন্ত সিংহ তার ১৪০০০ রাজপুত সৈন্য নিয়ে মহম্মদের ও ঔরংজীবের

শিবির লুঠ করে পলায়ন করল। যশোবন্ত কোন কারণে মনে করেছিল তার প্রাপ্য সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সুজা যাতে তার এই ঔরংজীবের পক্ষ ত্যাগ করবার গোলযোগের মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে, তাতে তার ও সুজার উভয়েরই সুবিধা হবে, সেই ভেবে সুজাকে পূর্বাহ্ণে সংবাদও পাঠিয়েছিল কিন্তু সুজা এ-সংবাদ তাকে বিপন্ন করবার ছল মনে করে প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করে মূল্যবান সময় হারাল। পরদিন ৫ই জানুয়ারী ঔরংজীবের ৫০,০০০ সৈন্যের কাছে সুজার ২৩,০০০ অর্ধশিক্ষিত সৈন্য সম্পূর্ণ পরাস্ত হল।

সুজা পালাল কাশী ও পাটনা হয়ে মুঙ্গেরে, মুঙ্গের থেকে সাহেবগঞ্জে, সেখান থেকে রাজমহলে। পিছনে মহম্মদ ও মীর জুমলা। রাজমহলও শত্রুপক্ষ দখল করে নিলে সুজা গেল টাণ্ডায়, গৌড় থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে। বাঘে-কুমীরে যুদ্ধ সুরু হল। মীর জুমলার স্থল-বাহিনী, সুজার নৌবাহিনী। মীর জুমলার সৈন্য অনেক বেশী, সুজার কম হলেও ইউরোপীয় ও আধা-ইউরোপীয় গোলন্দাজ সৈন্যের অধীনে নৌ-রক্ষিত কামান। কখনও এ-পক্ষ, কখনও ও-পক্ষ জিতছে। এমন সময় ৮ই জুন রাত্রিতে মহম্মদ সুলতান দোগাছি (রাজমহলের ১৩ মাইল দূরে, মীর-জুমলার ঘাঁটি) থেকে পালিয়ে সুজার পক্ষে যোগ দিল। মীরজুমলার প্রভুত্বে অনেককাল থেকেই সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। সুজা তাকে সিংহাসনের ও কন্যা গুলরুখ বানুর পাণির প্রতিশ্রুতি দিয়েও অদূরদর্শী যুবককে বশীভূত করেছিল। ১৬৬০-এর ৮ই ফেব্রুয়ারী সুজাকে তার চরম বিপদের সময়ে ত্যাগ করে মহম্মদ সুলতান দোগাছিতে আবার ফিরে আসে, ফলে জীবনের অবশিষ্ট কাল হতভাগ্যকে কারাবাস করতে হয়।

১৬৫৯ সালের ডিসেম্বর থেকে নবীন উদ্যমে সুজা সৈন্য সংগ্রহ করে রাজমহল থেকে মুর্শিদাবাদে মীর জুমলার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু

বিহারের শাসনকর্তা দায়ুদ খাঁ সুজার বিপক্ষে অভিযান করে। এই উভয় শক্তির সঙ্গে মিলিত সংঘর্ষে সুজা ক্রমে যে-রাজমহল সে আয়ত্ত করেছিল তা ত্যাগ করল। মহানন্দার বক্ষে শক্তি পরীক্ষায় হেরে গিয়ে ৬ই এপ্রিল টাণ্ডায় পৌঁছে যে কাপড়ে আছে সেই কাপড়েই বেগমদের নিয়ে সে ঢাকায় যাত্রা করল। ঢাকায়-ও সুজা আশ্রয় পেল না। আরাকান-রাজের আশ্রয় প্রার্থনা করায় তাকে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ৫১ খানা জাহাজ পাঠিয়েছিল। কুড়ি বৎসর যে বাংলাদেশ সে শাসন করেছে সেই দেশ ও তার পিতৃপুরুষের অধিকার ভূমি ছেড়ে ১৬৬০-এর ১২ই মে সুজা যাত্রা করল এবং মোগল শাসনের বাইরে আরাকানে আশ্রয় পেল। সেখানে মোগল ও পাঠান বাসিন্দারা সুজার প্রতি সহানুভূতি দেখাল। সুজা মতলব করল আশ্রয়দাতা আরাকানরাজকে হত্যা করে মঘদের দেশের রাজত্ব অধিকার করে সেখান থেকে পরে আবার বাংলাদেশে অভিযান করবে। কিন্তু তার পরিকল্পনা আরাকান-রাজের কানে উঠল। অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পলায়নপর সাহ্ সুজার দেহ মঘেরা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল। [১৬৬১-এর ডাচ রিপোর্ট থেকে এই তথ্য জানা যায়।] অবশ্য সুজার মৃত্যুর কোন নিশ্চিত ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মহম্মদ বলেছে 'কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক জলমগ্ন হন। কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক যুদ্ধে নিহত হন। পুত্রকন্যারা আত্মহত্যা করে।' তবে পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সপত্নীক সুজার যে গৌরবময় মৃত্যুর কল্পনা করা হয়েছে, সুজা ও পিয়ারার চরিত্রকে নাট্যোচিত মহিমা অর্পণ করাই তার উদ্দেশ্য।

সাহ্ সুজার এই যে প্রায় আড়াই বৎসর ব্যাপী অবিরাম যুদ্ধ, যুদ্ধের উদ্‌যোগ, পলায়ন, নোতুন সৈন্য সংগ্রহ, সাময়িক জয়লাভ এবং চরম পরাজয়—এর ইতিহাস আমরা নাটকে চাই না কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহমূল নাটকে

এর ত্বরা উত্তেজনা চাঞ্চল্য আলোড়ন কতটুকু সঞ্চারিত হয়েছে? নাটকে যুদ্ধের কোন দৃশ্যই নেই, শুধু বিবিধ যুদ্ধের প্রস্তুতি ও ফল আভাসিত হয়েছে মাত্র। সে প্রস্তুতিও শুধু ঔরংজীবের—ব্যতিক্রম দারা-সাহানওয়াজের দৃশ্য। নাট্যকার যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর দূরাহ্বান-বধ-যুদ্ধ-রাজ্যদেশাদি-বিপ্লব নাটক থেকে বর্জনের নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে এমনটি করেছেন তা নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। পাছে স্বল্প-পরিসর রঙ্গমঞ্চে থিয়েটারী যুদ্ধের কৃত্রিম আস্ফালনে বাস্তবের বিড়ম্বনা ঘটে সেই ভয়ে সামাজিকগণকে কল্পনার অবাধ অধিকার দিয়ে প্রকৃত যুদ্ধ ব্যাপারটা নেপথ্যে সংঘটিত করেছেন। মনে হয় রাণা প্রতাপসিংহ নাটকের হলদিঘাটার যুদ্ধ অভিনয়কালে নিষ্প্রাণ বোধ হওয়ায় পরবর্তী নাটকসমূহে যুদ্ধ-দৃশ্যের সংস্থান বিষয়ে তিনি অধিকতর সংযম অবলম্বন করেছেন। যুদ্ধবিগ্রহাদি সংস্কৃত নাটকে বর্জিত হত রসের বিচারের দিক থেকে, আধুনিক নাটকে মঞ্চোপযোগী নয় বলে তার আভাসদান মাত্র মঞ্চব্যবস্থাপকের আয়ত্ত। কিন্তু নাট্যকারের কর্তব্য এখানে সেই কারণেই সমধিক দায়িত্বপূর্ণ। যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি, আর্তনাদ-হাহাকার, উন্মাদনা-জয়োল্লাস, বিদ্রোহ-ষড়যন্ত্র, কর্তব্যানুরাগ-বিশ্বাসঘাতকতা—সব-কিছু মিলে মানব-ভাগ্যের ও সভ্যতার উত্থান-পতনের এই মহাযজ্ঞের আয়োজন ও অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞশেষ ভস্মরাশির দিগ্-বিদিকে বিকিরণ নাট্যকার সূক্ষ্ম সংকেতে সামাজিকবর্গের দৃষ্টির সম্মুখে সংঘটিত করবেন। এই সাংকেতিক প্রকাশশিল্পের পক্ষে রঙ্গমঞ্চ ক্ষুদ্রায়তন নয়। ঘটনার দ্রুত ধাবনের আভাস এর পক্ষে প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ যুযুধান সৈন্যবর্গের প্রতিভূ কয়েকটি চরিত্রকে action-এর মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের যথাসম্ভব প্রকৃত রূপ প্রকাশ করতে হবে। বর্ণনাময় সংলাপও যে ঘটনার স্থান অনেকটা অধিকার করতে পারে, অবশ্য নাট্যকার যদি শক্তিমান হন, তার সাক্ষ্য মিলবে ম্যাকবেথ নাটকের

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রক্তাক্তদেহ বার্তাবাহী সৈনিকের যুদ্ধ-বর্ণনায়।

সাজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র মোরাদ বক্স মোগল সম্রাট বংশের কুলাঙ্গার। বল্‌খ, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট—যেখানেই তাকে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে সেখানেই সে নিজেকে অপদার্থ প্রতিপন্ন করেছে। যুদ্ধে বেপরওয়া সাহসী সৈনিক—এ ছাড়া তার সম্পর্কে আর কোন উচ্চতর প্রশংসাপত্র ইতিহাসে মেলে না। সৈনাপত্য গ্রহণের যোগ্যতা তার ছিল না। বুদ্ধি তার মোটা, মেজাজ তার চড়া, হিতাহিত বিবেচনা কম, রুচি অতি স্থূল, পান-ব্যসনে সে আকণ্ঠ নিমগ্ন—এই হচ্ছে মোরাদের পরিচয়। নাটকেও ঠিক এই রকমই তাকে দেখানো হয়েছে।

মোরাদ

সাজাহানের মৃত্যু-সংবাদে মোরাদ ও ঔরংজীব দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার চুক্তি করল। বাংলাদেশে সুজাকেও চিঠি দেওয়া হল অনুরূপভাবে চুক্তিবদ্ধ করবার জন্য কিন্তু দূরত্বের জন্য কোন পাকা বন্দোবস্ত করা সম্ভব হল না।

মোরাদ সৈন্য বৃদ্ধি করবার জন্য অরক্ষিত সুরাট লুট করে বহু অর্থ সংগ্রহ করল এবং ঔরংজীব যখন সাজাহানের মৃত্যু-সংবাদ যথার্থ কি না ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে দ্বিধাগ্রস্ত তখন অসহিষ্ণু মোরাদ নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে বসল (৫ই ডিসেম্বর, ১৬৫৮)। ঔরংজীব-মোরাদের মধ্যে কোরাণ ছুঁয়ে চুক্তি হয়েছিল সিংহাসন লাভ ঘটলে মোরাদ পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও সিন্ধু অংশে স্বাধীন রাজা হবে এবং মোগল-ভারতের অবশিষ্ট অংশ ঔরংজীব পাবে। আর যুদ্ধে লব্ধ সব সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পাবে মোরাদ, দুই-তৃতীয়াংশ ঔরংজীব। নাটকে কিন্তু বলা হয়েছে সমুদয় রাজত্ব মোরাদকে দিয়ে ঔরংজীব ফকির হয়ে মক্কা চলে যাবে এমন কথা ঔরংজীব বলেছে। (নাটকের

এই উপজীব্য তথ্যটি বার্নিয়ারের সাক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে কিন্তু এর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকরা সন্দিহান কারণ সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য মুসলমান ঐতিহাসিকদের সঙ্গে মেলে না। তাঁরা পূর্বোক্ত ভাগ বাঁটোয়ারার প্রস্তাবই ইতিহাস-সম্মত মনে করেন।)

ধর্মাটের যুদ্ধে মোরাদ তার স্বভাবসিদ্ধ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছে। যুদ্ধ ও রাজ্যলাভের সর্ববিধ প্রয়াসে কিন্তু ঔরংজীবের উপর সে নির্ভর করে চলেছিল। ধর্মাটের যুদ্ধের পরে মোরাদের পারিষদেরা তাকে বোঝায় যে সে ঔরংজীবের অপেক্ষা কোন দিকে ছোট নয় অথচ দিন দিন ঔরংজীবই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, অতএব সে যে ছোট নয় এটা ঔরংজীবকে বোঝানো দরকার। মোরাদ ক্রমে ক্রমে ঔরংজীবের সঙ্গে যোগাযোগ কমাল, ঔরংজীবের শিবিরে যাতায়াত-ও বন্ধ করল। চতুর ঔরংজীব বুঝল, মোরাদের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করবার সময় এসেছে। সে মোরাদকে ২০ লক্ষ টাকা ও ২৩৩টি ঘোড়া দিয়ে তার সমস্ত সন্দেহ দূর করে পলাতক দারার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করবার জন্য এবং যুদ্ধে অস্ত্রাঘাত থেকে মোরাদের সেরে ওঠার জন্য আনন্দ প্রকাশ করে জয়োৎসবের জন্য নিজের শিবিরে ডেকে পাঠাল। আগ্রা থেকে দিল্লী যাবার পথে মথুরায় ঔরংজীবের তাঁবু ফেলবার প্রয়োজনই হয়েছিল মোরাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ থেকে মুক্তি খোঁজবার জন্য। মোটা ঘুষ পেয়ে মোরাদের দেহরক্ষী নূরউদ্দীন খাওয়াস ঔরংজীবের নিমন্ত্রণ রাখতে মোরাদকে প্ররোচিত করল। মোরাদ শিকার থেকে ফেরবার পথে ঔরংজীবের শিবিরে প্রবেশ করল (২৫শে জুন, ১৬৫৮)। ঔরংজীব তাকে পান-ভোজনে আপ্যায়িত করল এবং তার পর মধ্যরাত্রে আকণ্ঠ মদ্যপানে সুপ্ত মোরাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে মেয়েদের ব্যবহারের উপযোগী ঘেরা হাওদায় অশ্বারোহী

সৈন্যের কড়া পাহারায় আলিমগড়ে এবং সেখান থেকে রাজ-কারাবাস গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠানো হল। গোয়ালিয়রে থাকা কালে মোরাদের হিতকামী বন্ধুরা তাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে। মোরাদ দুর্গ থেকে পলায়নে প্রায় সমর্থ হয়েছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজের হঠকারিতায় ধরা পড়ে। ঔরংজীব তাকে আর জীবিত রাখা নিরাপদ মনে করতে না পেরে তাকে তার কারাকক্ষে হত্যা করায় (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৬৬১)।

ইতিহাসে বা নাটকে মোরাদের তেমন একটা বড়ো ভূমিকা নয়। নাটকে ঔরংজীব তার দুঃসাহসিকতার উল্লেখ করেছে। নর্তকী ও মদিরায় ইতিহাসের অনুসরণেই নাটকে তাকে সমান আসক্ত দেখানো হয়েছে। অপর পক্ষে সুজার ভোগাসক্তিকে তার রুচির পরিমার্জনার কথা স্মরণ করে দাম্পত্যপ্রেমের অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যে-দৃশ্যে মোরাদকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে-দৃশ্যে স্পষ্টতঃ নাট্যকার যে স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন তাতে যুক্তি রয়েছে। ঔরংজীব যাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে তারা পৃথক পৃথক ভাবে ঔরংজীবের বিপক্ষ, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৈরিতার এবং তাঁদের চরিত্রের দোষ-গুণ আপন আপন ব্যক্তিত্বের দ্বারা সুচিহ্নিত কিন্তু এক দিক দিয়ে তাদের মধ্যে একপ্রকার সমান্তরালতা, সমানধর্মিতা বিদ্যমান। তারা সকলেই অন্যায়-যুদ্ধে, চক্রান্তে, মিথ্যা সন্ধির ফলে ঔরংজীবের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। এতে মানব-ধর্মের অঙ্গে যে আঘাত লাগে তাই স্মরণ করে নাট্যকার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বন্দী বধ্যভূমিতে নীয়মান অসহায় মোরাদকে সুজার কন্যার মুখে আশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন—'কেউ বাদ যাবে না। কেউ বাদ যায় না।' ঔরংজীবের জীবনের অন্তিম পর্বে অকরুণ ভাগ্যের মর্মান্তিক পরিহাস স্মরণ করেই কবি-করুণা এই সান্ত্বনাবাক্যে উৎসারিত হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য নাটকে কোন নীতি-ঘটিত তত্ত্ব বড়ো হয়ে উঠেছে কিনা এমন প্রশ্ন অসমীচীন নয়। নাটকে যে তত্ত্ব খুঁজতেই হবে এটা যেমন অনাবশ্যক তেমনি তত্ত্ব যেখানে স্বতোলভ্য সেখানে ঔদাসীন্য রসজ্ঞতার অভাব মাত্র সূচিত করে।

নাটকে নীতি

শেকস্‌পীয়রীয় নাটকে এবং তদনুসারী-নাটকাবলিতে নাট্যকারের আত্মগূহন একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ সংস্কার। অতএব নাট্যকারের ব্যক্তিজীবনের কোন আদর্শ বা নীতি বা তত্ত্বের প্রকাশ যদি নাটকে অঙ্গীকৃত হয় তবে তার প্রতিপাদন অনায়াসসিদ্ধ হওয়া দরকার। যদি কোন তত্ত্ব প্রবল হয়ে উঠে কুশীলবগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আচ্ছন্ন করে ফেলে, যদি নীতির প্রবলতর শক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণে চরিত্রগুলি বাজিকরের পাঞ্চালিকাবৎ আচরণ করে তবে রসসৃষ্টি বিঘ্নিত হয়; নাটকীয় ভ্রান্তি সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। আলোচ্য নাটকে তেমন কোন রস পরিপন্থী তত্ত্ব নেই। দেশপ্রেম ও সজাতিপ্রেমের আদর্শ বড়ো করে তোলবার প্রয়োজন রাণা প্রতাপসিংহ নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল অনুভব করেছিলেন, মেবার পতনে মানবমৈত্রী নীতির রসবিঘাতী প্রচার সর্বাতিশায়ী হয়ে উঠেছে। নূরজাহান ও সাজাহান নাটকে নীতি প্রচার গৌণ স্থান অধিকার করেছে। সাজাহান নাটকে এই প্রচারের দায়িত্ব বহন করছে মহামায়া ও সোলেমান। নাটকের সাহিত্যগত বিচারে মহামায়ার ভূমিকা অবান্তর। মহামায়ার যে-কটি দৃশ্য আছে তা যদি নাটক থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দেওয়া হত তা হলে নাটকের কোন অঙ্গ হানি হয়েছে বলে সামাজিকেরা অনুভবই করতে পারতেন না। মহামায়ার কিন্তু অন্যতর সার্থকতা আছে।· টড-এর Annals and Antiquities of Rajasthan গ্রন্থ থেকে গৃহীত যে-কাহিনীতে পলায়িত যশোবন্ত সিংহকে দুর্গে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, বলে বর্ণনা করা হয়েছে

নাটকে তার রূপায়ণের দৃশ্য (৪র্থ দৃশ্য) মঞ্চে প্রভূত সাফল্য লাভ করেছে। যে-যুগে নাটক রচিত হয়েছিল তখনকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে লিপ্ত বাঙালী দর্শকের কাছে এর সাদর অভ্যর্থনা জুটেছিল। তৎসত্ত্বেও বলা দরকার নাটকে মহামায়া চরিত্র একটি সচেষ্ট সংযোজন।

দেশাত্মবোধ ছাড়া আর একটি ভাবের প্রেরণা তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্য ও চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মূল ভাবটিকে আশ্রয় করেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ভোগের ঊর্ধ্বচারী আত্মোৎসর্গময় একটা সর্বাবয়বী নৈতিক বৃত্তি আছে, স্খলনে-পতনে দুঃখে-সঙ্কটে মনুষ্যত্বের সমুন্নত শিখরের দিকে দাম্পত্য জীবনকে সে আকর্ষণ করবে। এই নৈতিক বৃত্তির আবিষ্কার পোষণ ও সমৃদ্ধিতে জীবনের সার্থকতা। এই হচ্ছে মহামায়ার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে ধারণা। কিন্তু এই জীবনের অপর যে শরিকটি, যশোবন্ত সিংহ, সে সাধারণ মানুষ। মহামায়ার মত অসাধারণ কল্পনা তার বুদ্ধির অগম্য। স্ত্রীর কাছে সাধারণ মানুষের মতোই সে আরাম, বিরাম চায়। 'চেয়ে দেখ—ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরিশ্রেণী—দূরে ঐ ধূসর বালুস্তূপ।' এই থেকে 'শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাও, কথা কয়ো না।'—এই দুটি উক্তিতে (৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য) মহামায়ার যে ছবি ফুটে উঠেছে, দেশপ্রেমের সঙ্গে স্বদেশচেতনার যে কাব্যময় ভাবদীপ্ত প্রকাশ ঘটেছে দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র রচনার মধ্যে তা দুর্লভ। এবং একথাও স্মরণযোগ্য যে যশোবন্ত সিংহের ঠিক পরবর্তী উক্তিটি ('নিশ্চয় মস্তিষ্কের কোন রোগ আছে।') চরিত্রটির স্বাতন্ত্র্য ও নাট্যোচিত পৃথক ব্যক্তিত্বের চকিত সংঘাত এবং নাট্যকারের দৃষ্টি ভঙ্গীর নির্লিপ্ততা এক নিমেষে উদ্‌ঘাটিত করেছে। তথাপি একথা বলতেই হবে যে সমগ্র নাটকের কল্পনায় এই দৃশ্যই অবান্তর। নাটকের আপন প্রয়োজনে এ আসে নি, কাব্যের খাতিরে এ স্থান পেয়েছে। দেহে অবাঞ্ছিত মেদের মত নাট্যকারকে নির্মম-ভাবে এই ললিত ভাববিলাস থেকে নাট্যদেহকে মুক্তি দিতে হবে।

[প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে নাটকে টডের চমকপ্রদ কাহিনী অনুসরণ করতে গিয়ে যশোবন্তের চরিত্রের প্রতি একটু অবিচার হয়েছে বলে মনে হয়। টীকা-অংশে এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

মহামায়া দাম্পত্য জীবনের যে আদর্শ ঘোষণা করেছে এবং ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পঙ্কশয্যা থেকে যশোবন্তকে উদ্ধার করবার যে-চেষ্টা করেছে অথবা সোলেমানের যে নৈতিক আদর্শ ও বীরধর্ম নাট্য-ব্যাপারের অঙ্গীভূত হয়েছে কোন সার্থক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তা পুরস্কৃত হয়নি।

সুজার অনুসরণরত সোলেমান মুঙ্গেরে বসে খবর পেল ধর্মাট যুদ্ধে দারার পরাজয় হয়েছে, সে যেন অবিলম্বে গিয়ে পিতার সঙ্গে মিলিত হয়।

সোলেমান

তাড়াতাড়ি সুজার সঙ্গে সন্ধি করে সে আগ্রার দিকে ফিরল। এলাহাবাদ থেকে ১০৫ মাইল দূরে সে সংবাদ পেল (২রা জুন, ১৬৫৮) সামুগড়ে দারা চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হয়েছে। সৈন্যদলে সঙ্গে সঙ্গে ভাঙন ধরল। প্রধান সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলির খাঁ হারের দল ছেড়ে ঔরংজীবের পক্ষে গিয়ে যোগ দিল। সোলেমানের সঙ্গে রইল মাত্র ৬০০০ সৈন্য, যা ছিল তার এক তৃতীয়াংশেরও কম। আর রইল ভারস্বরূপ বহুমূল্য আসবাব, তৈজস আর বহু নারীর এক বিশাল হারেম। সোলেমান পাঞ্জাবে দারার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য নিরুপদ্রব পথ খুঁজে যাত্রা করল। পূব পশ্চিম দক্ষিণ সব পথ শেষ পর্যন্ত ঔরংজীব রুদ্ধ করেছে দেখে উত্তর দিকে সে চলল। হরিদ্বারের বিপরীত দিক দিয়ে গঙ্গার কূল ধরে শ্রীনগরে গাড়োয়ালের রাজা পৃথ্বী সিং-এর আশ্রয়ে গিয়ে সে নিঃশ্বাস ফেলল। আশ্রয় পেল এই সর্তে যে সে, তার পরিবার ও মাত্র ১৭ জন ভৃত্য নিয়ে সে থাকবে। এক বৎসর সোলেমান এখানে স্বস্তিতে ছিল। রাজা পৃথ্বী সিং তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে।

ঔরংজীব (১৬৫৯-এর ২৭শে জুলাই) রাজা রাজরূপকে সোলেমানের বিরুদ্ধে পাঠাল কিন্তু দেড় বৎসরের চেষ্টায়ও পৃথ্বী সিংহের আশ্রয় থেকে সে সোলেমানকে আয়ত্ত করতে পারল না। অবশেষে জয়সিংহ এল। গাড়োয়ালের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের সে গাড়োয়ালের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল। সোলেমানকে তার হাতে সঁপে দিলে পুরস্কারের লোভ এবং না দিলে প্রতিহিংসার ভয় দেখাতে লাগল। পৃথ্বী সিং তখন বৃদ্ধ। শরণাগতকে শত্রুর হাতে তুলে দেবার পাপ ও লজ্জা সে কোন মতেই স্বীকার করে উঠল না। কিন্তু তার যুবা পুত্র মেদিনী সিং পুরস্কারের লোভে এবং রাজ্যহানির ভয়ে বিবেক-দংশনের জ্বালা অবলীলাক্রমে জয় করল। সোলেমান রাজপুত্রের সংকল্পের কথা জানতে পেরে লাডকের দিকে পলায়নের চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে ধরা পড়ল। আহত ও বন্দী সোলেমানকে জয়সিংহের হাতে তুলে দেওয়া হল।

২রা জানুয়ারী তাকে দিল্লীতে নিয়ে পৌছান হল। ৫ই ঔরংজীবের সামনে তাকে হাজির করা হল। সোলেমানের রণখ্যাতি, তারুণ্য ও সৌন্দর্য এবং বর্তমান দুর্দশা সভাষদ্‌বর্গের এবং মোগল অন্তঃপুরিকাদের শঙ্কা-মিশ্র কৌতূহলের কারণ হয়েছিল। ঔরংজীব তাকে অভয় দিয়ে সদয় ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিল। সোলেমানের শঙ্কা চোখে মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল। সম্রাটকে যথাবিহিত অভিবাদন করে সে প্রার্থনা জানাল যে তাকে পোস্ত জল পান করানো যদি সম্রাটের অভিপ্রেত হয়, তবে তার চেয়ে সেই মুহূর্তেই তাকে বধ করা হোক। উচ্চকণ্ঠে ঔরংজীব ঘোষণা করল যে কখনও তাকে পোস্ত জল দেওয়া হবে না। তার পরে সোলেমানকে গোয়ালিয়র রাজ-কারাবাসে পাঠানো হল এবং একদিন পোস্ত-জল পান করে করেই হতভাগ্য সোলেমান প্রাণ-ত্যাগ করল (মে, ১৬৬২)। [পোস্ত যার মধ্যে জন্মে সেই খোসা

রাত্রিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। সকালে আফিংয়ের চেয়ে কিছু মৃদু মাদক জল বন্দীকে খেতে দেওয়া হত। ওই জল না খেলে অন্য কোন খাদ্য তাকে দেওয়া হত না। নিয়মিত মাদক জল পানে ক্রমে শরীর শীর্ণ, বুদ্ধি বিকল ও চৈতন্য লুপ্ত হত এবং অবশেষে তার মৃত্যু হত।)

নাটকের সোলেমান সুন্দর জিতেন্দ্রিয় যুবা পুরুষ। যে কারণে তার মোগলের হাতে সমর্পণ স্বাভাবিক, যা ঐতিহাসিক সত্য, নাটকে তার স্বীকৃতি নেই। অবশ্য ইতিহাসের অতন্দ্র অনুসরণ নাট্যকারের যে অবশ্য কর্তব্য তা নয় বিশেষতঃ যখন ইতিহাসের গৌণ চরিত্র ও ঘটনা নিয়ে নাটকের কারবার। কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণ কী? সোলেমান নাট্যকারের আদর্শ চরিত্র। মহামায়া যে নৈতিক আদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা করেছে নাটকে সেই আদর্শের রূপায়ণ ঘটেছে সোলেমান চরিত্রে। এই নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে তার মুখেও নাট্যকার অস্থানে অকারণ বক্তৃতা দিয়েছেন তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জহরতের হাত থেকে ঔরংজীবকে রক্ষা করবার হাস্যকর অতিনাটকীয়তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সোলেমানের সঙ্গে ঔরংজীব-পুত্র মহম্মদের কিছু মিল আছে। সোলেমানের কাছে তার পিতার আজ্ঞা 'ঈশ্বরের আজ্ঞা'। মহম্মদের মধ্যে চলিষ্ণুতা একটু বেশি। শেষ পর্যন্ত সে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু পিতৃভক্তি অপেক্ষাও বড়ো ন্যায়ধর্ম ও মানবধর্মের প্রতি অনুরক্তির ফলেই যে তার দুঃখভোগ এই ভাবটাই প্রাধান্য লাভ করেছে। সোলেমান ও মহম্মদ নাটকের ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার আকাশে নিরুত্তাপ ক্ষীণদীপ্তি জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ।

ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নূতনতর ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, দ্রুতবেগে চরিত্রগুলির অদৃষ্টলিপির নব নব অধ্যায় প্রকাশ পেয়েছে। যুধ্যমান ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রহরণ যার সর্বাপেক্ষা অধিক ও অমোঘ—শক্তি পরাক্রম ক্রূরতা শাঠ্য বিশ্বাসঘাতকতা অবিবেকিতা—তারই

জয়লাভ ঘটেছে। নাট্যশেষে কোন নির্দিষ্ট তত্ত্ব দর্শকের মনে রেখাপাত করে না। ঔরংজীবের জয়লাভে ভ্রাতৃবিরোধের অবসানের ফলস্বরূপ কোন গভীর তৃপ্তি দর্শক চিত্তে সঞ্চারিত হয় না। যে দারা যুদ্ধে দ্বিধাগ্রস্ত তার হত্যা, যে মোরাদ অসমসাহসী তার অসহায় বন্দিত্ব, যে যুদ্ধোন্মত্ত বীর সম্রাটপুত্র সেই সুজার অসহনীয় অপমান এবং সর্বোপরি মানুষের শুচি-সুকুমার বৃত্তিনিচয়কে ব্যঙ্গ করে অকল্যাণময় পশুশক্তির দুর্বার অভ্যুত্থান এক ভীতিকর করুণ আশাহীন প্রতিকারহীন ঘন তমিস্রার মধ্যে সাজাহানের মতোই সামাজিকচিত্তকে বিহ্বল বিমূঢ় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করে। এই বিহ্বলতা পাছে আমাদের রসচেতনার পরিপন্থী হয়ে পড়ে তাই ঔরংজীবের বিভীষিকা দর্শনে (৫ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) ও সাজাহানের কাছে তার ক্ষমা ভিক্ষায় এবং পরিশেষে, এই ক্ষমা নাটকের মূল ভারকেন্দ্রকে চঞ্চল না করে তোলে সেই উদ্দেশ্যে জহরৎ উন্নিসার অভিশাপ উচ্চারণে নাটকের উদ্দিষ্ট রসের দ্যোতনা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে জাহানারার অনুরোধে মৃত্যুর কিছু পূর্বে সাজাহান ক্ষমা পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন কিন্তু নাটকে জাহানারার চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করবার প্রয়োজনে সাজাহানের অনুরোধে জাহানারা কোনক্রমে ক্ষমাবাক্য উচ্চারণ করেছে।

ঔরংজীবের বিভীষিকা-দর্শন ও সাজাহানের ক্ষমাভিক্ষা এবং জহরতের অভিশাপ নাট্যকারের কবি-করুণার (poetic justice) ফল। বিশুদ্ধ হাস্যরসের উৎসার আলোচ্য নাটকে দুর্লভ। দিলদার চরিত্রের উপরে রঙ্গ রসিকতা দ্বারা নাটকে কোন কোন স্থানে লঘুতর আবহাওয়া সৃষ্টির ভার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণ বিদূষকের

দিলদার

সঙ্গে তার একটা মৌলিক পার্থক্য এই যে, দিলদার শুধুই হাসায় না। তার হালকা হাসির অন্তস্তলে

কঠিন সত্যের দুষ্প্রেক্ষ্য দীপ্তি প্রকাশমান। কিং লিয়ার নাটকের Fool এবং Kent-এর প্রভাব এর উপর অতি স্পষ্ট (টীকা দ্রষ্টব্য) এবং গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা নাটকের করিমচাচায় এর পূর্বাভাস ছিল। নাটকে দার্শনিক ধরণের চরিত্রের দিকে নাট্যকারের যে আকর্ষণ রাণা প্রতাপসিংহ নাটকের শক্তসিংহে দেখা গিয়েছিল দিলদারের মধ্যে তার আংশিক অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়; অবশ্য দিলদার চরিত্রের দার্শনিকতা অর্থহীন অতিনাটকীয় জল্পনা-মাত্র।

দিলদারের হাসিতে সহজ সহৃদয়তার একান্ত অভাব; তার হাসির প্রয়াস 'ব্যঙ্গের ধূম হয়ে ওঠে'। মোরাদের সে বিদূষক। মোরাদের প্রবেশ সম্পর্কে সে বলছে, 'এই যে বর্বর আসছে।' (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)। মনস্তত্ত্ববিদ্ বলে দিলদারের অহমিকা প্রবল। মোরাদ সম্পর্কে সে বলছে, 'মনোরাজ্য ওর কাছে একটা অনাবিষ্কৃত দেশ' (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)। ঔরংজীবের হাতে মোরাদের পরিণাম সে পূর্বাহ্ণেই অনুমান করেছে কিন্তু যে মোরাদ তার গভীরার্থ বাক্‌কেলির তাৎপর্য বোঝে না তাকে সে সতর্ক করে দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। এই হৃদয়হীনতা তার হাসি থেকে সবটুকু আলো গ্রাস করেছে।

ঔরংজীবের মনোজগতে সঙ্কট সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট ও অভ্রান্ত। ঔরংজীবের বিভীষিকা-দর্শনের সে ভাষ্যকার। তার পরিচয় তার মুখে 'প্রথমে পাঠক! (বোধ হয় সে ফলিত রাজনীতির পাঠ নিতে এসেছে বলে পাঠক) তার পরে বিদূষক! তার পর রাজনৈতিক! তার পরে বোধ হয় দার্শনিক!' নাটক থেকে বিদায়ের কালে ঔরংজীবের সম্ভ্রম উদ্রিক্ত করে সে এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে।

শুধুই হাস্যরস পরিবেষণের জন্য যাত্রায় ভাঁড়ের স্থান রয়েছে।

কাহিনীর সঙ্গে তার বিশেষ যোগ নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে দার্শনিকতার বাড়তি পসরা বহন করেও দিলদারের স্থান নাটকের ভিতর মহলে হয়নি। নাটকে দু'টি জায়গায় তাকে কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। মহম্মদের কাছে লেখা ঔরংজীবের কপটপত্র সুজার হাতে তুলে দেবার ভার দেওয়া হয়েছে দিলদারকে আর দারাকে সে জীবনপণ করে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নাটকে তার যে পরিচয় শেষ পর্যন্ত ব্যক্ত করা হয়েছে তাতে 'একবার একটা সামান্য চাকুরীতেও নেমেছি' বলে কপটপত্র বইবার গ্লানি ধুয়ে মুছে ফেলবার মতো নয়। ঔরংজীবের পক্ষ অবলম্বন করে তার এই প্রতারণাময় চাকুরী (চাতুরী ?) মহম্মদের কারাবাসের জন্য দায়ী।

দারাকে মুক্ত করবার প্রয়াসে যেখানে সে কারাকক্ষে দারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে সেখানে তার আচরণে ও সংলাপে বাস্তবতার স্পর্শ নেই। অনর্থক বাগ্‌বিস্তার ও থিয়েটারি উচ্ছ্বাসই সেখানে প্রবল হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ চরিত্রটি নাট্যব্যাপারের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে নি। জীবন-মরণ সংকটে যখন প্রতিটি নিমেষকাল অমূল্য তখন কারাকক্ষে অপরিমিত অর্থহীন কাব্যোচ্ছ্বাস অথবা সুজার হাতে কপটপত্র তুলে দেবার সময় তার ছেলে-ভুলানো সংলাপ চরিত্রটির অবাস্তবতাই প্রকট করে তুলেছে। দিলদার শেষ পর্যন্ত অতিনাটকীয়তার ছাপ বহন করে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের বিরুদ্ধে সমালোচকের যে-সব অভিযোগ আছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে দুটি। তার নাট্যাবয়বের সঙ্গে অবয়বীর অর্থাৎ দৃশ্যগুলির সঙ্গে সমগ্র নাট্যদেহের অবিচ্ছেদ্য অনিবার্য যোগ নেই। দ্বিতীয়তঃ অতিনাটকীয়তা অনেক সময় নাটকীয় ভ্রান্তি সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ নাট্যদেহের গঠন-কৌশলের প্রসঙ্গে আসা যাক।

একত্রিশটা দৃশ্যের সমব'য়ে যে নাটক গড়ে উঠেছে সে নাটকে সাজাহান স্থান পেয়েছেন মাত্র ছ'টি দৃশ্যে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের পরে তিনি মঞ্চ-প্রবেশ করছেন চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে। অন্তর্বর্তী তেরটা দৃশ্যে তাঁর প্রবেশ নেই। ঘটনাস্রোত অবারিত হয়েছে তাঁকে কেন্দ্র করে এবং তাঁরই ভ্রমের ফলে তাতে বেগসঞ্চার ঘটেছে, এর অনিবার্য বহুমুখ আঘাত তাঁকেই বহন করতে হয়েছে এবং তাঁরই দৃষ্টি ও অনুভবের মানদণ্ড দিয়ে পারিপার্শ্বিকতার সমস্ত কারুণ্য ও ভয়াবহতার পরিমাপ হয়েছে। অথচ দীর্ঘকাল তাঁর মঞ্চে অদর্শনের কারণ কী? মনে হয় সাজাহানের মঞ্চে উপস্থিতি নূতনতর কোন ঘটনাস্রোত উন্মুক্ত করবে না, ক্লান্তিকর বৈচিত্র্যহীন হয়ে উঠবে সেই কারণেই তাঁর এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি। কিন্তু যে-দুটি চোখের আলোয় নাটকের বস্তু বিশ্বের অন্তশ্চর ভাবজগতের সঙ্গে সামাজিকদের পরিচয় নিবিড় হবে তাকে নিয়মিত হ্রস্বকালের ব্যবধানে মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ত সঞ্চালিত করা সম্ভব হত তাঁকে আরো অধিকসংখ্যক দৃশ্যে স্থান দিয়ে নয়, অন্তর্বর্তী দৃশ্যগুলির সংখ্যা কমিয়ে।'

মহামায়ার দৃশ্যগুলিকে নাট্যদেহে শ্লথ-সন্নদ্ধ বলে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সোলেমানের অতিনাটকীয় উক্তিকেও পরাস্ত করে জহরৎ উন্নিসার ঔরংজীবকে হত্যা করবার প্রয়াস ও নাট্যকারের আদর্শ চরিত্র সোলেমানের ঔরংজীবকে রক্ষা অতিনাটকীয়তার শীর্ষ বিন্দুতে আরোহণ করেছে। জহরৎ উন্নিসার এই অতিনাটকীয় বীরত্বের ভূমিকা রচিত হয়েছে প্রথমে তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের অন্তিম উক্তিতে এবং তা দৃঢ়তর করা হয়েছে একটা পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যে—চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, যেখানে সিপারকে সে গুপ্তহত্যায় প্ররোচিত করছে। প্রকৃতি তার বিচিত্র খেয়ালে কখনও কখনও মনুষ্য-দেহের কর-পদে

অতিরিক্ত দু'একটি অঙ্গুলি যোজনা করে থাকে। নাট্যদেহে এ সকল অংশও তেমনি অবাঞ্ছিত বাহুল্য।

জয়সিংহ-যশোবন্ত সিংহ-দিলীর খাঁ-মীরজুমলা-শায়েস্তা খাঁ নাটকের কিছু স্থান অধিকার করে আছে। এরা মোগল শাসনের এক একটি স্তম্ভ। এদের মধ্যে মীর জুমলা ও শায়েস্তা খাঁর ভূমিকা নাটকে ক্ষুদ্র ও যথাযথ। দিলীর খাঁ দারার পক্ষ ছেড়ে শেষ পর্যন্ত কখন যে ঔরংজীবের পক্ষে এসে যোগদান করল তার কোন উল্লেখ নেই।

দারার পক্ষ ত্যাগ করবার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র, সুজার সঙ্গে মিথ্যা সন্ধি যশোবন্ত সিংকে ঔরংজীবের পক্ষে যোগদানে প্ররোচনা দান ইত্যাদি কাজে জয়সিংহকে নাটকে ব্যাপৃত দেখা গেছে। বস্তুতঃ মধ্য এসিয়ার বল্‌খ থেকে দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর, পশ্চিমে কান্দাহার থেকে পূর্বে মুঙ্গের পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের এমন কোন জায়গা বড় নেই যেখানে সাম্রাজ্যের পক্ষে সে যুদ্ধ করে নি। যোদ্ধা হিসাবে যতখানি তার প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল তার চেয়েও বেশি হয়েছিল কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে। পারসী ও তুর্কী ভাষায়, উর্দু ও রাজপুতদের বিভিন্ন উপভাষায় তার অধিকার ছিল এবং নানা জাতির সম্মিলনে গঠিত মোগলবাহিনীর পরিচালনায় তার ভাষাজ্ঞান তার কর্মদক্ষতার সহায়ক ছিল। বুদ্ধি, কর্মকৌশল, ধৈর্য ও মুসলমানি সামাজিক আচার-ব্যবহার জ্ঞান—নানা গুণের আকর ছিল জয়সিংহ। জটিল সূক্ষ্ম রাজকর্মে তাকে নিয়োগ করে সাজাহান নিশ্চিন্ত থাকতেন। এই কারণে নাটকেও কূটনীতি ও ভেদনীতির ক্ষেত্রে জয়-সিংহ সক্রিয় ভূমিকা পেয়েছে। অবশ্য এর সঙ্গে ন্যায়নীতির কোন যোগ নেই। তার নিজের ভাষায়—'সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশী পাবো, সেইখানেই যাবো। ঔরংজীব কম দামে বেশী দিচ্ছে। এই ধ্রুব সম্পদ ত্যাগ করে অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাই না।' নাট্যকার এখানে সুবিধাবাদীর যে চরিত্রটি এঁকেছেন তার

ভাষা বোধ হয় আধুনিক বণিগ্‌ধর্মী মাড়ওয়াড়ীদের জীবন থেকে নিয়েছিলেন।)

জয়সিংহ চরিত্রে রাজপুত জাতির প্রতিনিধিত্ব-মূলক যে দিকটা ধরা পড়েনি যশোবন্তের চরিত্রের মধ্যে তারই প্রকাশ আছে। রাজপুত চরিত্রের প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ, স্বাভাবিক ঔদার্য, বেপরওয়া সাহস, সাংসারিক বুদ্ধিবর্জিত মহানুভবতা, নিরুদ্বেগ সারল্য—যশোবন্তের চরিত্রের এই দিকগুলি সাধারণ রাজপুত চরিত্রেরই লক্ষণ। ধর্মাটের যুদ্ধে পরাজয়ের পর যশোবন্ত যে পক্ষ পরিবর্তন করেছে এতে বিস্ময়ের কারণ নেই। মোগলদের গৃহযুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে তার পক্ষে নীতির প্রশ্ন আসে না। বস্তুতঃ নীতিগত প্রশ্নের স্থান সে-কালের রাজনীতি জীবনে কোথাও ছিল না। যেখানে সম্রাট থেকে নিম্নতম সোপানের রাজকর্মচারী উৎকোচের বশ ছিল, কৃতঘ্নতা ও মিথ্যাচার সাফল্যের মূল্যে নিন্দা-প্রশংসা পেত, রাজভ্রাতা হয়ে জীবন ধারণের অধিকার ছিল না সেখানে নীতির স্থান কোথায়? যেখানে সন্দেহের বিষবাষ্প সম্রাটের পুত্র সেনাপতি সৈন্যাধ্যক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের জীবনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে সম্মান ও ঐশ্বর্যের শিখর থেকে অতলস্পর্শ গহ্বরে পতন একটি মুহূর্তে ঘটতে পারে এবং জীবনব্যাপী প্রভুসেবার পুরস্কার জায়গীর-চ্যুতি সম্পত্তিগ্রাস দারিদ্র্য অপমান মৃত্যু সেখানে নীতির স্থান কোথায়? খাইবার পাস-এর জামরুদে মোগলবাহিনী পরিচালনাকালে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর (১০ই ডিসেম্বর, ১৬৭৮) সংবাদ পাওয়া মাত্র ঔরংজীব তার রাজ্য দখল করে নিল। এগার বৎসর আগে যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম গৌরব জয়সিংহের বিজাপুর অভিযানে বিপর্যয়ের পরে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হল। যুদ্ধে তার নিজের তহবিল থেকে ব্যয়িত এক কোটি টাকার এক পয়সাও দেওয়া হল না। যে প্রতিকূল অবস্থায় তাকে

যুদ্ধ করতে হয়েছে তাতে যে জয়লাভ মানুষের পক্ষে অসম্ভব সে-কথা ঔরংজীব বিচার করল না। অপমানিত বৃদ্ধ জয়সিংহ প্রভুভক্তির এই শেষ পুরস্কার লাভ করে বৃথা মনোক্ষোভ বহন করে পদচ্যুতির (মে, ১৬৬৭) কিছুদিন পরে দেহত্যাগ করল (২৮শে অগষ্ট, ১৬৬৭)।

জয়সিংহের দৃশ্যগুলিতে তার ধীশক্তি ও অন্যান্য সদ্‌গুণগুলি ফুটে ওঠেনি, তবে চক্রান্ত প্রতারণা প্ররোচনা ইত্যাদির বিষবাষ্প সঞ্চারে পারিপার্শ্বিক যে আবিলতা যুদ্ধব্যাপারের আনুষঙ্গিক অঙ্গসজ্জা তার নির্মাণকল্পে চরিত্রটির ব্যবহার একটা বাস্তবতার স্পর্শ নিয়ে এসেছে। অপরপক্ষে যশোবন্ত সিংহ তার অপরিমিত অতিনাটকীয় পরুষভাষণে প্রেক্ষাগারে উপস্থিত দর্শকসমাজের করতালিময় সংবর্ধনা আশা করে মোগল সম্রাটের দরবারে অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। মঞ্চ-সাফল্যের দিক থেকে অভিনন্দন যোগ্য এমনি একটি দৃশ্য দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য। দারা যখন সামুগড়ের যুদ্ধে পরাস্ত, মোরাদ বন্দী, সে নিজে ধর্মাটের যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাজিত তখন দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় ঔরংজীবকে সুজার বিরুদ্ধে সৈন্য সাহায্য করতে এসে সম্রাট সাজাহানকে কেন বন্দী করা হল সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু স্থিরবুদ্ধি সাহিত্যরসিকের পাঠ-ভবন এক জায়গা আর অভাবনীয়ের অতর্কিত আবির্ভাব বরণ করে নেবার জন্য উৎসুক সামাজিকদের সম্মুখে পাদ-প্রদীপের উজ্জ্বল আলোতে স্বপ্নরাজ্যের মত বিরাজমান রঙ্গমঞ্চ আর এক জায়গা। সেখানে মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্‌বিকাশের মত সংঘাতশীল পরুষবাক্যের দর্পিত বিনিময় এবং সুরক্ষিত সম্রাট দরবারে রাজপুত বীর যশোবন্ত ন্যায়-ধর্মের পক্ষে একক যোদ্ধা—এই আয়োজনেই কল্পনার আতশবাজিতে আগুন ধরে যায়। এর পরে শায়েস্তা খাঁর কথার দর্পিত প্রতিবাদ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে পার্শ্বপটের (Wings) আড়াল থেকে নাট্যপ্রসিদ্ধ রীতিতে জাহানারা যখন প্রবেশ করল তখন

আতশবাজি মুহূর্তে সুদূর জ্যোতিষ্কলোকে গিয়ে পৌঁছেছে। এ দৃশ্যে জনতা-চিত্তের মূর্ত পরিবর্তনশীলা রূপ পেয়েছে। বক্তৃতা নাট্যকার জাহানারা ও ঔরংজীব উভয়ের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করে এবং ঔরংজীবের কূটবুদ্ধি ও লোকচরিত্র-জ্ঞানের প্রশংসনীয় অধিকার এই দৃশ্যে সুপরিস্ফুট করে ঔরংজীবকেই জয়ী করেছেন। যে-যশোবন্ত সিংহ দৃশ্যটির প্রথমভাগে উত্তেজনা ও কৌতূহল সঞ্চার করেছিল শেষ পর্যন্ত ঔরংজীবের জয়ধ্বনিতে সেও আপন কণ্ঠ মিলিয়েছে (তৃতীয় অঙ্কে ষষ্ঠ দৃশ্যের জয়সিংহের কাছে যশোবন্তের স্বীকৃতি-মূলক উক্তি স্মরণীয়)।

অতিনাটকীয়তা যে শুধু ঘটনা প্রবাহকেই আশ্রয় করে তা নয়, অনেক সময় ভাব ও ভাষাকে করে থাকে। কখনও ভাবটা খাঁটি থাকে, ভাষাটা হয় কৃত্রিম, এবং তার ফলে ভাবটাও মেকি হয়ে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় আলঙ্কারিক ভাষার প্রয়োগ মাত্রাতিরিক্ত এবং সে ভাষা অস্থানোপচিত ; যে চরিত্রের মুখে তার প্রয়োগ অথবা যে অবস্থায় প্রয়োগ স্বাভাবিকতার সঙ্গতির অভাবে তার সুরটা কানে বাজে না। অতএব এ-ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের কোথাও গৌরব কোথাও অসহ দুর্বলতা। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ববর্তী কোন নাট্যকারের যে এ ভাষা অনায়ত্ত ছিল তা সর্বজনবিদিত। বিশেষ করে ঐতিহাসিক নাটকে ভাষার যে প্রাত্যহিকতা থেকে এক অলিখিত মাত্রা পর্যন্ত সমুন্নয়নের প্রয়োজন একথা স্বীকার করেও দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবাবেগ-কম্পিত ভাষার সম্পর্কে সমালোচকগণ বিরুদ্ধ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়ে থাকেন। দু'-একটি উদাহরণের মধ্যে নাট্যকারের এই দুর্বলতা নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে জাহানারা সাজাহানকে উত্তেজিত করছে—'উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে উঠুন।...তবে তার সঙ্গে পারবেন।' এ যাত্রার অস্থানোপচিত বীরত্ব।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পিয়ারার শেষ উক্তি ‘আজ তবে এই রূপ নির্বাণোন্মুখ শিখার মত উজ্জ্বল প্রভায় জ্বলে উঠুক।...আজ আমাদের শেষ মিলন রাত্রি।’ এ ভাষার অলঙ্কারের, এর কাব্যমহিমার প্রশংসা না করে উপায় নেই। এ লাইন লিখে কোন প্রাণে লেখক কেটে ফেলবেন? কিন্তু এ কাব্য, এ নাটক নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল আপন রচনার প্রতি প্রয়োজনের অনুরোধে যথেষ্ট নির্মম হয়ে উঠতে পারেন নি।

সাজাহান নাটকে ন’টি গান আছে। এর মধ্যে পিয়ারার মুখে দেওয়া হয়েছে পাঁচটি, মহামায়ার চারণী ও চারণ বালকদের মুখে

সঙ্গীত

দুটি এবং কাশ্মীররাজের প্রমোদোদ্যানের রমণীরা ও মোরাদের নর্তকীগণ একটি করে গান গেয়েছে। দু’-খানা বৈষ্ণব পদ বাদ দিলে অবশিষ্ট গানগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত। এ গানগুলির মধ্যে কয়েকটি বাংলা গীতি-সাহিত্যের গৌরব।

মহামায়ার চারণীগণের গান ‘সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে’ ইত্যাদি বোধ হয় একমাত্র বাংলা গান যে-গানে যুদ্ধের বর্ণনা তার সমগ্র বাস্তব রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এবং যে-গান সমবেত কণ্ঠে গাইবার।

‘সেথা বর্মে বর্মে কোলাকুলি হয়;
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
ভ্রূকুটির সহ গর্জন মিশে, রক্ত রক্ত সনে।

এবং

‘সেথা রুধির-সিক্ত অসিত অঙ্গে
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে
গভীর আর্তনাদের সঙ্গে বিজয়-বাদ্য বাজে।’

এখানে রণাঙ্গনের যে-চিত্র যুক্তাক্ষরের বজ্র-সংঘাতে দ্যুতিময় হয়ে

উঠেছে বাংলা ভাষায় তাকে অতিক্রম করে কবির কল্পনা কোথাও অগ্রসর হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

এ-গান রাজপুত-নারীর কণ্ঠের গান, তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য-ও সঙ্গে সঙ্গে কবি এর মধ্যে প্রকাশ করেছেন। গানটির আবর্তনশীল ধ্রুবপদ 'সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির; উঠ বীরজায়া বাঁধো কুন্তল মুছ এ অশ্রুনীর।' এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক। বীর ও করুণের অপূর্ব মিশ্রণ শৃঙ্গারের ক্বচিৎ সম্পাতে রমণীয় হয়ে উঠেছে।

রাজপুতনার পরিবর্তে বাংলা দেশের ছবিটি 'ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা' ইত্যাদি গানটিতে ফুটে উঠেছে বলে চারণ-বালকদের মুখের গান-খানির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। ছবিখানা পুরোপুরি বাংলা দেশেরই বটে; 'এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে' 'ধূম্র পাহাড়'-কে ছাপিয়ে উঠেছে। কিন্তু এর ভাবাবেগ সর্বজনীন, সর্বদেশের দেশপ্রেমিকের প্রাণের কথা এতে ভাষা পেয়েছে। এ গান বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

কাশ্মীরের রাজোদ্যানের নারীদের গানে অসামাজিক প্রণয়ের আহ্বান ফুটে উঠেছে। মোরাদের নর্তকীদের গানখানি কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর। নৃত্যের ছন্দ ও গানের সুর অনায়াসে এতে সঙ্গতলাভ করেছে। প্রেম মনুষ্য-জীবন পাখীর গান ও জ্যোৎস্নালোক এর সূক্ষ্মতন্তুগুলি রচনা করে এক বিচিত্র ভাববসন বয়ন করেছে। মানবের চিরন্তন বাসনালোকে যে এক অর্ধজাগর মুহূর্তের সৃষ্টি এই জাতীয় কাব্যের লক্ষ্য সে-লক্ষ্যে এ গান নিঃসংশয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

পিয়ারার মুখে, মোগল অন্তঃপুরিকার মুখে কেন বৈষ্ণব কবির গান দেওয়া হল এ নিয়ে সমালোচক মহলে অভিযোগ উঠেছে। কবির স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে অনবধান এ বিষয়ে দায়ী বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু এই সঙ্গীত রসিকা মুসলমান মহিলা সুদীর্ঘকাল বাংলা

দেশে বাস করে যে-সপ্তদশ শতকে কানু ছাড়া গীত ছিল না সেঃ সময়ে যদি বাংলাদেশের দু' একটি গান করে থাকেন তাতে অসঙ্গতি কোথায় ? সুজার যে নৃত্য-গীত-বিলাসে রুচি ও আকর্ষণ ছিল না তা তো নয়, সুজা যে গোঁড়া মুসলমান ছিল তা-ও নয়, বৈষ্ণব পদ গান করলে যে বৈষ্ণব হতে হয় তা-ও নয়। মুসলমান কবিরা স্বধর্ম ত্যাগ না করে-ও বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। তবে পিয়ারার মুখে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদ শুনে আমাদের বাস্তবতাবোধ আহত হতে গেল কেন ?

পিয়ারার গানগুলি প্রণয়-সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য যে কোন পূর্ববর্তী নাট্যকারের গানের সঙ্গে তুলনা করলে এগুলির বৈশিষ্ট্য সহজে ধরা পড়বে। দ্বিজেন্দ্রলাল যে এই শ্রেণীর গানের ভাব-সমুন্নয়ন সাধন করেছেন বাঙালী শ্রোতার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'তুমি বাঁধিয়া কি দিয়ে' ইত্যাদি সঙ্গীতটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুরধারার যে সহজ উচ্ছ্বাস শ্রোতাকে অভিভূত করে তাতে-ই এ-রচনা যে শুধু পঠনীয় কবিতায় সুর-সংযোগ মাত্র নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাহানারা

দ্বিধাগ্রস্ত রাজশক্তিকে স্বীয় কর্তব্যে উদ্‌বুদ্ধ করে এবং নাটকে গতি সঞ্চার করে জাহানারা প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই সামাজিকগণের সপ্রশস্তি অভিনন্দন লাভ করেছে। স্নেহাতুর সাজাহান এবং বশংবদ দারার কথার সূত্র ধরে পার্শ্বপটে আড়াল থেকে যে মুহূর্তে সে প্রবেশ করেছে সেই মুহূর্তেই তার ব্যক্তিত্ব আপন স্বকীয়তা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যুক্তির বলিষ্ঠতা, ভাষার ওজস্বিতা এবং কর্মপ্রয়াসে তৎপরতা তাকে নিমেষে সম্রাটকন্যা বলে চিহ্নিত করে দিয়েছে। বস্তুতঃ জাহানারাই প্রথম দৃশ্যে নাট্য ব্যাপারের স্রোতোধারা উন্মুক্ত করেছে। প্রথমে সাজাহানের, পরে দারার, অবশেষে নাদিরার দ্বিধা-দুর্বলতা সে-ই একা প্রতিহত

করেছে। দৃশ্যশেষে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের লুব্ধ আবিল আবর্তের মধ্যে সে যে নেই, ন্যায়-ধর্ম ও রাজ ধর্মকে সমস্ত শক্তি দিয়ে রক্ষা করবার প্রয়াসের মধ্যে তার নিঃস্বার্থ কর্তব্যবোধই যে একমাত্র প্রেরণাস্থল এই ঘোষণায় সাজাহানের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকগণের চিত্তেও মহৎ আশ্বাসের সঞ্চার ঘটেছে।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে সাজাহানের সংযোগসেতু জাহানারা। তার ভূমিকা ভগ্নদূতের। ঔরংজীবের সিংহাসনে আরোহণ, দারা সুজা মোরাদের চরম ভাগ্যবিপর্যয়—এ সব কিছুর সংবাদ তাকেই বহন করে আনতে হয়েছে। অকরুণ ভাগ্যবিধাতার এইটুকু দয়া অবশিষ্ট ছিল যে এই সংবাদ পরিবেষণের ভার পেয়েছিল সাজাহানের এই মাতৃসমা স্নেহময়ী কন্যা। পিতাকে এতখানি প্রাণ দিয়ে ভালো না বাসলে এত ভয়ঙ্কর সংবাদ পর পর আর কে বহন করে নিয়ে যেতে পারত?

যেমন ইতিহাসে তেমনি নাটকে জাহানারা সাজাহানের নিত্যসঙ্গী, তাঁর চরম নির্ভর। নাটকে এমন একটা দৃশ্যও নেই যেখানে সাজাহান আছেন অথচ জাহানারা নেই। তার সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা তাঁকে গুরু দুঃখ বহনে শক্তি দান করেছে, মস্তিষ্ক-বিকারের প্রান্তসীমা থেকে তাঁর জরাহত বিকল-প্রায় বুদ্ধিকে তারই বাস্তব দৃষ্টি ও জগৎ-চেতনা সবলে আকর্ষণ করে রেখেছে। 'তোর কাজ স্নেহ—ভক্তি—অনুকম্পা। এ আবর্জনায় তুই-ও নামিস নে। তুই অন্ততঃ পবিত্র থাক।'—সাজাহানের এ অনুরোধের সম্মান রক্ষা করবার কঠিন পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু নারী সুলভ স্নেহ-ভক্তি-অনুকম্পার কোমল উপাদানের সঙ্গে প্রয়োজনের মুহূর্তে লোক-নিয়ন্ত্রীর বজ্র-কঠিন দৃঢ়তা ও প্রবল ব্যক্তিত্ব চরিত্রটিতে অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার করেছে। বিবিধ রণাঙ্গনে

জয়গৌরব লাভ করবার পরেও ঔরংজীবকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে (অবশ্য ইতিহাসে নয়, নাটকে) জাহানারা। মহম্মদকে বন্দী করবার কৌশল ব্যর্থ করেছেন স্বয়ং সাজাহান এবং ঔরংজীবের সভায় অসূর্যম্পশ্যা সম্রাটদুহিতার ন্যায়-ধর্মের পক্ষে আবেগকম্পিত আবেদন ব্যর্থ হয়েছে লোকচরিত্রজ্ঞ ঔরংজীবের চাতুর্যের কাছে। কিন্তু পরাজয়ের মধ্যেই তার চরিত্র উজ্জ্বলতর মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তার ধীরতা বাস্তববুদ্ধি চারিত্রিক স্নিগ্ধতা ও দৃঢতার চরম পরীক্ষা ঘটেছে অন্তিম দৃশ্যে সাজাহানের অনুরোধে ঔরংজীবের প্রতি ক্ষমাবাক্য উচ্চারণে। হত্যা ষড়্‌যন্ত্র কৃতঘ্নতা সন্দেহ অবিশ্বাসের নিত্য আবর্তমান ঘূর্ণীর কেন্দ্র মোগল অন্তঃপুরে যার আশৈশব অধিষ্ঠান, শোণিতধারার মধ্য দিয়ে যে সহজে তৈমুর বংশের দোষ-গুণের উত্তরাধিকার লাভ করেছে, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যার জীবন সাজাহানের রাজত্বকালে জড়িয়ে গিয়েছিল সে যে কেমন করে নারী-সুলভ শুচিতা, স্নিগ্ধতা ও কোমলতা এবং সেবা-শুশ্রূষা ও আত্মত্যাগের শ্লাঘনীয় বৃত্তিগুলিকে বিসর্জন দেয়নি তা ইতিহাসের বিস্ময়। নাটকেও এই জাহানারাকেই নাট্যকার স্থান দিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উৎসর্গ

মহাপুরুষ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

এই সামান্য নাটকখানি

উৎসর্গীকৃত হইল

কুশীলবগণ

পুরুষ

সাজাহান	...	ভারতবর্ষের সম্রাট্
দারা সুজা ঔরংজীব মোরাদ	...	সাজাহানের পুত্র চতুষ্টয়
সোলেমান সিপার	...	দারার পুত্রদ্বয়
মহম্মদ সুলতান	...	ঔরংজীবের পুত্র
জয়সিংহ	...	জয়পুরপতি
যশোবন্ত সিংহ	...	যোধপুরপতি
দিলদার	...	ছদ্মবেশী জ্ঞানী (দানেশমন্দ)

স্ত্রী

জাহানারা	...	সাজাহানের কন্যা
নাদিরা	...	দারার স্ত্রী
পিয়ারা	...	সুজার স্ত্রী
জহরৎ উন্নিসা	...	দারার কন্যা
মহামায়া	...	যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী

সাজাহান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ; সাজাহানের কক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ

সাজাহান শয্যার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় কর্ণমূল করতলে ন্যস্ত করিয়া অধোমুখে ভাবিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে একটি আলবোলা টানিতেছিলেন। সম্মুখে দারা দণ্ডায়মান

সাজাহান। তাই ত! এ বড়—দুঃসংবাদ দারা!

দারা। সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে বটে কিন্তু সে এখনও সম্রাট নাম নেয় নি; কিন্তু মোরাদ, গুর্জরে সম্রাট নাম নিয়ে বসেছে, আর দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সাজাহান। ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—দেখি, ভেবে দেখি—এ রকম কখনও ভাবিনি, অভ্যস্ত নই, তাই ঠিক ধারণা কর্তে পার্ছি না—তাই ত। (ধূমপান)

দারা। আমি কিছু বুঝতে পার্ছি না।

সাজাহান। আমিও পার্ছি না। (ধূমপান)

দারা। আমি এলাহাবাদে আমার পুত্র সোলেমানকে সুজার বিরুদ্ধে যাত্রা কর্বার জন্য লিখছি, আর তার সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান আনতচক্ষে ধূমপান করিতে লাগিলেন

দারা। আর মোরাদের বিরুদ্ধে আমি মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান। পাঠাচ্ছ! তাই ত! (ধূমপান)

দারা। পিতা, আপনি চিন্তিত হবেন না। এ বিদ্রোহ দমন কর্তে আমি জানি।

সাজাহান। না, আমি তার জন্য ভাব্‌ছি না দারা; তবে এই—ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—তাই ভাব্‌ছি। (ধূমপান; পরে সহসা) না—দারা, কাজ নেই। আমি তাদের বুঝিয়ে বলবো। কাজ নেই। তাদের নির্ব্বিরোধে রাজধানীতে আস্‌তে দাও।

বেগে জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। কখন না। এ হ'তে পারে না পিতা। প্রজা রাজার উপর খড়্গ তুলেছে, সে খড়্গ তার নিজের স্কন্ধে পড়ুক।

সাজাহান। সে কি জাহানারা! তারা আমার পুত্র।

জাহানারা। হোক পুত্র। কি যায় আসে। পুত্র কি কেবল পিতার স্নেহের অধিকারী? পুত্রকে পিতার শাসনও কর্তে হবে।

সাজাহান। আমার হৃদয় এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন। বেচারী মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন কর্‌বো কোন্ প্রাণে জাহানারা! ঐ চেয়ে দেখ—ঐ স্ফটিকে গঠিত (দীর্ঘ-নিশ্বাস)— ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ—তার পর বলিস্ তাদের শাসন কর্তে।

জাহানারা। পিতা, এই কি আপনার উপযুক্ত কথা! এই দৌর্ব্বল্য কি ভারতসম্রাট্ সাজাহানকে সাজে! সাম্রাজ্য কি অন্তঃপুর! একটা ছেলেখেলা! একটা প্রকাণ্ড শাসনের ভার অপনার উপর।

প্রজা বিদ্রোহী হ'লে সম্রাট কি তাকে পুত্র বলে ক্ষমা কর্বেন? স্নেহ কি কর্তব্যকে ছাপিয়ে উঠবে?

সাজাহান। তর্ক করিস্ না জাহানারা। আমার কোন যুক্তি নাই! আমার কেবল এক যুক্তি আছে। সে স্নেহ। আমি শুধু ভাবছি দারা, যে, এ যুদ্ধে যে পক্ষেরই পরাজয় হয়, আমার সমান ক্ষতি। এ যুদ্ধে তুমি পরাজিত হ'লে আমায় তোমার ম্লান-মুখখানি দেখতে হবে; আবার তা'রা পরাজিত হ'য়ে ফিরে গেলে তাদের ম্লান-মুখ কল্পনা কর্তে হবে। কাজ নেই দারা। তা'রা রাজধানীতে আসুক; আমি তাদের বুঝিয়ে বল্‌বো।

দারা। পিতা, তবে তাই হোক।

জাহানারা। দারা, তুমি কি এই রকম করে' তোমার বৃদ্ধ পিতার প্রতিনিধির কাজ কর্বে! পিতা যদি স্বয়ং শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে তোমার হাতে তিনি রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিতেন না। এই উদ্ধত সুজা, স্বকল্পিত সম্রাট মোরাদ, আর তার সহকারী ঔরংজীব বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে আগ্রায় প্রবেশ কর্বে, আর তুমি পিতার প্রতিনিধি হ'য়ে তাই সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে দেখবে?—উত্তম!

দারা। সত্য পিতা, এ কি হতে পারে? আমায় আজ্ঞা দিন পিতা।

সাজাহান। ঈশ্বর! পিতাদের এই বুকভরা স্নেহ দিয়েছিলে কেন? কেন তাদের হৃদয়কে লৌহ দিয়ে গড়নি?—ওঃ!

দারা। ভাববেন না পিতা, যে, আমি এ সিংহাসনের প্রত্যাশী। তার জন্য যুদ্ধ নয়। আমি এ সাম্রাজ্য চাই না। আমি দর্শনে উপনিষদে এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য পেয়েছি। আমি যাচ্ছি আপনার সিংহাসন রক্ষা কর্তে।

জাহানারা। তুমি যাচ্ছ ন্যায়ের সিংহাসন রক্ষা কর্তে, দুষ্কৃতকে

শাসন কর্ত্তে, এই দেশের কোটি কোটি নিরীহ প্রজাদের অরাজক অত্যাচারের গ্রাস থেকে বাঁচাতে। যদি রাজ্যে এই দুষ্প্রবৃত্তি শৃঙ্খলিত না হয়, তবে এ মোগল সাম্রাজ্যের পরমায়ু আর কয় দিন?

দারা। পিতা, আমি প্রতিজ্ঞা কর্ছি, ভাইদের কাউকে পীড়ন বা বধ কর্ব না, তা'দের বেঁধে পিতার পদতলে এনে দেবো। পিতা তখন তা'দের ইচ্ছা হয়, ক্ষমা কর্বেন। তা'রা জানুক, সম্রাট সাজাহান স্নেহশীল—কিন্তু দুর্বল নয়।

সাজাহান। (উঠিয়া) তবে তাই হোক্। তা'রা জানুক যে সাজাহান শুধু পিতা নয়—সাজাহান সম্রাট। যাও দারা! নাও এই পাঞ্জা। আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা তোমায় দিলাম। বিদ্রোহীর শাস্তি বিধান কর। (পাঞ্জা প্রদান)

দারা। যে আজ্ঞা পিতা।

সাজাহান। কিন্তু এ শাস্তি তা'দের একা নয়। এ শাস্তি আমারও। পিতা যখন পুত্রকে শাসন করে—পুত্র ভাবে যে, পিতা কি নিষ্ঠুর! সে জানে না যে পিতার উদ্যত বেত্রের অর্দ্ধেকখানি পড়ে সেই পিতারই পৃষ্ঠে।

প্রস্থান

জাহানারা। তা'দের এই হঠাৎ বিদ্রোহের কারণ কিছু অনুমান করেছো দাদা?

দারা। তা'রা বলে যে পিতা রুগ্ন এ কথা মিথ্যা; পিতা মৃত, আর আমি নিজের আজ্ঞাই তাঁর নামে চালাচ্ছি।

জাহানারা। তা'তে অপরাধ কি হ'য়েছে? তুমি সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র—ভাবী সম্রাট।

দারা। তা'রা আমাকে সম্রাট বলে' মানতে চায় না।

সিপারের সহিত নাদিরার প্রবেশ

সিপার। তা'রা তোমার হুকুম মান্‌তে চায় না বাবা ?

জাহানারা। দেখ ত আস্পর্দ্ধা ! (হাস্য)

দারা। কি নাদিরা, তুমি অধোমুখে যে ? তুমি যেন কিছু বলবে !

নাদিরা। শুন্‌বে প্রভু ? আমার একটা অনুরোধ রাখবে !

দারা। তোমার কোন্ অনুরোধ কবে না রেখেছি নাদিরা !

নাদিরা। তা জানি। তাই বল্‌তে সাহস কর্ছি। আমি বলি—তুমি এ যুদ্ধ থেকে বিরত হও।

জাহানারা। সে কি নাদিরা !

নাদিরা। দিদি—

দারা। কি ! বল্‌তে বল্‌তে চুপ কর্লে যে ! কেন তুমি এ অনুরোধ কর্ছ নাদিরা !

নাদিরা। কাল রাত্রে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

দারা। কি দুঃস্বপ্ন ?

নাদিরা। আমি এখন তা বল্‌তে পার্ব না। সে বড় ভয়ানক ! না নাথ ! এ যুদ্ধে কাজ নেই—

দারা। সে কি নাদিরা !

জাহানারা। নাদিরা, তুমি পরভেজের কন্যা না ? একটা যুদ্ধের ভয়ে এই অশ্রু, এই শঙ্কাকুল দৃষ্টি, এই ভয়বিহ্বল উক্তি তোমার শোভা পায় না।

নাদিরা। দিদি, যদি জান্তে যে সে কি দুঃস্বপ্ন ! সে বড় ভয়ানক, বড় ভয়ানক।

জাহানারা। দারা, এ কি ! তুমি ভাবছো ! এত তরল তুমি ! এত স্ত্রৈণ ! পিতার সম্মতি পেয়ে এখন স্ত্রীর সম্মতি নিতে হবে

না কি! মনে রেখো দারা, কঠোর কর্তব্য সম্মুখে! আর ভাব্‌বার সময় নাই।

দারা। সত্য নাদিরা! এ যুদ্ধ অনিবার্য, আমি যাই। যথাযথ আজ্ঞা দেই গে যাই!

প্রস্থান

নাদিরা। এত নিষ্ঠুর তুমি দিদি—এসো সিপার—

সিপারের সহিত নাদিরার প্রস্থান

জাহানারা। এত ভয়াকুল! কি কারণ বুঝি না।

সাজাহানের পুনঃ প্রবেশ

সাজাহান। দারা গিয়েছে জাহানারা?

জাহানারা। হঁা বাবা!

সাজাহান। (ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া) জাহানারা—

জাহানারা। হঁা বাবা!

সাজাহান। তুইও এর মধ্যে?

জাহানারা। কিসের মধ্যে?

সাজাহান। এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের?

জাহানারা। না বাবা—

সাজাহান। শোন্ জাহানারা। এ বড় নির্মম কাজ! কি কর্ব—আজ তার প্রয়োজন হয়েছে! উপায় নাই; কিন্তু তুইও এর মধ্যে যাস্ নে। তো'র কাজ—স্নেহ—ভক্তি—অনুকম্পা। এ আবর্জনায় তুইও নামিস্ নে। তুইও অন্ততঃ পবিত্র থাক্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নর্মদাতীরে মোরাদের শিবির। কাল—রাত্রি

দিলদার একাকী

দিলদার। আমি মুখে মোরাদের বিদূষক। আমি হাস্য পরিহাস কর্ত্তে যাই, সে ব্যাঙ্গের ধুম হ'য়ে ওঠে। মূর্খ তা বুঝতে পারে না। আমার উক্তি অসংলগ্ন মনে করে' হাসে।—মোরাদ একদিকে যুদ্ধোন্মাদ, আর একদিকে সম্ভোগ-মজ্জিত। মনোরাজ্য ওর কাছে একটা অনাবিষ্কৃত দেশ—এই যে বর্বর এখানে আসছে।

মোরাদের প্রবেশ

মোরাদ। দিলদার! আমাদের যুদ্ধে জয় হয়েছে। আনন্দ কর, স্ফূর্তি কর। অচিরে পিতাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আমি সেখানে বসছি!—কি ভাব্‌ছো দিলদার? ঘাড় নাড়্‌ছো যে!

দিলদার। জাঁহাপনা, আমি আজ একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি।

মোরাদ। কি? শুনি।

দিলদার। আমি শুনেছি যে, হিংস্র জন্তুদের মধ্যে একটা দস্তুর আছে যে, পিতা সন্তান খায়। আছে কি না?

মোরাদ। হাঁ আছে। তাই কি?

দিলদার। কিন্তু সন্তান পিতা খায়, এ প্রথাটা তাদের মধ্যে নেই বোধ হয়।

মোরাদ। না।

দিলদার। হুঁ। সে প্রথাটা ঈশ্বর কেবল মানুষের মধ্যেই দিয়েছেন। দু'রকমই চাই ত! খুব বুদ্ধি!

মোরাদ। খুব বুদ্ধি। হাঃ হাঃ হাঃ। বড় মজার কথা বলেছো দিলদার।

দিলদার। কিন্তু মানুষের যে বুদ্ধি, তার কাছে ঈশ্বরের বুদ্ধি কিছুই নয়। মানুষ ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে।

মোরাদ। কি রকম?

দিলদার। এই দেখুন জাঁহাপনা, দয়াময় মানুষকে দাঁত দিয়েছিলেন কি জন্য? চর্বণ কর্বার জন্য নিশ্চয়, বাহির কর্বার জন্য নয়; কিন্তু মানুষ সে দাঁত দিয়ে চর্বণ ত করেই, তার উপর সেই দাঁত দিয়েই হাসে। ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে বল্‌তে হবে।

মোরাদ। তা বল্‌তে হবে বৈ কি—

দিলদার। শুধু হাসে না, হাসবার জন্য অনেকে যেন বিশেষ চিন্তিত বলে' বোধ হয়, এমন কি—তার জন্য পয়সা খরচ করে।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ।

দিলদার। ঈশ্বর মানুষের জিভ দিয়েছিলেন—বেশ দেখা যাচ্ছে চাখ্‌বার জন্য; কিন্তু মানুষ তার দ্বারা ভাষার সৃষ্টি করে ফেল্লে। ঈশ্বর নাক দিয়েছিলেন কেন? নিশ্বাস ফেল্‌বার জন্য ত?

মোরাদ। হাঁ, আর শুঁকবার জন্যও বোধ হয়।

দিলদার। কিন্তু মানুষ তার উপর—বাহাদুরী করেছে। সে আবার সেই নাকের উপর চশমা পরে। দয়াময়ের নিশ্চয়ই সে উদ্দেশ্য ছিল না। —আবার অনেকের নাক ঘুমের ঘোরে বেশ একটু ডাকেও।

মোরাদ। তা ডাকে। আমার কিন্তু ডাকে না।

দিলদার। আজ্ঞে, জাঁহাপনার শুধু যে ডাকে তা নয়, সে দিনে দুপুরে ডাকে।

মোরাদ। আচ্ছা, এবার যখন ডাক্‌বে তখন দেখিয়ে দিও।

দিলদার। ঐ একটা জিনিষ জাঁহাপনা, যা নিরাকার ঈশ্বরের মত —ঠিক দেখানো যায় না। কারণ, দেখিয়ে দেবার অবস্থা যখন হয়, তখন সে আর ডাকে না।

মোরাদ। আচ্ছা দিলদার, ঈশ্বর মানুষকে যে কান দিয়েছেন, তার উপর মানুষ কি বাহাদুরী করতে পেরেছে ?

দিলদার। ও বাবা ! তাই দিয়ে একটা দার্শনিক তথ্যই আবিষ্কার করে' ফেল্লে যে, কান টানলে মাথা আসে—অবশ্য তার পেছনে যদি একটা মাথা থাকে ; অনেকের তা নেই কি না !

মোরাদ। নেই নাকি। হাঃ হাঃ—ঐ দাদা আসছেন। তুমি এখন যাও।

দিলদার। যে আজ্ঞে।

দিলদারের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া ঔরংজীবের প্রবেশ

মোরাদ। এসো দাদা, তোমায় আলিঙ্গন করি। তোমার বুদ্ধিবলেই আমাদের এই যুদ্ধ জয় হয়েছে। (আলিঙ্গন)

ঔরংজীব। আমার বুদ্ধিবলে না তোমার শৌর্যবলে ? কি অদ্ভুত শৌর্য তোমার ! মৃত্যুকে একেবারে ভয় কর না।

মোরাদ। আসফ খাঁ একটা কথা বল্‌তেন মনে আছে যে, যা'রা মৃত্যুকে ভয় করে, তা'রা জীবন ধারণ করবার যোগ্য নয়। সে যা হোক্‌ তুমি যশোবন্ত সিংহের ৪০,০০০ মোগল সৈন্য কি মন্ত্রবলে বশ কর্লে ! তা'রা শেষে যশোবন্ত সিংহেরই রাজপুত সৈন্যের বিপক্ষে বন্দুক লক্ষ্য করে' ফিরে দাঁড়াল ! যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার !

ঔরংজীব। যুদ্ধের পূর্বদিন আমি জনকতক সৈন্যকে মোল্লা সাজিয়ে এপারে পাঠিয়েছিলাম। তারা মোগলদের বুঝিয়ে গেল যে কাফেরের অধীনে, কাফেরের সঙ্গে দারার পক্ষে যুদ্ধ করা বড় হেয় কাজ ; আর সেটা কোরাণে নিষিদ্ধ। তা'রা তাই ঠিক বিশ্বাস করেছে।

মোরাদ। আশ্চর্য তোমার কৌশল!

ঔরংজীব। কার্যসিদ্ধির জন্য শুধু একটা উপায়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যত রকম উপায় আছে ভাবতে হবে।

মহম্মদের প্রবেশ

ঔরংজীব। কি সংবাদ মহম্মদ?

মহম্মদ। পিতা! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ তাঁর শকটে চড়ে' সসৈন্যে আমাদের সৈন্যশিবির প্রদক্ষিণ কর্চ্ছেন। আমরা আক্রমণ কর্ব?

ঔরংজীব। না।

মহম্মদ। এর উদ্দেশ্য কি?

ঔরংজীব। রাজপুত দর্প! এই দর্প-ই মহারাজের পরাজয়। আমি সসৈন্যে নর্মদাতীরে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যদি তিনি আমায় আক্রমণ কর্তেন ত আমার পরাজয় অনিবার্য ছিল। কারণ তুমি তখন এসে উপস্থিত হও নি, আর আমার সৈন্যরাও পথশ্রান্ত ছিল; কিন্তু শুনলাম এরূপ আক্রমণ করা বীরোচিত নয় বলে' মহারাজ তোমার আগমনের অপেক্ষা কর্চ্ছিলেন। অতি দর্পে পতন হবেই।

মহম্মদ। আমরা তবে তাঁকে আক্রমণ কর্ব না?

ঔরংজীব। না মহম্মদ! আমার সৈন্যশিবির প্রদক্ষিণ ক'রে যদি মহারাজের কিছু সান্ত্বনা হয় ত একবার কেন, তিনি দশবার প্রদক্ষিণ করুন না। যাও।

মহম্মদের প্রস্থান

ঔরংজীব। পুত্র যুদ্ধ পেলে হয়।—সরল, উদার, নির্ভীক পুত্র। আমি তবে এখন যাই, তুমি বিশ্রাম কর।

মোরাদ। আচ্ছা; দৌবারিক! সিরাজি আর বাইজি!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কাশীতে সুজার সৈন্য-শিবির। কাল—রাত্রি

সুজা ও পিয়ারা

সুজা। শুনছো পিয়ারা, দারার পুত্র—বালক সোলেমান এই যুদ্ধে আমার বিপক্ষে এসেছে।

পিয়ারা। তোমার বড় ভাই দারার পুত্র দিল্লী থেকে এসেছেন? সত্য নাকি! তা হ'লে নিশ্চয়ই দিল্লীর লাড্ডু এনেছেন। তুমি শীঘ্র সেখানে লোক পাঠাও। হাঁ করে' চেয়ে রয়েছো কি! লোক পাঠাও।

সুজা। লাড্ডু কি! যুদ্ধ—তা'র সঙ্গে—

পিয়ারা। তা'র সঙ্গে যদি বেলের মোরব্বা থাকে ত আরও ভালো। তাতেও আমার অরুচি নাই; কিন্তু দিল্লীর লাড্ডু শুন্তে পাই, যো খায়া উয়োবি পাস্তায়া—আর যো নেই খায়া উয়োবি পাস্তায়া। দু'রকমেই যখন—পস্তাতে হচ্ছে, তখন না খেয়ে পস্তানোর চেয়ে খেয়ে পস্তানোই ভালো—লোক পাঠাও।

সুজা। তুমি এক নিশ্বাসে এতখানি বলে' গেলে যে, আমি বাকিটুকু বলবার ফুর্সৎ পেলাম না।

পিয়ারা। তুমি আবার বলবে কি! তুমি তো কেবল যুদ্ধ কর্বে।

সুজা। আর যা কিছু বল্তে হবে, তা বলবে বুঝি তুমি?

পিয়ারা। তা বৈ কি। আমরা যেমন গুছিয়ে বল্‌তে পারি, তোমরা তা পারো? তোমরা কিন্তু বলতে গেলেই এমন বিষয়গুলো জড়িয়ে ফেল, আর এমন ব্যাকরণ ভুল কর যে—

সুজা। সে কি?

পিয়ারা। আর অভিধানের অর্দ্ধেক শব্দই তোমরা জানো না। কথা বলেছ, কি ভুল করে' বসে' আছ। বোবা শব্দ অন্ধ ব্যাকরণ মিশিয়ে, এমন এক খোঁড়া ভাষা প্রয়োগ কর, যে তার অন্তত কুঁজো হয়ে চলতে হবেই।

সুজা। তোমার নিজের প্রয়োগগুলি খুব সাধু বলে' বোধ হচ্ছে না!

পিয়ারা। ঐ ত! আমাদের ভাষা বুঝবার ক্ষমতাটুকুও তোমাদের নাই! হা ঈশ্বর! এমন একটা বুদ্ধিমান স্ত্রীজাতিকে এমন নির্বোধ পুরুষজাতির হাতে সঁপে দিয়েছো, যে তার চেয়ে তাদের যদি গরম তেলের কড়ায় চড়িয়ে দিতে, তা হ'লে বোধ হয় তা'রা সুখে থাকতো!

সুজা। যাক্—তুমি বলে' যাও।

পিয়ারা। সিংহের বল দাঁতে, হাতীর বল শুঁড়ে, মহিষের বল শিঙে, ঘোড়ার বল পিছনকার পায়ে, বাঙ্গালীর বল পিঠে আর নারীর বল জিভে।

সুজা। না নারীর বল অপাঙ্গে।

পিয়ারা। উঁহু—অপাঙ্গ প্রথম প্রথম কিছু কাজ করে' থাকতে পারে বটে, কিন্তু পরে সমস্ত জীবনটা স্বামীকে শাসিয়ে রাখে ঐ জিভে।

সুজা। না, তুমি আমাকে কথা কইবার অবকাশ দেবে না দেখতে পাচ্ছি! শোন কি বলতে যাচ্ছিলাম—

পিয়ারা। ঐ ত তোমাদের দোষ। এতখানি ভূমিকা কর, যে সেই অবকাশে তোমাদের বক্তব্যটা ভুলে ব'সে থাকো।

সুজা। তুমি আর খানিক যদি ঐ রকম বকে' যাও ত আমার বক্তব্যটা আমি সত্যই ভুলে যাবো।

পিয়ারা। তবে চট করে' বল। আর দেরী কোরো না।

সুজা। তবে শোন—

পিয়ারা। বল ; কিন্তু সংক্ষেপে ' মনে থাকে যেন—এক নিশ্বাসে।

সুজা। এখন আমার বিরুদ্ধে এসেছে দারার পুত্র সোলেমান। আর তা'র সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁ!

পিয়ারা। বেশ, একদিন নিমন্ত্রণ করে' খাইয়ে দাও।

সুজা। না। তুমি ছেলেমানুষীই কর্বে! এমন একটা গাঢ় ব্যাপার যুদ্ধ, তা তোমার কাছে—

পিয়ারা। তার জন্যই ত তাকে একটু—হ্যাঁ—তরল করে' নিচ্ছি। নৈলে হজম হবে কেন! বলে' যাও।

সুজা। এখনই মহারাজ জয়সিংহ আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে সম্রাট সাজাহান মরেন নি। এমন কি তিনি সম্রাটের দস্তখতি পত্র আমায় দিলেন। সে পত্রে কি আছে জানো?

পিয়ারা। শীঘ্র বলে' ফেল আর আমার ধৈর্য থাকছে না।

সুজা। সে পত্রে তিনি লিখেছেন যে আমি যদি এখনও বঙ্গদেশে ফিরে যাই, তা হ'লে তিনি আমায় এই সুবা থেকে চ্যুত কর্বেন না। নৈলে—

পিয়ারা। নৈলে চ্যুত কর্বেন! এই ত! যাক্! তার পরে আর কিছু ত বল্‌বার নেই? আমি এখন গান গাই?

সুজা। আমি কি লিখে দিলাম জানো? আমি লিখে দিলাম—বেশ, আমি বিনা যুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যাচ্ছি। পিতার প্রভুত্ব আমি মাথা পেতে নিতে সম্মত আছি ; কিন্তু দারার প্রভুত্ব আমি কোন মতেই মান্‌বো না।

পিয়ারা। তুমি আমায় গাইতে দেবে না। নিজেই বকে' যাচ্ছ, আমি গাইব না।

সুজা। না, গাও! আমি চুপ করলাম।

পিয়ারা। দেখ, প্রতিজ্ঞা মনে রেখো। কি গাইব?

সুজা। যা ইচ্ছা।—না। একটা প্রেমের গান গাও—এমন একটা গান গাও, যার ভাষায় প্রেম, ভাবে প্রেম, ভঙ্গিমায় প্রেম, মূর্চ্ছনায় প্রেম, সমে প্রেম।—গাও আমি শুনি।

পিয়ারা গীত আরম্ভ করিলেন

সুজা। দূরে একটা শব্দ শুনছো না পিয়ারা—যেন বারিদবর্ষণের শব্দ।—ঐ যে।

পিয়ারা। না, তুমি গাইতে দেবে না। আমি চল্লাম।

সুজা। না, ও কিছু নয়, গাও।

পিয়ারার গীত

এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালোবাসি।
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হায় ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি'
রাখি না কেনই যত কাছে,
যুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালোবাসা।
যত ভালোবাসি তাই আরও বাসিতে চাই—
দিয়ে প্রেম মিটেনাক আশা।

হউক অসীম স্থান হউক অমর প্রাণ
ঘুচে যাক সব অবরোধ;
তখন মিটাব আশা দিব ঢালি' ভালোবাসা
জন্ম ঋণ করি পরিশোধ।

সুজা। এ জীবন একটা সুষুপ্তি। মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত স্বর্গ থেকে একটা ভঙ্গিমা, একটা সঙ্কেত নেমে আসে, যাতে বুঝিয়ে দেয়, এ সুপ্তির জাগরণ কি মধুর—সঙ্গীত সেই স্বর্গের একটা ঝঙ্কার। নৈলে এত মধুর হয়!

নেপথ্যে কামানের শব্দ

সুজা। (চমকিয়া উঠিয়া) ও কি!

পিয়ারা। তাই ত! প্রিয়তম! এত রাত্রে কামানের শব্দ—এত কাছে! শত্রু ত ওপারে!

সুজা। এ কি! ঐ আবার! আমি দেখে আসি।

প্রস্থান

পিয়ারা। তাই ত! বারম্বার ঐ কামানের ধ্বনি। ঐ সৈন্যদলের নিনাদ, অস্ত্রের ঝনৎকার—রাত্রির এই গভীর শান্তি হঠাৎ যেন শেলবিদ্ধ হ'য়ে একটা মহা কোলাহলে আর্তনাদ ক'রে উঠলো।—এ সব কি!

প্রবেশ :—

সুজা। পিয়ারা! সম্রাট্-সৈন্য শিবির আক্রমণ করেছে।

পিয়ারা। আক্রমণ করেছে! সে কি!

সুজা। হাঁ! বিশ্বাসঘাতক এই মহারাজ!—আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তুমি শিবিরে যাও। কোন ভয় নাই পিয়ারা—

প্রস্থান

পিয়ারা। কোলাহল ক্রমে বাড়্‌তে চলল। উঃ, এ কি—

প্রস্থান

নেপথ্যে কোলাহল

সোলেমান ও দিলীর খাঁর বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ

সোলেমান। সুবাদার কৈ!

দিলীর। তিনি নদীর দিকে পালিয়েছেন!

সোলেমান। পালিয়েছেন? তাঁর পশ্চাদ্ধাবন কর দিলীর খাঁ!

দিলীর খাঁর প্রস্থান ও জয়সিংহের প্রবেশ

সোলেমান। মহারাজ! আমরা জয়লাভ করেছি।

জয়সিংহ। আপনি রাত্রেই নদী পার হ'য়ে শত্রুশিবির আক্রমণ করেছেন?

সোলেমান। কর্ব যে, তা'রা কিন্তু তা ভাবেনি—তবু এত শীঘ্র জয়লাভ কর্ব কখন মনে করিনি।

জয়সিংহ। সুলতান সুজার সৈন্য একেবারে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যখন অর্দ্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছে, তখনও তা'দের সম্পূর্ণ ঘুম ভাঙ্গে নি।

সোলেমান। তার কারণ, কাকা প্রকৃত যোদ্ধা। তিনি নৈশ আক্রমণের সম্ভাবনা জান্তেন না?

জয়সিংহ। আমি সম্রাটের পক্ষ হতে তাঁ'র সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম। তিনি বিনাযুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যেতে সম্মত হয়েছিলেন, এমন কি যাবার জন্য নৌকা প্রস্তুত কর্তে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

দিলীর খাঁর প্রবেশ

দিলীর। সাহাজাদা! সুলতান সুজা সপরিবারে নৌকাযোগে পালিয়েছেন!

জয়সিংহ। ঐ—তবে সেই সজ্জিত নৌকায়।

সোলেমান। পশ্চাদ্ধাবন কর—যাও সৈন্যদের আজ্ঞা দাও।

দিলীর খাঁর প্রস্থান

সোলেমান। আপনি কার আজ্ঞায় এ সন্ধি করেছিলেন মহারাজ ?

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞায়।

সোলেমান। পিতা ত আমাকে এ কথা কিছু লেখেন নি ? তা আপনিও আমায় বলেন নি !

জয়সিংহ। সম্রাটের নিষেধ ছিল।

সোলেমান। তার উপরে মিথ্যা কথা !—যান !

জয়সিংহের প্রস্থান

সোলেমান। সম্রাটের এক আজ্ঞা আর আমার পিতার অন্যরূপ আজ্ঞা! এ কি সম্ভব ?—যদি তাই হয়। মহারাজকে হয় ত অন্যায় ভর্ৎসনা করেছি। যদি সম্রাটের এরূপই আজ্ঞা হয় !—এ দিকে পিতা লিখেছেন যে "সুজাকে সপরিবারে বন্দী করে' নিয়ে আসবে পুত্র।" না, আমি পিতার আজ্ঞা পালন কর্ব ! তাঁর আজ্ঞা আমার কাছে ঈশ্বরের আজ্ঞা।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের দুর্গ। কাল—প্রভাত

মহামায়া ও চারণীগণ

মহামায়া। গাও আবার চারণীগণ।

গীত :—

সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়গৌরব জিনি·

সেথা গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে—

মানের চরণে প্রাণ বলিদানে,

মথিতে অমর মরণসিন্ধু আজি গিয়াছেন তিনি।

সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির ;

উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

সেথা গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শক্রর নিমন্ত্রণে।

সেথা বর্মে বর্মে কোলাকুলি হয়,

খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,

ভ্রূকুটির সহ গর্জন মিশে রক্ত রক্ত সনে।

সধবা অথবা—ইত্যাদি।

সেথা নাহি অনুনয় নাহি পলায়ন—সে ভীম সমর মাঝে,

সেথা রুধিরসিক্ত অসিত অঙ্গে,

মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে

গভীর আর্তনাদের সঙ্গে বিজয় বাদ্য বাজে।

সধবা অথবা—ইত্যাদি।

সেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা,

হেথা হয়ত ফিরিতে জিনিয়া সমর,

হয়ত মরিয়া হইতে অমর ;

সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা

সধবা অথবা—ইত্যাদি।

দুর্গপ্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাণী!

মহামায়া। কি সংবাদ সৈনিক!

প্রহরী। মহারাজ ফিরে এসেছেন।

মহামায়া। এসেছেন? যুদ্ধে জয়লাভ করে এসেছেন?

প্রহরী। না মহারাণী! তিনি এ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন।

মহামায়া। পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন? কি বলছ তুমি সৈনিক! কে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন?

প্রহরী। মহারাজ।

মহামায়া। কি! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন? একি শুনছি ঠিক! যোধপুরের মহারাজ—আমার স্বামী—যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন! ক্ষত্রিয় শৌর্যের কি এতদূর অধোগতি হয়েছে! অসম্ভব! ক্ষত্রবীর যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফেরে না। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ক্ষত্রচূড়ামণি। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে; হ'তে পারে। তা হ'য়ে থাকে ত আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে মরে' পড়ে আছেন। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে কখন ফিরে আসেন নি। যে এসেছে সে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নয়। সে তার আকারধারী কোন ছদ্মবেশী। তাকে প্রবেশ কর্তে দিও না! দুর্গদ্বার রুদ্ধ কর!—গাও চারণীগণ আবার গাও।

চারণীগণের গীত

সেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা, ইত্যাদি।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পরিত্যক্ত প্রান্তর। কাল—রাত্রি

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় উঠবে। একটা নদী পার হয়েছি, এ আর এক নদী—ভীষণ কল্লোলিত তরঙ্গসঙ্কুল। এত প্রশস্ত যে তার ও-পার দেখতে পাচ্ছি না। তবু পার হ'তে হবে—এই নৌকা নিয়েই।

মোরাদের প্রবেশ

ঔরংজীব। কি মোরাদ! কি সংবাদ!

মোরাদ। দারার সঙ্গে এক লক্ষ ঘোড়সোয়ার আর এক শত কামান!

ঔরংজীব। তবে সংবাদ ঠিক!

মোরাদ। ঠিক, প্রত্যেক চরের ঐ একইরূপ অনুমান।

ঔরংজীব। (পাদচারণা করিতে করিতে) এযে—না—তাই ত!

মোরাদ। দারা ঐ পাহাড়ের পরপারে সেনানিবেশ করেছেন।

ঔরংজীব। ঐ পাহাড়?

মোরাদ। হাঁ দাদা!

ঔরংজীব। তাই ত! এক লক্ষ অশ্বারোহী—আর—

মোরাদ। আমরা কাল প্রভাতেই—

ঔরংজীব। চুপ! কথা কোয়ো না! আমাকে ভাবতে দাও। এত সৈন্য দারা পেলেন কোথা থেকে! আর এক শত কামান!—আচ্ছা তুমি এখন যাও মোরাদ। আমায় ভাব্‌তে দাও।

মোরাদের প্রস্থান

ঔরংজীব। তাই ত। এখন পিছোলে সর্বনাশ, আক্রমণ করলে ধ্বংস। এক শত কামান! যদি—না—তাই বা হবে কেমন করে'! হুঁ

(দীর্ঘনিশ্বাস)—ঔরংজীব! এবার তোমার উত্থান না পতন? পতন? অসম্ভব। উত্থান? কিন্তু কি উপায়ে? কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা।

মোরাদের প্রবেশ

ঔরংজীব। তুমি আবার কেন?

মোরাদ। দাদা, বিপক্ষ পক্ষ থেকে শায়েস্তা খাঁ তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছেন।

ঔরংজীব। এসেছেন? উত্তম, সসম্মানে নিয়ে এসো। না—আমি স্বয়ং যাচ্ছি।

প্রস্থান

মোরাদ তাই ত! শায়েস্তা খাঁ আমাদের শিবিরে কি জন্য! দাদা ভিতরে ভিতরে কি মতলব আঁটছেন বুঝ্‌ছি না। শায়েস্তা খাঁ কি দারার প্রতি বিশ্বাসহন্তা হবে, দেখা যাক। (পরিক্রমণ)

ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। ভাই মোরাদ! এই মুহূর্ত্তে আগ্রায় যাবার জন্যে সসৈন্যে রওনা হতে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। সে কি! এই রাত্রে!

ঔরংজীব। হাঁ, এই রাত্রে। শিবির যেমন আছে তেমনি থাকুক। দারার সৈন্য আমরা আক্রমণ কর্ব না। ঐ পাহাড়ের অপর পার দিয়ে আগ্রায় যাবার একটি রাস্তা আছে। সেখান দিয়ে চ'লে যাবো। দারা সন্দেহ কর্বেন না। তাঁর আগে আমাদের আগ্রায় যেতে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। এই রাত্রে!

ঔরংজীব। তর্কের সময় নাই। সিংহাসন চাও ত দ্বিরুক্তি কোরো না। নৈলে সর্বনাশ—নিশ্চিত জেনো।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে সোলেমানের শিবির। কাল—প্রাহ্ন

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ

দিলীর। ঔরংজীব শেষ যুদ্ধেও জয়ী হয়েছেন। শুনেছেন মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। শায়েস্তা খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে। আগ্রার কাছে তুমুল যুদ্ধ হয়। দারা তাতে পরাস্ত হয়ে দোয়াবের দিকে পালিয়েছেন। সঙ্গে মোটে একশ সঙ্গী আর ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা।

জয়সিংহ। পালাতেই হবে—আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। আপনি ত সবই জান্তেন।—দারা পালাবার সময় তাড়াতাড়িতে বেশী অর্থ নিয়ে যেতে পারেন নি, কিন্তু তার পরেই শুনছি—বৃদ্ধ সম্রাট সাতাশটা অশ্ব বোঝাই করে' স্বর্ণমুদ্রা দারার উদ্দেশে পাঠান। পথে জাঠরা তাও ডাকাতি করে' নিয়েছে।

জয়সিংহ। আহা বেচারী! কিন্তু আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরংজীব ও মোরাদ বিজয়গর্বে আগ্রায় প্রবেশ করেছেন। এখন ফলতঃ ঔরংজীব সম্রাট।

জয়সিংহ। এ সব আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরংজীব আমাকে পত্রে লিখেছেন যে, আমি যদি সসৈন্যে সোলেমানকে পরিত্যাগ করে' যাই, তা হ'লে তিনি আমায় পুরস্কার দেবেন। আপনাকেও বোধ হয় তাই লিখেছেন মহারাজ?

জয়সিংহ। হাঁ

দিলীর। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা মহারাজ ?

জয়সিংহ। আমি কাল এক জ্যোতিষীকে দিয়ে এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করিয়েছিলাম। তিনি বলেন, ভাগ্যের আকাশে এখন ঔরংজীবের তারা উঠছে, আর দারার তারা নেমে যাচ্ছে!

দিলীর। তবে আমাদের এখন কর্তব্য কি মহারাজ ?

জয়সিংহ। আমি যা করি তাই দেখে যাও।

দিলীর। বেশ—এসব বিষয়ে আমার বুদ্ধিটা ঠিক খেলে না; কিন্তু একটা কথা—

জয়সিংহ। চুপ্! সোলেমান আসছেন।

সোলেমানের প্রবেশ

জয়সিংহ ও দিলীর। বন্দেগি সাহাজাদা!

সোলেমান। মহারাজ! পিতা পরাজিত, পলায়িত!—এই সম্রাট সাজাহানের পত্র। (পত্র দিলেন)

জয়সিংহ। (পত্রপাঠ পূর্বক) তাই ত কুমার!

সোলেমান। সম্রাট্ আমাকে পিতার সাহায্যে সসৈন্যে অবিলম্বে যাত্রা কর্তে লিখেছেন। আমি এক্ষণেই যাবো। তাঁবু ভাঙ্গুন আর সৈন্যদের আদেশ দিউন যে—

জয়সিংহ। আমার বিবেচনায় কুমার আরও ঠিক খবরের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। কি বল খাঁ সাহেব ?

দিলীর। আমারও সেই মত।

সোলেমান। এর চেয়ে ঠিক খবর আর কি হ'তে পারে ? স্বয়ং সম্রাটের হস্তাক্ষর।

জয়সিংহ। আমার বোধ হয় ও জাল। বিশেষ সম্রাট অথর্ব,

তাঁ'র আজ্ঞা আজ্ঞাই নয়। আপনার পিতার আজ্ঞা ব্যতীত এখান থেকে এক পাও নড়্তে পারি না! কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। সে ঠিক কথা।

সোলেমান। কিন্তু পিতা ত পলায়িত। আজ্ঞা দেবেন কেমন করে'?

জয়সিংহ। তবে আমাদের এখন তাঁর পদস্থ ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। অবশ্য যদি এই সংবাদ সত্য হয়।

সোলেমান। কি! ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য—আমার পিতার শত্রুর আজ্ঞার জন্য—আমি অপেক্ষা কর্ব?

জয়সিংহ। আপনি না করেন, আমাদের তাই কর্ত্তে হবে বৈকি—কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। তা—কথাটা ঐ রকমই দাঁড়ায় বটে।

সোলেমান। জয়সিংহ! দিলীর খাঁ—আপনারা দু'জনে তা হ'লে ষড়যন্ত্র করেছেন?

জয়সিংহ। আমাদের দোষ কি—বিনা সমুচিত আজ্ঞায় কি করে' কোনো কাজ করি। লাহোরে যুবরাজ দারার উদ্দেশে যাওয়ার সমুচিত আজ্ঞা এখনও পাই নি।

সোলেমান। আমি আজ্ঞা দিচ্ছি।

জয়সিংহ। আপনার আজ্ঞায় আমরা আপনার পিতার আজ্ঞা অবহেলা কর্ত্তে পারি না। পারি খাঁ সাহেব?

দিলীর। তা কি পারি!

সোলেমান। বুঝেছি। আপনারা একটা চক্রান্ত করেছেন। আচ্ছা, আমি স্বয়ং সৈন্যদের আজ্ঞা দিচ্ছি। সোলেমানের প্রস্থান

দিলীর। কি বলেন মহারাজ ?

জয়সিংহ। কোন ভয়ের কারণ নাই খাঁ সাহেব। আমি সৈন্যদের সব বশ করে' রেখেছি !

দিলীর। আপনার মত বিচক্ষণ কর্মঠ ব্যক্তি আমি কখনও দেখি নাই ; কিন্তু এ কাজটা কি উচিত হচ্ছে ?

জয়সিংহ। চুপ ! এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখা। এখনও ঔরংজীবের পক্ষে একেবারে হেলছি না। একটু অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। কি জানি—

সোলেমানের পুনঃ প্রবেশ

সোলেমান। সৈন্যরাও এ চক্রান্তে যোগ দিয়েছে। আপনাদের বিনা আজ্ঞায় এক পাও নড়তে চায় না।

জয়সিংহ। তাই দস্তুর বটে।

সোলেমান। মহারাজ! সম্রাট আমার পিতার সাহায্যে আমায় যেতে লিখেছেন। পিতার কাছে যাবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। আমি আপনাদের মিনতি কচ্ছি দিলীর খাঁ ! দারার পুত্র আমি করযোড়ে আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা চাচ্ছি—যে আপনারা না যান —আমার সৈন্যদের আজ্ঞা দেন—আমার সঙ্গে পিতার কাছে লাহোরে যেতে। আমি দেখি এই রাজ্যাপহারী ঔরংজীবের কতখানি শৌর্য। আমার এই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে যদি এখনো কর্মক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে পারি—মহারাজ !—দিলীর খাঁ ! আজ্ঞা দেন। এই কৃপার জন্য আপনাদের কাছে আমি আমরণ বিক্রীত হয়ে থাক্‌বো।

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞা ভিন্ন আমরা এখান থেকে এক পাও নড়তে পারি না।

সোলেমান। দিলীর খাঁ—আমি জানু পেতে—যুবরাজ দারার পুত্র আমি জানু পেতে—ভিক্ষা চাচ্ছি (জানু পাতিলেন)।

দিলীর। উঠুন সাহাজাদা। মহারাজ আজ্ঞা না দেন আমি দিচ্ছি। আমি দারার নিমক খেয়েছি। মুসলমান জাত, নেমকহারামের জাত নয়। আসুন সাহাজাদা, আমি আমার অধীন সমস্ত সৈন্য নিয়ে—আপনার সঙ্গে লাহোর যাচ্ছি। আর শপথ করছি যে, যদি সাহাজাদা আমায় ত্যাগ না করেন আমি সাহাজাদাকে ত্যাগ কর্ব না। আমি যুবরাজ দারার পুত্রের জন্যে প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দেবো। আসুন সাহাজাদা! আমি এই মুহূর্তেই আজ্ঞা দিচ্ছি।

সোলেমান ও দিলীরের প্রস্থান

জয়সিংহ। তাই ত! এক ফোঁটা চোখের জলে গলে গেলে খাঁ সাহেব! তোমার মঙ্গল তুমি বুঝলে না। আমি কি কর্ব; আমার অধীন সৈন্য নিয়ে তবে আমি আগ্রা যাত্রা করি।

সপ্তম দৃশ্য

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। জাহানারা! আমি সাগ্রহে ঔরংজীবের অপেক্ষা কর্চ্ছি। সে আমার পুত্র, আমার উদ্ধত পুত্র; আমার লজ্জা—আমার গৌরব!

জাহানারা। গৌরব পিতা! এত শঠ, এত মিথ্যাবাদী সে! সে-দিন যখন আমি তা'র শিবিরে গেলাম, সে আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখালে; বল্লে যে, সে মহাপাপ করেছে; আর সঙ্গে সঙ্গে দু'এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্লে; বল্লে যে দারার পক্ষে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নাম জান্তে পাল্লে সে নিঃশঙ্কচিত্তে পিতার আজ্ঞামত মোরাদকে ছেড়ে দারার পক্ষ নেবে। আমি সরলভাবে তা'র সে কথায় বিশ্বাস করে' তা'কে অভাগা দারার হিতৈষীদের নাম দিয়েছিলাম। পথে সে-পত্র সে হস্তগত করেছে। এত কপট! এত ধূর্ত!

সাজাহান। না জাহানারা, তা সে কর্তে পারে না। না না না। আমি এ কথা বিশ্বাস কর্ব না।

জাহানারা। আসুক সে একবার এই দুর্গে। আমি কৌশলে তা'কে আপনার চক্ষের সম্মুখে বন্দী কর্ব।

সাজাহান। সে কি জাহানারা! সে আমার পুত্র, তোমার ভাই। জাহানারা, কাজ নাই। আসুক সে। আমি তাকে স্নেহে বশ কর্ব।

তা'তেও যদি সে বশ না হয়—তা হ'লে তা'র কাছে, পিতা আমি—তা'র সম্মুখে নতজানু হ'য়ে আমাদের প্রাণভিক্ষা মেগে নেবো। বল্‌বো আমরা আর কিছুই চাই না, আমাদের বাঁচতে দাও, আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসার অবকাশ দাও।

জাহানারা। সে অপমান থেকে আমি আপনাকে রক্ষা কর্ব বাবা।

সাজাহান। পুত্রের কাছে ভিক্ষায় অপমান নাই।

মহম্মদের প্রবেশ

সাজাহান। এই যে মহম্মদ! তোমার পিতা কৈ!

মহম্মদ। তা ত জানি না ঠাকুর্দা!

সাজাহান। সে কি! সে এখানে আস্‌বার জন্য অশ্বারূঢ় হয়েছে—শুনলাম—

মহম্মদ। কে বল্লে! তিনি ত ঘোড়ায় চড়ে' আকবরের কবরে নওয়াজ পড়তে গেলেন। আমি ত যতদূর জানি, তাঁ'র এখানে আস্‌বার কোন অভিপ্রায় নাই।

জাহানারা। তবে তুমি এখানে কেন মহম্মদ?

মহম্মদ। এ প্রাসাদ-দুর্গ অধিকার কর্তে।

সাজাহান। সে কি? না তুমি পরিহাস কর্ছ মহম্মদ।

মহম্মদ। না ঠাকুর্দা, এ সত্য কথা।

জাহানারা। বটে! তবে আমি তোমাকেই বন্দী কর্ব।

বাঁশী বাজাইলেন। সশস্ত্র পঞ্চ প্রহরীর প্রবেশ

জাহানারা। অস্ত্র দাও মহম্মদ।

মহম্মদ। সে কি!

জাহানারা। তুমি আমার বন্দী! সৈনিকগণ! অস্ত্র কেড়ে নাও।

মহম্মদ। তবে আমারও রক্ষীদের ডাকতে হ'লো।

বাঁশি বাজাইলেন। দশজন দেহরক্ষীর প্রবেশ

মহম্মদ। আমার সহস্র সৈনিকগণকে ডাকো।

জাহানারা। সহস্র সৈনিক! কে তাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর্তে দিলে!

সাজাহান। আমি দিয়েছি জাহানারা। সব দোষ আমার। আমি স্নেহবশে ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল, সব দিয়েছিলাম। ওঃ, আমি এ স্বপ্নেও ভাবি নি—মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দা!

সাজাহান। আমি কি তবে এখন বুঝবো, যে আমি তোমার হস্তে বন্দী!

মহম্মদ। বন্দী ন'ন ঠাকুর্দা। তবে আপনার বাইরে যাবার অনুমতি নাই।

সাজাহান। আমি ঠিক বুঝতে পার্ছি নে। একি একটা সত্য ঘটনা? না সব স্বপ্ন? আমি কে? আমি সম্রাট্ সাজাহান? তুমি আমার পৌত্র, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তরবারি খুলে? একি! একদিনে কি সংসারের নিয়ম সব উল্টে গেল! একদিন যার রোষ কষায়িত চক্ষু দেখে ঔরংজীব ভয়ে অর্ধেক মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেত—তার—তার পুত্রের হাতে—সে বন্দী? জাহানারা? কৈ! এই যে? একি কন্যা! তোর ঠোঁট নড়্ছে, কথা বার হচ্ছে না; চক্ষু দিয়ে একটা নিষ্প্রভ স্থির শূন্য-দৃষ্টি নির্গত হচ্ছে; গণ্ডদু'টি ছাইয়ের মত শাদা হ'য়ে গিয়েছে।—কি হয়েছে মা?

জাহানারা। না বাবা! কিন্তু জাস্তে পারলে কেমন করে'! আমি শুধু তাই ভাবছি!

সাজাহান। মহম্মদ! ভেবেছো আমি এই শাঠ্য, এই অত্যাচার—এখানে এই রকম ব'সে নিঃসহায় ভাবে সহ্য কর্ব! ভেবেছো এই

কেশরী স্থবির বলে' তোমরা তা'কে পদাঘাত করে' যাবে? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে; কিন্তু আমি সাজাহান! এই, কে আছো? নিয়ে এসো আমার বর্ম আর তরবারি।—কৈ, কেউ নেই!

মহম্মদ। ঠাকুর্দা, আপনার দেহরক্ষীদের দুর্গের বা'র করে' দেওয়া হয়েছে।

সাজাহান। কে দিয়েছে?

মহম্মদ। আমি।

সাজাহান। কার আজ্ঞায়?

মহম্মদ। পিতার আজ্ঞায়। এক্ষণে আমার এই সহস্র সৈনিকই জাঁহাপনার দেহরক্ষীদের কাজ কর্বে।

সাজাহান। মহম্মদ! বিশ্বাসঘাতক!

মহম্মদ। আমি আমার পিতার আজ্ঞাবহ মাত্র।

সাজাহান। ঔরংজীব! না, আজ সে কোথায়, আর আমি কোথায়! তবু যদি জাহানারা, আজ দুর্গের বাইরে গিয়ে একবার আমার সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতে পার্তাম, তা হ'লে এখনও এই বৃদ্ধ সাজাহানের জয়ধ্বনিতে ঔরংজীব মাটিতে নুয়ে পড়্তো! একবার খোলা পাই না! একবার খোলা পাই না!—মহম্মদ! আমায়, একবার মুক্ত করে দাও। একবার! একবার!

মহম্মদ। ঠাকুর্দা, আমায় দোষ দেবেন না। আমি পিতার আজ্ঞাবহ।

সাজাহান। আর আমি তোমার পিতার পিতা না? সে যদি তা'র পিতার প্রতি হেন অত্যাচারী হয়—তুমি কেন তোমার পিতার আজ্ঞাবহ হবে?—মহম্মদ! এসো! দুর্গদ্বার খুলে দাও।

মহম্মদ। মার্জনা কর্বেন ঠাকুর্দা! আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হ'তে পারি না।

সাজাহান। দেবে না? দেবে না? দেখ, আমি তোমার বৃদ্ধ পিতামহ—রুগ্ন, জীর্ণ, স্থবির। আর কিছু চাই না। শুধু একবার মাত্র এই দুর্গের বাইরে যেতে চাই। আবার ফিরে আসবো শপথ কর্ছি। দেবে না—দেবে না?

মহম্মদ। ক্ষমা কর্বেন ঠাকুর্দা—আমি তা পার্বো না।

গমনোদ্যত

সাজাহান। দাঁড়াও মহম্মদ। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া, গিয়া রাজমুকুট আনিয়া ও শয্যা হইতে কোরাণ লইয়া) দেখ মহম্মদ! এই আমার মুকুট, এই আমার কোরাণ! এই কোরাণ স্পর্শ করে' আমি শপথ কর্ছি যে বাইরে গিয়ে সমবেত প্রজাদের সম্মুখে এই মুকুট আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবো! কারো সাধ্য নাই যে প্রতিবাদ করে। আমি আজ শীর্ণ; পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে; কিন্তু সম্রাট্ সাজাহান এ ভারতবর্ষ এতদিন ধরে' এমন শাসন করে' এসেছে যে, যদি সে একবার তা'র সৈন্যদের সম্মুখে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, তা হ'লে শুদ্ধ তা'দের মিলিত অগ্নিময় দৃষ্টিতে শত ঔরংজীব ভস্ম হ'য়ে পুড়ে' যাবে—মহম্মদ! আমায় মুক্ত করে' দাও। তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে। আমি শপথ কর্ছি মহম্মদ! শপথ কর্ছি! আমি শুদ্ধ এই কপট ঔরংজীবকে একবার দেখবো! মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দা মার্জনা কর্বেন!

সাজাহান। দেখ! এ ছেলেখেলা নয়। আমি স্বয়ং সম্রাট সাজাহান—কোরাণ স্পর্শ করে' শপথ কর্ছি। এ বাতুলের প্রলাপ নয়। শপথ কর্ছি—দেখ, একদিকে তোমার পিতার আজ্ঞা, আর একদিকে ভারতের সাম্রাজ্য—বেছে নাও এই মুহূর্তে!

মহম্মদ। ঠাকুর্দা, আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হতে পারি না।

সাজাহান। একটা সাম্রাজ্যের জন্যও না?

মহম্মদ। পৃথিবীর জন্যও না।

সাজাহান। দেখ মহম্মদ! বিবেচনা করে' দেখ। ভাল করে' বিবেচনা কর—ভারতের অধীশ্বর—

মহম্মদ। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে এ কথা শুন্‌বো না। প্রলোভন বড়ই অধিক। হৃদয় বড়ই দুর্বল। ঠাকুর্দা মার্জনা কর্বেন।

প্রস্থান

সাজাহান। চলে' গেল। চলে' গেল। জাহানারা! কথা কচ্চিস্ না যে।

জাহানারা। ঔরংজীব! তোমার এই পুত্র! যে তা'র পিতার আজ্ঞা পালন কর্তে একটা সাম্রাজ্য দিতে পারে—আর তুমি তোমার পিতার এত স্নেহের বিনিময়ে তা'কে ছলে বন্দী করেছো!

সাজাহান। সত্য বলেছো কন্যা—পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না; বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না, তা'দের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না। তা'রা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর। তা'রা সব শিশু-শয়তান। তা'দের আধপেটা খাইয়ে মানুষ কোরো। তাদের সকালে বিকালে জোরে কষাঘাত কোরো। তা'দের সারা-জীবনটা চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে রেখো। তা হ'লে বোধ হয় তা'রা এই মহম্মদের মত বাধ্য পিতৃভক্ত হবে। তা'দের এই শাস্তি দিতে যদি তোমাদের বুকে ব্যথা লাগে ত বুক ভেঙ্গে ফেলো, চোখে জল আসে ত চোখ উপড়ে তুলে ফেলো; আর্তনাদ কর্তে ইচ্ছা হয় ত নিজের টুঁটি চেপে ধোরো। ওঃ—

জাহানারা। বাবা, এই কারাগারের কোণে ব'সে অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন কর্‌লে কিছু হবে না, পদাহত পশুর মত ব'সে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে' অভিশাপ দিলে কিছু হবে না। পাপী মুমূর্ষুর মত অন্তিমে
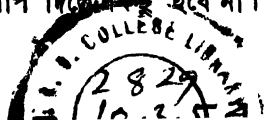
একবার ঈশ্বরকে 'দয়াময়' বলে' ডাক্‌লে কিছু হবে না! উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে' উঠুন; হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন; অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন। নিবৃত্তির মত কঠিন হৌন; হিংসার মত অন্ধ হৌন; শয়তানের মত ক্রূর হৌন। তবে তা'র সঙ্গে পার্বেন।

সাজাহান। উত্তম! তবে তাই হোক! আয় মা, তুইও আমার সহায় হ'। আমি অগ্নির মত জ্বলে' উঠি', তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়! আমি ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্যখানি ভেঙ্গে চুরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তা'কে এসে গ্রাস কর্‌। আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি; তুই মড়ক নিয়ে আয়! আয় ত; একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে' দিয়ে চ'লে যাই—তার পর কোথায় যাই।—কিছুই যায় আসে না। খধুপের মত একটা বিরাট জ্বালায় উর্দ্ধে উঠে—বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মথুরায় ঔরংজীবের শিবির। কাল—রাত্রি

দিলদার একাকী

দিলদার। মোরাদ! কেমন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তুমি নেমে যাচ্ছ! সুরার স্রোতে ভাস্‌ছো। নর্তকীর হাব-ভাব তার উপরে তুফান তুলে' দিয়েছে। তুমি ডুববে! আর দেরী নাই। মোরাদ, তোমাকে দেখে আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। এত সরল! সাহাজাদীর প্ররোচনায় ঔরংজীবকে ছলে বন্দী কর্তে গিয়েছিলেন। জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে বাদ!—আজ তার প্রতি-নিমন্ত্রণ! এই যে জাঁহাপনা!

মোরাদের প্রবেশ

মোরাদ। দাদা এখনও নেওয়াজ পড়্‌ছেন নাকি!—দাদা পরকাল নিয়েই গেলেন। ইহকালটা তাঁর ভোগে এলো না।—কি ভাবছো দিলদার!

দিলদার। ভাবছিলাম জাঁহাপনা, যে মাছগুলোর ডানা না থেকে যদি পাখা থাক্‌তো তা হ'লে সেগুলো বোধ হয় উড়তো।

মোরাদ। আরে, মাছের যদি পাখা থাক্‌তো তা হ'লে সে ত পাখিই হোত।

দিলদার। তা বটে। ঐটুকু আগে ভাবি নি। তাই গোলে

পড়েছিলাম। এখন বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—আচ্ছা জাঁহাপনা, হাঁসের মত জানোয়ার বড় একটা দেখা যায় না। জলে সাঁতার দেয়, ডেঙ্গায় হাঁটে, আবার আকাশে ওড়ে।

মোরাদ। তার সঙ্গে বর্তমান বিষয়ের সম্বন্ধ কি মূর্খ!

দিলদার। দয়াময় পাদু'টো নীচের দিকে দিয়েছিলেন হাঁটবার জন্য সেটা বেশ বোঝা যায়।

মোরাদ। যায় নাকি?

দিলদার। কিন্তু পা যদি ভাব্‌তে শুরু করে তা হ'লে মাথা ঠিক রাখা শক্ত হয়।—আচ্ছা, ঈশ্বর পশুগুলোর মাথা সম্মুখ দিকে আর লেজ পেছন দিকে দিয়েছেন কেন জাঁহাপনা?

মোরাদ। ওরে মূর্খ! তা'দের মুখ যদি পিছন দিকে হোতো তা হ'লে ত সেইটেই সম্মুখ দিক হোত।

দিলদার। ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা।—কুকুর লেজ নাড়ে কেন, এর কারণ কিন্তু খাসা কারণ।

মোরাদ। কি কারণ?

দিলদার। কুকুর লেজ নাড়ে, কারণ লেজের চেয়ে কুকুরের জোর বেশি। যদি কুকুরের চেয়ে লেজের জোর বেশি হোত, তা হ'লে লেজই কুকুরকে নাড়তো।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ—এই যে দাদা!

ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। এই যে এসেছো ভাই, তোমার বিদূষককে সঙ্গে করে' এনেছো দেখ্‌ছি।

মোরাদ। হাঁ দাদা। আমোদের সময় বয়স্যও চাই, নর্তকীও চাই।

ঔরংজীব। তা চাই বৈ কি। কাল হঠাৎ জনকতক অসামান্য সুন্দরী নর্ত্তকী এসে উপস্থিত হ'লো। আমার ত তাতে স্পৃহা নেই জানোই। আমি ত মক্কায় চলেছি। তবে ভাব্‌লাম তা'রা তোমার মনোরঞ্জন কর্ত্তে পার্ব্বে। আর এই কয় বোতল সুরা তোমার জন্যে গোঁয়ার ফিরিঙ্গীদের কাছে সংগ্রহ করেছিলাম। দেখ দেখি কি রকম!

প্রদান

মোরাদ। দেখি! (ঢালিয়া পান করিয়া) বাঃ! তোফা! বাঃ দিলদার কি ভাব্‌ছো! একটু খাবে?

দিলদার। আমি একটা কথা ভাবছিলাম জাঁহাপনা, যে সব জানোয়ারগুলোই সম্মুখ দিকে হাঁটে কেন?

মোরাদ। কেন? পিছন দিকে হাঁটে না বলে'?

দিলদার। না। কারণ তা'দের চোখ দু'টো সম্মুখ দিকে; কিন্তু যারা অন্ধ তা'দের সম্মুখ দিকে হাঁটাও যা পিছন দিকে হাঁটাও তা—একই কথা।

মোরাদ। তোফা! এই ফিরিঙ্গীরা মদটা খাসা তৈরি করে। (পান) তুমি একটু খাবে না?

ঔরংজীব। না, জানোই ত আমি খাই না। কোরাণের নিষেধ।

দিলদার। অন্ধ জাগো—না কিবা রাত্রি কিবা দিন।

মোরাদ। কোরাণের সব নিষেধ মান্‌তে গেলে সংসার চলে না। (পান)

দিলদার। হাতির যতখানি শক্তি, ততখানি যদি বুদ্ধি থাকত ত সে কি বুদ্ধিমান জানোয়ারই হোত! তা হ'লে হাতির উপর মাহুত না বসে', মাহুতের উপর হাতি বস্‌তো! অতখানি শক্তি—যা অত বড় দেহখানাকে—মায় শুঁড় নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্চে—ওঃ!

ঔরংজীব। তোমার বিদূষকটি ত বেশ রসিক।

মোরাদ। ও একটি রত্ন। কৈ নর্ত্তকীরা কৈ?

ঔরংজীব। ঐ যে ঐ শিবিরে। তুমি নিজে গিয়ে তা'দের ডেকে নিয়ে এসো না।

মোরাদ। এখনই। মোরাদ যুদ্ধে কি সম্ভোগে কিছুতেই পিছপাও নয়।

প্রস্থান

দিলদার। "অন্ধ জাগো"—(বলিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে উদ্যত)

ঔরংজীব তাঁহাকে বাধা দিলেন

ঔরংজীব। দাঁড়াও, কথা আছে।

দিলদার। আমায় মেরো না বাবা। আমি সিংহাসনও চাই না, মক্কাও চাই না।

ঔরংজীব। তুমি কে, ঠিক করে' বল। তুমি তো শুধু বিদূষক নও। কে তুমি?

দিলদার। আমি একজন বেজায় পুরানো গাঁটকাটা, ধাপ্পাবাজ, চোর। আমার স্বভাব হচ্ছে খোসামুদী, বাঁদরামি, জোচ্চোরী, পেজোমীর একটা ঘণ্ট। আমি শামুকের চেয়ে কুড়ে, কুকুরের চেয়েও পা-চাটা, চড়ুইয়ের চেয়েও লম্পট!

ঔরংজীব। শোন, আমি পরিহাসপ্রিয় নই! তুমি কি কাজ কর্ত্তে পারো?

দিলদার। কিছু কর্ত্তে পারি না। হাই তুলতে পারি, একটা কাজ দিলে সেটা পণ্ড কর্ত্তে পারি, গালাগালি দিলে সেটা বুঝতে পারি—আর কিছু পারি না জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। থাক্—বুঝেছি। তোমাকে আমার দরকার হবে। কোন ভয় নেই।

দিলদার। ভরসাও নেই।

নর্ত্তকীদের সহিত মোরাদের পুনঃ প্রবেশ

মোরাদ। বাহবা!—এ তোফা! চমৎকার!

ঔরংজীব। তবে তুমি এখন স্ফূর্তি কর! আমি যাই। তোমার বিদূষককে নিয়ে যাই। ওর কথাবার্তায় আমার ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে।

মোরাদ। কেমন! হচ্ছে কি না? বলেছি ত ও একটি রত্ন। তা বেশ ওকে নিয়ে যাও। আমি ওর চেয়ে অনেক ভালো সংসর্গ পেয়েছি।

দিলদারের সহিত ঔরংজীবের প্রস্থান।

মোরাদ। নাচো, গাও।

নৃত্য-গীত

আজি, এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি—কর বঁধু কর তার পান।
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল-কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদুহাসি, ভেসে আসে পাপিয়ার তান;
আজি এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল;
সে মরণ স্বরগ সমান।

আজি তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়ে মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে' আসিয়াছি তোমার নিধান।
আজি সব ভাষা সব বাক্—নীরব হইয়া যাক্,
প্রাণে শুধু মিশে থাক্—প্রাণ।

মোরাদ শুনিতে শুনিতে সুরা পান করিতে লাগিলেন ও ক্রমে নিদ্রিত হইলেন।
নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ও প্রহরিগণসহ ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। বাঁধো!

মোরাদ। কে দাদা! একি! বিশ্বাসঘাতকতা?—(উঠিলেন)

ঔরংজীব। যদি বাধা দেয়—তবে বধ কর্ত্তে দ্বিধা ক'রো না।

প্রহরিগণ মোরাদকে বন্দী করিল

ঔরংজীব। আগ্রায় নিয়ে যাও। আমার পুত্র সুলতান আর শায়েস্তা খাঁর জিম্মায় রাখ্‌বে, আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।

মোরাদ। এর প্রতিফল পাবে—আমি তোমায় একবার দেখ্‌বো।

ঔরংজীব। নিয়ে যাও।

সপ্রহরী মোরাদের প্রস্থান

ঔরংজীব। আমার হাত ধরে' কোথায় নিয়ে যাচ্ছ খোদা! আমি এ সিংহাসন চাই নি। তুমি আমার হাত ধরে এ সিংহাসনে বসালে! কেন—তুমিই জান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গ-প্রাসাদ। কাল—প্রভাত

সাজাহান একাকী

সাজাহান। সূর্য উঠেছে! যেমন সেই প্রথম দিন উঠেছিল, এই রকম উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ! আকাশ তেমনি নীল; ঐ যমুনা তেমনি ক্রীড়াময়ী কলস্বরা; যমুনার পরপারে বৃক্ষরাজি তেমনি পত্রশ্যাম. পুষ্পোজ্জ্বল; যেমন আমি আশৈশব দেখে এসেছি। সবই সেই। কেবল আমিই বদলিছি—(গাঢ়স্বরে) আমি আজ আমার পুত্রের হস্তে বন্দী—নারীর মত অসহায়, শিশুর মত দুর্বল। মাঝে মাঝে ক্রোধে গর্জন করে' উঠি, কিন্তু সে শরতের মেঘের গর্জন—একটা নিষ্ফল হাহাকার মাত্র। আমার নির্বিষ আস্ফালনে আমি নিজেই ক্ষয় হ'য়ে যাই। উঃ! ভারত-সম্রাট্ সাজাহানের আজ—এ কি অবস্থা! (একটি স্তম্ভের উপর বাহু রাখিয়া দূরে যমুনার দিকে চাহিয়া রহিলেন)—ওকি শব্দ! ঐ! আবার! আবার!—এই যে জাহানারা!

জাহানারার প্রবেশ

সাজাহান। ও কি শব্দ জাহানারা? ঐ আবার!—শুন্‌ছিস্? (সৌৎসুক্যে) দারা কি সৈন্য কামান নিয়ে বিজয়গর্বে আগ্রায় ফিরে এলো? এসো পুত্র! এই অন্যায় অবিচার নৃশংসতার প্রতিশোধ নাও। —কি জাহানারা! চোখ ঢাক্‌ছিস যে! বুঝিছি মা—এ দারার বিজয় ঘোষণা নয়—এ নূতন এক দুঃসংবাদ! তাই কি?

জাহানারা। হাঁ বাবা।

সাজাহান। জানি, দুর্ভাগ্য একা আসে না। যখন আরম্ভ হয়েছে,

সে তার পালা শেষ না করে' যাবে না। বল কি দুঃসংবাদ কন্যা? ও কিসের শব্দ!

জাহানারা। ঔরংজীব আজ সম্রাট হ'য়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে। আগ্রায় এ তারই উৎসবধ্বনি।

সাজাহান। (যেন শুনিতে পান নাই এই ভাবে) কি! ঔরংজীব—কি করেছে?

জাহানারা। আজ, দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে।

সাজাহান। জাহানারা কি বল্‌ছো! আমি জীবিত আছি, না মরে' গিয়েছি? ঔরংজীব—না—অসম্ভব! জাহানারা তুমি শুনতে ভুলেছো! এ কি হ'তে পারে! ঔরংজীব—ঔরংজীব এ কাজ কর্তে পারে না। তা'র পিতা এখনও জীবিত—একটা ত বিবেক আছে, চক্ষুলজ্জা আছে!

জাহানারা। (কম্পিত স্বরে) যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতাকে ছলে বন্দী করে—জীবন্তে এই গোর দিতে পারে, সে আর কি না কর্তে পারে বাবা!

সাজাহান। তবুও—না।—হবে।—আশ্চর্য কি! আশ্চর্য কি! এ কি। মাটি থেকে একটা কাল ধোঁয়া আকাশে উঠছে। আকাশ কালীবর্ণ হয়ে গেল! সংসার উল্টে গেল বুঝি!—ঐ—ঐ—না আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি!—ঐ ত সেই নীল আকাশ, সেই উজ্জ্বল প্রভাত—হাস্‌ছে! কিছু হয় নি ত!—আশ্চর্য! (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) জাহানারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান (গদগদস্বরে) তুই বাইরে কি দেখে এলি?—সংসার কি ঠিক সেই রকমই চল্‌ছে! জননী সন্তানকে স্তন দিচ্ছে? স্ত্রী স্বামীর ঘর কর্ছে! ভৃত্য প্রভুর সেবা কর্ছে? গৃহস্থ ভিখারীকে ভিক্ষা দিচ্ছে?

দেখে এলি—যে বাড়িগুলো সেই রকম খাড়া আছে! রাস্তায় লোক চল্‌ছে! মানুষ মানুষ খাচ্ছে না! দেখে এলি! দেখে এলি!

জাহানারা। নীচ সংসার সেই রকমই চল্‌ছে বাবা! বন্দী সাজাহানকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না!

সাজাহান। না?—সত্য কথা?—তা'রা বল্‌ছে না যে, 'এ ঘোরতর অত্যাচার?' বল্‌ছে না—'আমাদের প্রিয় দয়ালু প্রজাবৎসল সাজাহানকে কার সাধ্য বন্দী করে' রাখে?'—চেঁচাচ্ছে না যে—'আমরা বিদ্রোহ কর্ব, ঔরংজীবকে কারারুদ্ধ কর্ব, আগ্রার দুর্গপ্রাকার ভেঙে আমাদের সাজাহানকে নিয়ে এসে আবার সিংহাসনে বসাবো?'—বল্‌ছে না? বল্‌ছে না?

জাহানারা। না বাবা। সংসার কাউকে নিয়ে ভাবে না। সবাই নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত। তা'রা এত আত্মমগ্ন যে কাল যদি এই সূর্য না উঠে একটা প্রচণ্ড অগ্নিদাহ আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, ত তারই রক্তবর্ণ আলোকে তা'রা পূর্ববৎ নিজের নিজের কাজ করে যাবে।

সাজাহান। যদি একবার দুর্গের বাইরে যেতে পার্তাম—একবার সুযোগ পাই না জাহানারা! একবার আমাকে চুরি করে' দুর্গের বাইরে নিয়ে যেতে পারিস?

জাহানারা। না বাবা! বাইরে সহস্র সতর্ক প্রহরী।

সাজাহান। তবু তা'রা একদিন আমাকে সম্রাট্ বলে মান্‌তো। আমি তা'দের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করি নি। হয় ত তাদের মধ্যে অনেককে অনাহার থেকে বাঁচিয়েছি, কারগায় থেকে মুক্ত করে' দিয়েছি, বিপদ থেকে রক্ষা করেছি। বিনিময়ে—

জাহানারা। না বাবা।—মানুষ খোসামুদে—কুকুরের মত খোসামুদে—

যে একখণ্ড মাংস দিতে পারে, তারই পায়ের তলায় সে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ে।—এত নীচ! এত হেয়!

সাজাহান। তবু আমি যদি তা'দের কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াই? এই শুভ্রশির মুক্ত করে', যষ্টির উপর এই রোগবিকম্পিত দেহখানির ভার রেখে যদি আমি তা'দের সম্মুখে দাঁড়াই? তা'দের দয়া হবে না? দয়া হবে না?

জাহানারা। বাবা সংসারে দয়া মায়া নাই। সব ভয়ে চলেছে! সাজাহানের সম্পৎকালে যারাই "জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়" বলে চীৎকারে আকাশ দীর্ণ করে' দিত, তা'রাই যদি আজ আপনার এই স্থবির অথর্ব মূর্তি দেখে, ত ঐ মুখে ঘৃণায় থুৎকার দেবে—আর যদি কৃপাভরে থুৎকার না দেয়, ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে' যাবে!

সাজাহান। এতদূর! এতদূর!—(গম্ভীর স্বরে) যদি এই আজ সংসারের অবস্থা, তবে আজ এক মহাব্যাধি তা'র সর্বস্ব ছেয়েছে; তবে আর কেন? ঈশ্বর আর তাকে রেখো না! এক্ষণেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলো! যদি তাই হয়, তবে এখনও আকাশ—তুমি নীলবর্ণ কেন! সূর্য! তুমি এখনো আকাশের উপরে কেন? নির্লজ্জ! নেমে এসো! একটা মহা সংঘাতে তুমি চূর্ণ হ'য়ে যাও। ভূমিকম্প! তুমি ভৈরব হুঙ্কারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ ভেঙ্গে খান খান করে' ফেল। একটা প্রকাণ্ড দাবানল জ্বলে' উঠে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে' দিয়ে চলে' যাও। আর একটা বিরাট ঘূর্ণি-ঝঞ্ঝা এসে সেই ভস্মরাশি ঈশ্বরের মুখে ছড়িয়ে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপুতানার মরুভূমির প্রান্তদেশ। কাল—দ্বিপ্রহর দিবা

বৃক্ষতলে দারা, নাদিরা ও সিপার—একপার্শ্বে নিদ্রিত জহরৎউন্নিসা

নাদিরা। আর পারি না প্রভু!—এইখানেই খানিক বিশ্রাম কর।

সিপার। হাঁ বাবা—উঃ কি পিপাসা!

দারা। বিশ্রাম নাদিরা! এ সংসারে আমাদের বিশ্রাম নাই! ঐ মরুভূমি দেখ্‌ছো—যা আমরা পার হ'য়ে এলাম? দেখ্‌ছো নাদিরা!

নাদিরা। দেখ্‌ছি—ওঃ—

দারা। আমাদের পেছনে যেমন মরুভূমি, আমাদের সম্মুখে সেইরূপ মরুভূমি। জল নাই, ছায়া নাই, শেষ নাই—ধু ধু কর্ছে।

সিপার। বাবা! বড় পিপাসা—একটু জল!

দারা। জল আর নেই সিপার!

সিপার। বাবা! জল! জল না খেলে আমি বাঁচবো না!

দারা। (রুদ্রভাবে) হুঁ!

সিপার। উঃ। জল! জল!

নাদিরা। দেখ প্রভু, কোনখানে যদি একটু জল পাও, দেখ। বাছা মূর্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে। আমারও তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—

দারা। কেবল তোমাদেরই বুঝি যাচ্ছে নাদিরা! আমার যাচ্ছে না? কেবল নিজের কথাই ভাব্‌ছো।

নাদিরা। আমার জন্য বল্‌ছি না নাথ!—এই বেচারী—আহা—

দারা। আমারও ভিতরে একটা দাহ! ভীষণ! আগুন ছুটছে। তার উপর বেচারীর শুষ্ক তালু দেখ্ছি—কথা সরছে না—দেখ্ছি—আর ভাবছো কি নাদিরা—সে আমার পরম সুখ হচ্ছে! কিন্তু কি কর্ব—জল নাই। এক ক্রোশের মধ্যে জলের দেখা নাই, চিহ্ন নাই। উঃ! কি অবস্থায়ই আমাকে ফেলেছো দয়াময়। আর যে পারি না।

সিপার। আর পারি না বাবা!

নাদিরা। আহা বাছা—আমিও মরি—আর সহ্য হয় না—

দারা। মর—তাই মর—তোমরা মর—আমিও মরি—আজ এইখানে আমাদের সব শেষ হ'য়ে যাক্—তাই যাক্!

সিপার। মা—ওঃ আর কথা সরে না! কি যন্ত্রণা মা!

নাদিরা। উঃ কি যন্ত্রণা!

দারা। না, আর দেখ্তে পারি না। আমি আজ ঈশ্বরের উপর প্রতিশোধ নেবো! আর তাঁ'র এই পচা অন্তঃসারশূন্য সৃষ্টি কেটে ফেলে তাঁ'র প্রকাণ্ড জোচ্চোরি, বের করে' দেখাবো। আমি মর্ব; কিন্তু তার আগে নিজের হাতে তোদের শেষ কর্ব! তোদের মেরে মর্ব!

ছুরিকা বাহির করিলেন

সিপার। মাকে মেরো না—আমায় মারো!

নাদিরা। না না—আমায় আগে মারো—আমার চক্ষের সম্মুখে বাছার বুকে ছুরি দিতে পাবে না—আমায় আগে মারো।

সিপার। না, আমায় আগে মারো।

দারা। এ কি দয়াময়!—এ আবার—মাঝে মাঝে কি দেখাও! অন্ধকারের মাঝখানে মাঝে মাঝে এ কি আলোকের উচ্ছ্বাস! ঈশ্বর! দয়াময়! তোমার রচনা এমন সুন্দর অথচ এমন নিষ্ঠুর! এই মায়ের আর ছেলের পরস্পরকে রক্ষা কর্বার জন্য এই কান্না—অথচ কেউ কাউকে

রক্ষা কর্ত্তে পার্চ্ছে না। এত প্রবল, কিন্তু এত দুর্ব্বল। এত উচ্চ, কিন্তু এত নীচে পড়ে'। এ যে আকাশের একখানা মানিক মাটিতে ছটকে এসে পড়েছে। এ যে স্বর্গ আর নরক এক সঙ্গে! এ কি প্রহেলিকা দয়াময়!

সিপার। বাবা বাবা—উঃ! (পড়িয়া গেল)

নাদিরা। বাছা আমার! (তাহাকে গিয়া ক্রোড়ে লইলেন)

দারা। এই আবার সেই নরক! না—না—না—এ আলোক-ভ্রান্তি, এ শয়তানী! এ ছল! অন্ধকার কত গাঢ় তাই দেখবার জন্য এ এক জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড! কিছু না। আমি তোমাদের বধ করে' মর্ব! (জহরতের দিকে চাহিয়া) ও ঘুমোচ্ছে। ওটাকেও মার্ব। তার পরে—তোমাদের মৃতদেহগুলি জড়িয়ে আমি মর্ব।—এসো একে একে।

নাদিরাকে মারিবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন

সিপার। মেরো না, মেরো না।

দারা। (সিপারকে এক হাতে ধরিয়া দূরে রাখিয়া নাদিরাকে ছুরি মারিতে উদ্যত) তবে!

নাদিরা। মর্বার আগে আমাদের একবার প্রার্থনা কর্ত্তে দাও।

দারা। প্রার্থনা!—কার কাছে? ঈশ্বরের কাছে? ঈশ্বর নাই। সব ভণ্ডামি! ধাপ্পাবাজি! ঈশ্বর নাই। কৈ কৈ! কে বল্লে ঈশ্বর আছেন? আছেন? ভালো। কর প্রার্থনা।

নাদিরা। আয় বাছা, মর্বার আগে প্রার্থনা করি।

উভয়ে জানু পাতিয়া বসিলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন

নাদিরা। দয়াময়! বড় দুঃখে আজ তোমায় ডাকছি। প্রভু! দুঃখ দিয়েছো, দিয়েছো! তুমি যা দাও মাথা পেতে নেবো! তবু—তবু—মর্বার সময় যদি পুত্রকন্যাকে আর স্বামীকে সুখী দেখে মর্ত্তে পাত্তাম!

দারা। (দেখিতে দেখিতে সহসা জানু পাতিয়া বসিলেন) ঈশ্বর রাজাধিরাজ! তুমি আছো! তুমি না থাকো ত এমন একটা বিশ্ব-জগৎকে চালাচ্ছে কে! কোথা থেকে সে নিয়ম এলো, যার বলে এমন পবিত্র জিনিস দু'টি জগতে প্রস্ফুটিত হয়েছে—মা আর ছেলে! ঈশ্বর তোমাকে অনেকবার স্মরণ করেছি; কিন্তু এমন দুঃখে, এমন দীন ভাবে, এমন কাতর হৃদয়ে, আর কখন ডাকি নি। দয়াময়! রক্ষা কর!

গোরক্ষক ও গোরক্ষক-রমণীর প্রবেশ

গোরক্ষক। কে তোমরা?

দারা। এ কার স্বর (চক্ষু খুলিয়া) কে তোমরা!—একটু জল দাও, একটু জল দাও!—আমায় না দাও—এই নারী আর—এই বালককে দাও—

গোরক্ষক রমণী। আহা বেচারীরা! আমি জল আন্‌ছি এখনি। একটু সবুর কর বাবা!

প্রস্থান

গোরক্ষক। আহা! বাছা ধুঁকচে!

দারা। জহরৎ! জহরৎ মরে' গিয়েছে!

গোরক্ষক। না মরে নি। বাছা আমার!

দারা। জহরৎ!

জহরৎ। (ক্ষীণস্বরে) বাবা!

রমণীর প্রবেশ ও জলদান এবং সকলের জলপান

গোরক্ষক-রমণী। এসো বাবা, আমাদের বাড়ী এসো।

গোরক্ষক। এসো বাবা!

দারা। কে তোমরা? তোমরা কি স্বর্গের দেবতা! ঈশ্বর পাঠিয়েছেন?

গোরক্ষক। না বাবা, আমি একজন রাখাল!—এ আমার স্ত্রী!

দারা। তা'দের এত দয়া! মানুষের এত দয়া। এও কি সম্ভব!

গোরক্ষক। কেন বাবা! তোমরা কি কখন মানুষ দেখ নি? শয়তানই দেখে এসেছো?

দারা। তাই কি ঠিক? তা'রা কি সব শয়তান?

গোরক্ষক-রমণী। এ ত মানুষেরই কাজ বাবা। অনাথকে আশ্রয় দেওয়া, যে খেতে পায় নি তাকে খেতে দেওয়া, যে জল পায় নি তাকে জল দেওয়া—এ ত মানুষেরই কাজ বাবা। কেবল শয়তানই করে না। যদিও তারও যে তা মাঝে মাঝে কর্ত্তে ইচ্ছা হয় না, তা বিশ্বাস করি না, এসো বাবা—

নিষ্ক্রান্ত

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মুঙ্গেরের দুর্গ-প্রাসাদমঞ্চ। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি

পিয়ারা বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছেন

গীত

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি রে, কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি।

সুজার প্রবেশ

সুজা। তুমি এখানে! এদিকে আমি খুঁজে খুঁজে সারা।

(পিয়ারার গীত চলিল) নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।

সুজা। তারপর তোমার স্বর শুনে বুঝলাম যে তুমি এখানে।

(পিয়ারার গীত চলিল) লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মানিক হারানু হেলে।

সুজা। শোন কথা—আঃ—

(পিয়ারার গীত চলিল) পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।

সুজা। শুনবে না? আমি চল্লাম।

(পিয়ারার গীত চলিল) জ্ঞানদাস কহে, কানুর পীরিতি,
মরণ অধিক-শেল।

সুজা। আঃ জ্বালাতন কর্লে! কেউ যেন দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ না করে। স্বামীগুলোকে পেয়ে বসে। প্রথম পক্ষের হ'লে তোমাকে কি একটা কথা শোন্‌বার জন্য এত সাধতাম!

পিয়ারা। আঃ আমার এমন কীর্ত্তনটা মাটি করে' দিলে। সংসারে কেউ যেন না দোজবরে বিয়ে করে। নৈলে কেউ এমন কীর্ত্তনটা মাটি করে! আঃ জ্বালাতন কর্লে! দিবারাত্রি যুদ্ধের সংবাদ শুন্তে হবে। তার উপর না জানো ব্যাকরণ, না বোঝ গান। জ্বালাতন।

সুজা। গান বুঝি নে কি রকম!

পিয়ারা। এমন কীর্ত্তনটা! আহা হা হা!

সুজা। তুমি যে নিজে গেয়ে নিজেই মোহিত!

পিয়ারা। কি করি, তুমি ত বুঝবে না! তাই আমি নিজেই গায়িকা নিজেই শ্রোতা।

সুজা। ব্যাকরণ ভুল।

পিয়ারা। কি রকম?

সুজা। শ্রোতা হবে না—শ্রোত্রী।

পিয়ারা। (থতমত খাইয়া) তবেই ত মাটি করেছে!

সুজা। এখন কথা হচ্ছে এই যে সোলেমান মুঙ্গের দুর্গ ছেড়ে চলে' গিয়েছে কেন তা জানো?

পিয়ারা। তাই ত!

সুজা। তা'র বাপ দারা তা'কে ডেকে পাঠিয়েছেন। অথচ এ দিকে—

পিয়ারা। তা ও রকম হয়! অশুদ্ধ হয় নি!

সুজা। দারা দুইবারই যুদ্ধে ঔরংজীবের দ্বারা পরাজিত হয়েছেন।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল হয়নি।

সুজা। তুমি কথাটা শুন্‌বে না?

পিয়ারা। আগে স্বীকার কর যে আমার ব্যাকরণ ভুল হয় নি।

সুজা। আলবৎ হয়েছে।

পিয়ারা। আলবৎ হয়নি।

সুজা। চল—কাকে জিজ্ঞাসা কর্বে কর।

পিয়ারা। দেখ, আপোশে মেটাও বল্‌ছি, নৈলে আমি এই নিয়ে রসাতল কর্ব। সারারাত এমনি চেঁচাব যে, দেখি তুমি কেমন ঘুমাও। আপোশে মেটাও।

সুজা। তা হলে বক্তব্যটা শুন্‌বে?

পিয়ারা। শুন্‌বো!

সুজা। তবে তোমার ব্যাকরণ ভুল হয়নি। বিশেষ যখন তুমি দ্বিতীয় পক্ষ। এখন শোন, বিশেষ কথা আছে। গুরুতর! তোমার কাছে পরামর্শ চাই।

পিয়ারা। চাও নাকি? তবে রোস, আমি প্রস্তুত হ'য়ে নেই। (চেহারা ও পোশাক ঠিক করিয়া লইয়া) এখানে একটা উঁচু আসনও নেই ছাই। যাক্—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌বো। বল। আমি প্রস্তুত।

সুজা। আমার বিশ্বাস যে পিতা মৃত।

পিয়ারা। আমারও তাই বিশ্বাস।

সুজা। জয়সিংহ আমাকে সম্রাটের যে দস্তখত দেখিয়েছিলেন—সে দস্তখত দারার জাল।

পিয়ারা। নিশ্চয়ই—

সুজা। স্বীকার কর্‌ছ?

পিয়ারা। স্বীকার আমি কিছু কর্ছি না। ব'লে যাও।

সুজা। দ্বিতীয় যুদ্ধেও ঔরংজীবের হাতে দারার পরাজয় হয়েছে, শুনেছ?

পিয়ারা। শুনেছি।

সুজা। কার কাছে শুন্‌লে?

পিয়ারা। তোমার কাছে।

সুজা। কখন?

পিয়ারা। এখনই!

সুজা। দারা আগ্রা ছেড়ে পালিয়েছে! আর ঔরংজীব বিজয় গর্বে আগ্রায় প্রবেশ করে' পিতাকে বন্দী করেছে, আর মোরাদকেও কারারুদ্ধ করেছে।

পিয়ারা। বটে!

সুজা। ঔরংজীব এখন আমার সঙ্গে যুদ্ধে নাম্‌বে।

পিয়ারা। খুব সম্ভব।

সুজা। আর ঔরংজীবের সঙ্গে যদি আমার যুদ্ধ হয়—ত সে বেশ একটু শক্ত রকম যুদ্ধ হবে।

পিয়ারা। শক্ত বলে' শক্ত।

সুজা। আমার তার জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হ'তে হয়।

পিয়ারা। তা হয় বৈকি!

সুজা। কিন্তু—

পিয়ারা। আমারও ঠিক ঐ মত—ঐ কিন্তু—

সুজা। তুমি কি বল্‌ছো তা আমি বুঝতে পার্‌ছি নে।

পিয়ারা। সত্যি কথা বল্‌তে কি সেটা আমিও বড় একটা পার্‌ছি নে!

সুজা। দূর—তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়াই বৃথা।

পিয়ারা। সম্পূর্ণ।

সুজা। যুদ্ধের বিষয় তুমি কি বুঝবে?

পিয়ারা। আমি কি বুঝবো?

সুজা। কিন্তু এদিকে আবার একটা মুস্কিল হয়েছে।

পিয়ারা। সে মুস্কিলটা কি রকম?

সুজা। মহম্মদ ত আমায় স্পষ্ট লিখেছে যে সে আমার কন্যাকে বিবাহ কর্বে না।

পিয়ারা। তা কি করে' কর্বে?

সুজা। কেন কর্বে না? আমার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে। এখন কথা ফিরিয়ে নিলে কি চলে?

পিয়ারা। ওমা তা কি চলে?

সুজা। কিন্তু সে এখন বিবাহ কর্ত্তে চায় না।

পিয়ারা। তা ত চাইবেই না।

সুজা। লিখেছে যে তা'র পিতৃশত্রুর কন্যাকে সে বিবাহ কর্বে না।

পিয়ারা। তা কি করে' কর্বে!

সুজা। কিন্তু তাতে আমার মেয়ে যে এদিকে বিষম দুঃখিত হবে।

পিয়ারা। তা হবে বৈ কি! তা আর হবে না!

সুজা। আমি যে কি করি—কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি নে।

পিয়ারা। আমিও পার্চ্ছি নে!

সুজা এখন কি করা যায়।

পিয়ারা। তাই ত!

সুজা। তোমার কাছে কোন বিষয়ে উপদেশ চাওয়া বৃথা।

পিয়ারা। বুঝেছো? কেমন করে' বুঝলে? হ্যাঁগা কেমন করে' বুঝলে? কি বুদ্ধি!

সুজা। এখন কি করি! ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ। তা'র সঙ্গে তা'র বীর পুত্র মহম্মদ। মহা সমস্যার কথা। তাই ভাব্ছি। তুমি কি উপদেশ দাও?

পিয়ারা। প্রিয়তম! আমার উপদেশ শুনবে? শোন ত বলি।

সুজা। বল, শুনি।

পিয়ারা। তবে শোন, আমি উপদেশ দেই, যুদ্ধে কাজ নাই।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কি হবে সাম্রাজ্যে নাথ? আমাদের কিসের অভাব? চেয়ে দেখ এই শস্যশ্যামলা, পুষ্পভূষিতা, সহস্র-নির্ঝরঝঙ্কৃত অমরাবতী—এই বঙ্গভূমি! কিসের সাম্রাজ্য! আর আমার হৃদয়-সিংহাসনে তোমায় বসিয়ে রেখেছি, তার কাছে কিসের সেই ময়ূর-সিংহাসন? যখন আমরা এই প্রাসাদশিখরে দাঁড়িয়ে—করে কর, বক্ষে বক্ষ—বিহঙ্গমের ঝঙ্কার শুনি, ঐ গঙ্গার দিগন্ত প্রসারিত ধূসর বক্ষ দেখি, ঐ অনন্ত নীল-আকাশের উপর দিয়ে আমাদের মিলিত মুগ্ধ-দৃষ্টির নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে চলে' যাই—সেই নীলিমার এক নিভৃত প্রান্তে কল্পনা দিয়ে একটি মোহময় শান্তিময় দ্বীপ সৃষ্টি করি, আর তার মধ্যে এক স্বপ্নময় কুঞ্জে বসে' পরস্পরের দিকে চেয়ে পরস্পরের প্রাণ পান করি—তখন মনে হয় না নাথ, যে কিসের ঐ সাম্রাজ্য? নাথ! এ যুদ্ধে কাজ নাই! হয় ত যা আমাদের নাই তা পাবো না; যা আছে তা হারাবো।

সুজা। তবেই ত তুমি ভাবিয়ে দিলে! একেই ভেবে ভেবে আমার মাথা গরম হয়েছে, তার উপর—না, দারার প্রভুত্ব বরং মান্‌তে পার্তাম। ঔরংজীবের—আমার ছোট ভাইএর প্রভুত্ব—কখন স্বীকার কর্ব না—না কখন না।

প্রস্থান

পিয়ারা। তোমায় উপদেশ দেওয়া বৃথা। বীর তুমি! সাম্রাজ্যের জন্য তুমি যদিও যুদ্ধ না কর্তে, যুদ্ধ কর্বার জন্য তুমি যুদ্ধ কর্বে। তোমায় আমি বেশ চিনি—যুদ্ধের নামে তুমি নাচো।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীতে দরবার-কক্ষ। কাল—প্রাতঃ

সিংহাসনারূঢ় ঔরংজীব। পার্শ্বে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ ইত্যাদি।

সৈন্যাধ্যক্ষগণ, অমাত্যবর্গ, জয়সিংহ ও দেহরক্ষী,

সম্মুখে যশোবন্ত সিংহ

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আমি এসেছিলাম—সুলতান সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাঁহাপনাকে আমার সৈন্য সাহায্য দিতে; কিন্তু এখানে এসে আমার আর সে প্রবৃত্তি নাই। আমি আজ যোধপুরে যাচ্ছি।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! আপনি নর্ম্মদাযুদ্ধে দারার পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন বলে' আমার অপ্রীতিভাজন নহেন। মহারাজের রাজ-ভক্তির নিদর্শন পেলে আমরা মহারাজকে আত্মীয় বলে' গণ্য কর্ব।

যশোবন্ত। যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার অপ্রীতিভাজন হোক কি প্রীতিভাজন হোক্, তাতে তা'র কিছুমাত্র যায় আসে না! আর আমি আজ এ সভায় জাঁহাপনার দয়ার ভিখারী হ'য়ে আসি নাই।

ঔরংজীব। তবে এখানে আসা মহারাজের উদ্দেশ্য?

যশোবন্ত। উদ্দেশ্য একবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করা যে, কি অপরাধে আমাদের দয়ালু সম্রাট্ সাজাহান আজ বন্দী; আর কি স্বত্বে আপনি পিতা বর্ত্তমানে তাঁর সিংহাসনে বসেছেন।

ঔরংজীব। তার কৈফিয়ৎ কি আমায় এখন মহারাজকে দিতে হবে?

যশোবন্ত। দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছে! আমি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি মাত্র।

ঔরংজীব। কি উদ্দেশ্যে?

যশোবন্ত। জাঁহাপনার উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ আচরণ নির্ভর কর্চ্ছে।

ঔরংজীব। কিরূপ? কৈফিয়ৎ যদি না দিই?

যশোবন্ত। তা হ'লে বুঝ্‌বো জাঁহাপনার দেওয়ার মত কৈফিয়ৎ কিছু নাই।

ঔরংজীব। আপনার যেরূপ ইচ্ছা বুঝুন; তাতে ঔরংজীবের কিছু যায় আসে না। ঔরংজীব তার কার্যাবলীর জন্য এক খোদার কাছে ভিন্ন আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না।

যশোবন্ত। উত্তম! তবে খোদার কাছেই কৈফিয়ৎ দিবেন।

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। দাঁড়ান মহারাজ। আমার কৈফিয়ৎ না পেলে আপনি কি কর্বেন?

যশোবন্ত। সাধ্যমত চেষ্টা কর্ব—সম্রাট্ সাজাহানকে মুক্ত কর্তে—এই মাত্র। পারি, না পারি, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু আমার কর্তব্য আমি কর্ব।

ঔরংজীব। বিদ্রোহ কর্বেন?

যশোবন্ত। বিদ্রোহ! সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করার নাম বিদ্রোহ নয়। বিদ্রোহ করেছেন আপনি। আমি সেই বিদ্রোহীর শাসন কর্ব—যদি পারি।

ঔরংজীব। মহারাজ, এতক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা কর্‌ছিলাম যে আপনার স্পর্ধা কতদূর উঠে। পূর্বে শুনেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি—আপনি নির্ভীক। মহারাজ। ভারতসম্রাট্ ঔরংজীব যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহের শত্রুতাকে ভয় করে না। সমরক্ষেত্রে আর একবার ঔরংজীবের পরিচয় চান, পাবেন।—বুঝেছি, নর্মদাযুদ্ধে ঔরংজীবের সঙ্গে মহারাজের সম্যক পরিচয় হয় নাই।

যশোবন্ত। নর্মদার যুদ্ধ জাঁহাপনা! আপনি সেই জয়ের গৌরব করেন? যশোবন্ত সিংহ অনুকম্পাভরে আপনার পথশ্রান্ত হীনবল সৈন্য

আক্রমণ করে নাই। নইলে আমার সৈন্যের শুদ্ধ মিলিত নিশ্বাসে ঔরংজীব সসৈন্যে উড়ে যেতেন। এতখানি অনুকম্পার বিনিময়ে যশোবন্ত সিংহ ঔরংজীবের শাঠ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই তার অপরাধ। সেই জয়ের গৌরব কর্চ্ছেন জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! সাবধান! ঔরংজীবেরও ধৈর্যের সীমা আছে। সাবধান!

যশোবন্ত। সম্রাট্! চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে? চোখ রাঙিয়ে জয়সিংহের মত ব্যক্তিকে শাসন করে' রাখ্‌তে পারেন। যশোবন্ত সিংহের প্রকৃতি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া জান্‌বেন। যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার রক্তবর্ণ চক্ষু আর অগ্নিময় গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে।

মীরজুমলা। মহারাজ! এ কি স্পর্দ্ধা!

যশোবন্ত। স্তব্ধ হও মীরজুমলা! যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ, তখন বন্য-শৃগাল তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় কি হিসাবে? আমরা এখনও কেউ মরি নি। তোমাদের সময় যুদ্ধের পরে—তুমি আর এই শায়েস্তা খাঁ—

শায়েস্তা খাঁ ও মীরজুমলা তরবারি বাহির করিলেন ও কহিলেন—

সাবধান কাফের!

শায়েস্তা। আজ্ঞা দিউন জাঁহাপনা!

ঔরংজীব ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন

যশোবন্ত। বেশ জুড়ি মিলেছে—মীরজুমলা আর এই শায়েস্তা খাঁ—উজীর আর সেনাপতি। দুই নেমকহারাম্। যেমন প্রভু তেমনি ভৃত্য।

শায়েস্তা। আস্পর্দ্ধা এই কাফেরের জাঁহাপনা—যে ভারতসম্রাটের সম্মুখে—

যশোবন্ত। কে ভারতের সম্রাট্?

শায়েস্তা। ভারতের সম্রাট্—বাদশাহ গাজী আলমগীর!

অবগুণ্ঠিতা জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। মিথ্যা কথা! ভারতের সম্রাট ঔরংজীব নয়। ভারতের সম্রাট্ শাহানশাহ্ সাজাহান।

মীরজুমলা। কে এ নারী!

জাহানারা। কে এ নারী? এ নারী সম্রাট্ সাজাহানের কন্যা জাহানারা। (মুখ উন্মুক্ত করিলেন)—কী ঔরংজীব! তোমার মুখ সহসা ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল যে!

ঔরংজীব। তুমি এখানে ভগ্নী!

জাহানারা। আমি এখানে কেন—একথা ঔরংজীব, আজ ঐ সিংহাসনে ধীরভাবে বসে' মানুষের স্বরে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পাচ্ছ? আমি এখানে এসেছি ঔরংজীব, তোমাকে মহারাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত কর্ত্তে।

ঔরংজীব। কার কাছে?

জাহানারা। ঈশ্বরের কাছে। ঈশ্বর নাই ভেবেছো ঔরংজীব? শয়তানের চাকরি করে' ভেবেছো যে ঈশ্বর নাই? ঈশ্বর আছেন।

ঔরংজীব। আমি এখানে বসে' সেই খোদারই ফকিরি কচ্ছি—

জাহানারা। স্তব্ধ হও ভণ্ড! খোদার পবিত্র নাম তোমার জিহ্বায় উচ্চারণ কোরো না। জিহ্বা পুড়ে যাবে। বজ্র ও ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিদাহ ও মড়ক—তোমরা ত লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীর ঘর উড়িয়ে পুড়িয়ে ভাসিয়ে ভেঙ্গে চুরে চলে যাও। শুধু এদেরই কিছু কর্ত্তে পার না।

ঔরংজীব। মহম্মদ! এ উন্মাদিনী নারীকে এখান থেকে নিয়ে যাও! এ—রাজসভা, উন্মাদাগার নয়—মহম্মদ!

জাহানারা। দেখি, এই সভাস্থলে কার সাধ্য যে সম্রাট সাজাহানের কন্যাকে স্পর্শ করে। সে ঔরংজীবের পুত্রই হোক, আর স্বয়ং শয়তানই হোক্।

ঔরংজীব। মহম্মদ! নিয়ে যাও!

মহম্মদ। মার্জনা কর্বেন পিতা! সে স্পর্ধা আমার নেই।

যশোবন্ত। বাদশাহজাদীর প্রতি রূঢ় আচরণ আমরা সহ্য কর্বো না!

অন্য সকলে। কখনই না।

ঔরংজীব। সত্য বটে! আমি ক্রোধে কি জ্ঞান হারিয়েছি! নিজের ভগ্নীর—সম্রাট্ সাজাহানের কন্যার প্রতি এই রূঢ় ব্যবহার কর্বার আজ্ঞা দিচ্ছি! ভগ্নি, অন্তঃপুরে যাও! এ প্রকাশ্য দরবারে, শত কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ানো সম্রাট্ সাজাহানের কন্যার শোভা পায় না। তোমার স্থান অন্তঃপুর।

জাহানারা। তা জানি ঔরংজীব; কিন্তু যখন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে হর্ম্যরাজি ভেঙে পড়ে, তখন অসূর্য্যম্পশ্যরূপা মহিলা যে—সেও নিঃসঙ্কোচে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আজ ভারতবর্ষের সেই অবস্থা। আজ একটা বিরাট অত্যাচারে একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে। এখন আর সে নিয়ম খটে না। আজ যে অন্যায়-নীতির মহাবিপ্লব, যে দুর্বিবহ অত্যাচার—ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে' যাচ্ছে, তা এর পূর্বে বুঝি কুত্রাপি হয় নাই। এত বড় পাপ, এত বড় শাঠ্য আজ ধর্মের নামে চলে' যাচ্ছে! আর মেষশাবকগণ শুদ্ধ অনিমেষ নেত্রে তার পানে চেয়ে আছে! ভারতবর্ষের মানুষগুলো কি আজ শুদ্ধ চাবুকে চলেছে? দুর্নীতির প্লাবনে কি ন্যায়, বিবেক, মনুষ্যত্ব—মানুষের যা কিছু উচ্চ প্রবৃত্তি সব ভেসে গিয়েছে? এখন নীচ স্বার্থসিদ্ধিই কি মানুষের ধর্মনীতি? সৈন্যাধ্যক্ষগণ! অমাত্যগণ! সভাসদগণ! তোমাদের সম্রাট সাজাহান জীবিত থাকতে তোমরা কি স্পর্ধায় তাঁর সিংহাসনে তাঁর পুত্র ঔরংজীবকে বসিয়েছো আমি জান্তে চাই।

ঔরংজীব। আমার ভগ্নী যদি এখান থেকে যেতে অস্বীকৃত হন,

সভাসদগণ, আপনারা বাইরে যান! সম্রাটের কন্যার মর্যাদা রক্ষা করুন।

সকলে বাহিরে যাইতে উদ্যত

জাহানারা। দাঁড়াও। আমার আজ্ঞা—দাঁড়াও। আমি এখানে তোমাদের কাছে নিষ্ফল ক্রন্দন কর্ত্তে আসি নি! আমি নিজের কোন দুঃখও তোমাদের কাছে নিবেদন কর্ত্তে আসি নি! আমি নারীর লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম ত্যাগ করে' এসেছি—আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য। শোন।

সকলে। আজ্ঞা করুন।

জাহানারা। আমি একবার মুখোমুখি তোমাদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি, যে তোমরা তোমাদের সেই বীর, দয়ালু, প্রজাবৎসল সম্রাট্ সাজাহানকে চাও? না, এই ভণ্ড পিতৃদ্রোহী, পরস্বাপহারী ঔরংজীবকে চাও? জেনো, এখনও ধর্ম্ম লুপ্ত হয় নি। এখনও চন্দ্র সূর্য উঠছে! এখনও পিতা পুত্রের সম্বন্ধ আছে। আজ কি একদিনে একজনের পাপে তা উল্টে যাবে? তা হয় না। ক্ষমতা কি এত দৃপ্ত হয়েছে, যে তার বিজয়-দুন্দুভি তপোবনের পবিত্র শান্তি লুটে নেবে? অধর্মের আস্পর্দ্ধা এত বেশি হয়েছে যে, সে নির্বিরোধে স্নেহ দয়া ভক্তির বক্ষের উপর দিয়ে তার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে?—বলো! তোমরা ঔরংজীবের ভয় কর্চ্ছ? কে ঔরংজীব? তার দুই ভুজে কত শক্তি? তোমরাই তার বল। তোমরা ইচ্ছে কর্লে তাকে ওখানে রাখতে পারো; ইচ্ছা কর্লে তাকে ওখান থেকে টেনে এনে পঙ্কে নিক্ষেপ কর্ত্তে পারো। তোমরা যদি সম্রাট্ সাজাহানকে এখনও ভালোবাসো, সিংহ স্থবির বলে' তাকে পদাঘাত কর্ত্তে না চাও, তোমরা যদি মানুষ হও তবলো সমস্বরে "জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়।" দেখবে ঔরংজীবের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ে যাবে!

সকলে। জয় সম্রাট সাজাহানের জয়—

জাহানারা। উত্তম, তবে—

ঔরংজীব। (সিংহাসন হইতে নামিয়া) উত্তম। তবে এই মুহূর্তে আমি সিংহাসন ত্যাগ কর্ল্াম। সভাসদ্‌গণ! পিতা সাজাহান রুগ্ন, শাসনে অক্ষম। তিনি যদি শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে আমার দাক্ষিণাত্য ছেড়ে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি রাজ্যের রশ্মি সাজাহানের হাত থেকে নিই নাই—দারার হাত থেকে নিয়েছি। পিতা পূর্ব্ববৎ সুখে স্বচ্ছন্দে আগ্রার প্রাসাদে আছেন। আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, যে দারা সম্রাট্ হোন্, বলুন আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি। দারা কেন? যদি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই সিংহাসনে বস্‌তে চান, যদি তিনি বা মহারাজ জয়সিংহ বা আর কেউ শাসনের মহাদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকেন—আমার আপত্তি নাই। একদিকে দারা, অন্যদিকে সুজা, আর একদিকে মোরাদ, এই শত্রু ঘাড়ে করে সিংহাসনে বস্‌তে চান, বসুন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আপনাদের সম্মতিক্রমে ও অনুরোধে আমি এখানে বসেছি। মনে কর্ব্বেন না যে, এ সিংহাসন আমার পুরস্কার। এ আমার শাস্তি! আমি আজ সিংহাসনের উপর বসে' নাই, বারুদের স্তূপের উপর বসে আছি। তার উপর এর জন্য আমি মক্কায় যাবার সুখ থেকে বঞ্চিত আছি। আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়, যে দারা সিংহাসনে বসুন, হিন্দুস্থান আবার অরাজক ধর্ম্মহীন হোক্, আমি আজই মক্কায় যাচ্ছি। সে ত আমার পরম সুখ! বলুন—

সকলে নিস্তব্ধ রহিল

ঔরংজীব। এই আমি আমার রাজমুকুট সিংহাসনের পদতলে রাখ্‌লাম। আমি এ সিংহাসনে বসেচি আজ—সম্রাটের নামে—কিন্তু তাও বেশি দিনের জন্য নয়! সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করে দারার বিশৃঙ্খল রাজত্বে শৃঙ্খলা এনে, পরে আপনারা যার হাতে বলেন, তার হাতে রাজ্য

ছেড়ে দিয়ে, আমি সেই মক্কায়ই যেতে চাই। আমি এখানে বসেও সেই দিকেই চেয়ে আছি—আমার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন, জীবনের ধ্যান—সেই মহাতীর্থের দিকেই চেয়ে আছি! আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, আমি আজই রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিয়ে মক্কায় চলে' যাই। সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। আমার জন্য ভাববেন না। আপনারা নিজেদের দিকে চেয়ে বলুন যে পীড়ন চান, না শাসন চান? বলুন, আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনদণ্ড গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব না, আর আপনাদের ইচ্ছাক্রমেও এখানে দাঁড়িয়ে দারার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার দেখতে পার্ব না। বলুন, আপনাদের কি ইচ্ছা!—চল মহম্মদ! মক্কায় যাবার জন্য প্রস্তুত হও—বলুন, আপনাদের কি অভিপ্রায়!

সকলে। জয় সম্রাট্ ঔরংজীবের জয়—

ঔরংজীব। উত্তম! আপনাদের অভিমত জান্‌লাম। এখন আপনারা বাইরে যান। আমার ভগ্নীর—সাজাহানের কন্যার অমর্যাদা কর্বেন না।

ঔরংজীব ও জাহানারা ভিন্ন সকলের প্রস্থান

জাহানারা। ঔরংজীব!

ঔরংজীব। ভগ্নী!

জাহানারা। চমৎকার! আমি প্রশংসা না করে' থাকতে পার্ছি না। এতক্ষণ আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে' ছিলাম; তোমার ভেল্কি দেখ্‌ছিলাম। যখন চমক ভাঙ্‌লো তখন সব হারিয়ে বসে' আছি! চমৎকার!

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞা কর্ছি, আল্লার নামে শপথ কচ্ছি, যে আমি যতদিন সম্রাট আছি, তোমার আর পিতার কোন অভাব হবে না।

জাহানারা। আবার বলি—চমৎকার!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—খিজুয়ায় ঔরংজীবের শিবির। কাল—রাত্রি

ঔরংজীব একখণ্ড পত্রিকা হস্তে লইয়া দেখিতেছিলেন

ঔরংজীব। কিস্তি। না গজ দিয়ে ঢেকে দেবে। আচ্ছা—না। ওঠসাই কিস্তিতে আমার দাবা যাবে! কিন্তু—দেখি—উঁহুঃ! আচ্ছা এই গজের কিস্তি—চেপে দেবে। তার পর—এই কিস্তি। এই পদ। তার পর এই কিস্তি! কোথায় যাবে! মাৎ! (সোৎসাহে) মাৎ। (পরিক্রমণ)

মীরজুমলার প্রবেশ

ঔরংজীব। আমরা এ যুদ্ধে জিতেছি উজীর সাহেব।

মীরজুমলা। সে কি জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। প্রথম, কামান চালাবেন আপনি। তার পরে, আমি হাতি নিয়ে সেই চকিত সৈন্যের উপর পড়বো। তার পর মহম্মদের অশ্বারোহী। এই তিন কিস্তিতে মাৎ।

মীরজুমলা। আর যশোবন্ত সিংহ?

ঔরংজীব। তার উপর এবার তত নির্ভর করি না। তাকে চোখে চোখে রাখ্‌তে হবে—আমাদের আর সুজার সৈন্যের মধ্যে; অনিষ্ট না কর্ত্তে পারে! তার পশ্চাতে থাকবে আপনার কামান। আমি আর মহম্মদ তার দুই পাশে থাকবো। বিপক্ষের আক্রমণ হবে প্রধানতঃ যশোবন্তের রাজপুত সৈন্যের উপর। তা'রা যুদ্ধ করে ভালো; নৈলে

পিছনে আপনার কামান রৈল। তা যায়—দাবা যাক্। আমরা জয়লাভ কর্ব! তবে কাল প্রত্যূষে প্রস্তুত থাক্‌বেন—এখন যেতে পারেন।

মীরজুমলা। যে আজ্ঞে। প্রস্থান

ঔরংজীব। যশোবন্ত সিংহ! এটা শুদ্ধ পরীক্ষা।

মহম্মদের প্রবেশ

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার স্থান হচ্ছে সম্মুখে, যশোবন্ত সিংহের দক্ষিণে। তুমি সব শেষে আক্রমণ কর্বে। শুদ্ধ প্রস্তুত থাক্‌বে। এই দেখ নক্সা। (মহম্মদ দেখিলেন)

ঔরংজীব। বুঝলে ?

মহম্মদ। হাঁ পিতা।

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও। কাল প্রত্যূষে। মহম্মদের প্রস্থান

ঔরংজীব। সুজার লক্ষ সৈন্য অশিক্ষিত! বেশি কষ্ট পেতে হবে না বোধ হয়। একবার ছত্রভঙ্গ কর্তে পার্লে হয়।—এই যে মহারাজ!

দিলদারের সহিত যশোবন্ত সিংহ প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিলেন

ঔরংজীব। মহারাজ! আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি অনেক ভেবে সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে আপনাকে দিলাম।

যশোবন্ত। আমাকে ?

ঔরংজীব। তাতে আপত্তি আছে ?

যশোবন্ত। না, আপত্তি নাই।

ঔরংজীব। আপনি যে ইতস্ততঃ কর্ছেন!

যশোবন্ত। কুমার মহম্মদ সৈন্যের পুরোভাগে থাক্‌বে কথা ছিল!

ঔরংজীব। আমি মত বদ্‌লেছি। তিনি থাক্‌বেন আপনার দক্ষিণ পাশে।

যশোবন্ত। আর মীরজুমলা?

ঔরংজীব। আপনার পশ্চাতে। আমি আপনার বাম পাশে থাক্‌বো।

যশোবন্ত। ও! বুঝেচি! জাঁহাপনা আমায় সন্দেহ করেন।

ঔরংজীব। মহারাজ চতুর। মহারাজের সঙ্গে চাতুরী নিষ্ফল। মহারাজকে সঙ্গে এনেছি, তার কারণ এ নয়, যে মহারাজকে আমরা পরমাত্মীয় জ্ঞান করি। সঙ্গে এনেছি এই কারণে যে আমার অনুপস্থিতিতে মহারাজ আগ্রায় বিভ্রাট না বাধান—সে বেশ জানেন বোধ হয়।

যশোবন্ত। না অতদূর ভাবি নি। জাঁহাপনা! আমি চতুর বলে আমার একটা অহঙ্কার ছিল; কিন্তু দেখলাম যে সে বিষয়ে জাঁহাপনার কাছে আমি শিশু।

ঔরংজীব। এখন মহারাজের অভিপ্রায় কি?

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! রাজপুত জাতি বিশ্বাসঘাতকের জাতি নয়। কিন্তু আপনারা—অন্ততঃ আপনি তাদের বিশ্বাসঘাতক করে' তুলছেন; কিন্তু সাবধান জাঁহাপনা! এই রাজপুত জাতিকে ক্ষিপ্ত কর্বেন না। বন্ধুত্বে রাজপুতের মত মিত্র কেউ নেই। আবার শত্রুতায় রাজপুতের মত ভয়ঙ্কর শত্রু কেউ নেই। সাবধান!

ঔরংজীব। মহারাজ! ঔরংজীবের সম্মুখে ভ্রূকুটি করে' কোন লাভ নাই। যান। আমার এই আজ্ঞা। পালন কর্বেন। নৈলে জানেন ঔরংজীবকে।

যশোবন্ত। জানি। আর আপনিও জানেন যশোবন্ত সিংহকে। আমি কারো ভৃত্য নই। আমি ও আজ্ঞা পালন কর্ব না।

ঔরংজীব। মহারাজ! নিশ্চিত জানবেন ঔরংজীব কখন কাউকে ক্ষমা করে না! বুঝে কাজ কর্বেন।

যশোবন্ত। আর আপনিও নিশ্চিত জানবেন যে, যশোবন্ত সিংহ কাউকে ভয় করে না। বুঝে কাজ কর্বেন।

ঔরংজীব। এও কি সম্ভব!

যশোবন্ত। ঔরংজীব!

ঔরংজীব। যদি তোমায় এই মুহূর্তে আমি বন্দী করি, তোমায় কে রক্ষা করে?

যশোবন্ত। এই তরবারি! জেনো ঔরংজীব, এই দুর্দিনেও মহারাজ যশোবন্ত সিংহের এক ইঙ্গিতে বিশ সহস্র রাজপুত-তরবারি এক সঙ্গে সূর্যকিরণে ঝল্‌সে উঠে। আর এ দুর্দিনেও রাজপুত—রাজপুত!

প্রস্থান

ঔরংজীব। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। একটু বেশি গিয়েছি। এই রাজপুত জাতটাকে আমি সম্যক্ চিনলাম না। এত তার দর্প! এত অভিমান! —চিনলাম না।

দিলদার। চিনবেন কেমন করে জাঁহাপনা! আপনার শাঠ্যের রাজ্যেই বাস। আপনি দেখে আসছেন শুধু জোচ্চোরি, খোসামুদি, নেমকহারামি! তাদের বশ কর্তে আপনি পটু, কিন্তু এ আলাদা রকমের রাজ্য। এ রাজ্যের প্রজাদের কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়।

ঔরংজীব। হুঁ—দেখি এখনও যদি প্রতিকার কর্তে পারি; কিন্তু বোধ হচ্ছে—রোগ এখন হাকিমির বাইরে।

প্রস্থান

দিলদার। দিলদার! তুমি সেঁধিয়েছিলে ছুঁচ হ'য়ে—এখন ফাল হ'য়ে না বেরোও! আমার সেই ভয়। প্রথমে পাঠক! তার পরে বিদূষক! তার পর রাজনৈতিক। তার পরে বোধ হয় দার্শনিক! তার পরে?

কথা কহিতে কহিতে ঔরংজীব ও মীরজুমলার পুনঃ প্রবেশ

ঔরংজীব। কেবল দেখবেন অনিষ্ট না কর্ত্তে পারে।

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। তার চক্ষে একটা বড় বেশি রক্তবর্ণ দীপ্তি দেখেছি। আর একেবারে প্রাণের ভয় নেই। সমস্ত রাজপুত জাতটাই তাই।

মীরজুমলা। আমি দেখেছি জাঁহাপনা, যে একটা কামানের চেয়েও একটা রাজপুত ভয়ঙ্কর!

ঔরংজীব। দেখবেন খুব সাবধান!

মীরজুমলা। যে আজ্ঞে!

ঔরংজীব। একবার মহম্মদকে পাঠান—না, আমিই তার শিবিরে যাচ্চি।

প্রস্থান

মীরজুমলা। এই যুদ্ধে ঔরংজীব যেরূপ বিচলিত হয়েছেন, এর পূর্বে আমি তাঁকে এরকম বিচলিত হ'তে কখন দেখি নি।—ভা'য়ে ভা'য়ে যুদ্ধ—তাই বোধহয়।—ওঃ ভা'য়ে ভা'য়ে বিবাদ কি অস্বাভাবিক! কি ভয়ঙ্কর!

দিলদার। আর কি উত্তেজক! এ নেশা সব নেশার চরম। উজীরসাহেব! আমি এইটে কোন রকমেই বুঝতে পারি না যে শত্রুতা বাড়াবার জন্য মানুষ কেন এতগুলো ধর্মের সৃষ্টি করেছিল—যখন ঘরে এত বড় শত্রু! কারণ ভাইয়ের মত শত্রু আর কেউ নয়।

মীরজুমলা। কেন?

দিলদার। এই দেখুন উজীরসাহেব, হিন্দু আর মুসলমান, এদের কি মেলে? প্রথমতঃ ভগবানের দান যে এ চেহারাখানা, টেনে-বুনে যতখানি আলাদা করা যায় তা তা'রা করেছে। এরা রাখে দাড়ি

সম্মুখে—ওরা রাখে টিকি পিছনে (তাও সম্মুখে রাখবে না।) এরা পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াজ পড়ে, ওরা পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করে। এরা কাছা দেয় না, ওরা দেয়। এরা লেখে ডান দিক থেকে বাঁয়ে, ওরা লেখে বাঁয়ে থেকে ডাইনে—লেখে না!

মীরজুমলা। হাঁ, তাই কি?

দিলদার। তবু হিন্দুরা মুসলমানের অধীনে এক রকম সুখে আছে বল্‌তে হবে ; কিন্তু ভাই ভাইয়ের প্রভুত্ব স্বীকার কর্বে না।

মীরজুমলা হাসিলেন

দিলদার। (যাইতে যাইতে) কেমন ঠিক কি না?

মীরজুমলা। (যাইতে যাইতে) হাঁ ঠিক।

নিষ্ক্রান্ত

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—খিজুয়ায় সুজার শিবির। কাল—সন্ধ্যা

সুজা একখানি মানচিত্র দেখিতেছিলেন। পুষ্পমালা হস্তে পিয়ারা গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিলেন

পীয়ারার গীত

আমি সারা সকালটি বসে' বসে' এই সাধের মালাটি গেঁথে'ছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমারি গলায় মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু, করি নাই কিছু বঁধু আর;
শুধু বকুলের তলে বসিয়ে বিরলে মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন গাহিতেছিল সে তরুশাখা পরে সুললিত স্বরে পাপিয়া,
তখন দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে প্রভাত-সমীরে কাঁপিয়া।
তখন প্রভাতের হাসি, পড়েছিল আসি কুসুমকুঞ্জভবনে;
আমি তারি মাঝখানে, বসিয়া বিজনে মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু বকুল কুসুম কুড়ায়ে।
আছে প্রভাতের প্রীতি সমীরণ গীতি কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে;
আছে, সবার উপরে মাখা তার বঁধু তব মধুময় হাসি গো,
ধর, গলে ফুলহার, মালাটি তোমার, তোমারই কারণে গেঁথেছি।

পিয়ারা মালাটি সুজার গলায় দিলেন

সুজা। (হাসিয়া) এ কি আমার বরমাল্য পিয়ারা? আমি ত যুদ্ধে এখনও জয়লাভ করি নি!

পিয়ারা। কি যায় আসে। আমার কাছে তুমি চিরজয়ী। তোমার প্রেমের কারাগারে আমি বন্দিনী। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার ক্রীতদাস—কি আজ্ঞা হয়? (জানু পাতিলেন)

সুজা। এ একটা বেশ নূতন রকমের ঢং করেছো ত পিয়ারা। আচ্ছা যাও বন্দিনী, আমি তোমায় মুক্ত করে' দিলাম।

পিয়ারা। আমি মুক্তি চাই না। আমার এ মধুর দাসত্ব!

সুজা। শোনো। আমি একটা ভাবনায় পড়েছি।

পিয়ারা। সে ভাবনাটা হচ্ছে কি?—দেখি আমি যদি কোন উপায় কর্ত্তে পারি।

সুজা। (মানচিত্র দেখাইয়া) দেখ পিয়ারা—এইখানে মীরজুমলার কামান, এইখানে মহম্মদের পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, আর এইখানে ঔরংজীব।

পিয়ারা। কৈ আমি ত শুধু একখানা কাগজ দেখছি। আর ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

সুজা। এখন এইরকম ভাবে আছে, কিন্তু কাল যুদ্ধের সময় কে কোথায় থাকবে বলা যাচ্ছে না।

পিয়ারা। কিছু বলা যাচ্ছে না।

সুজা। ঔরংজীবের দস্তুর এই যে যখন তার পক্ষে কামানের গোলা বর্ষণ হয়, তার ঠিক পরেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আক্রমণ করে।

পিয়ারা। বটে! তা হ'লে ত বড় সহজ কথা নয়।

সুজা। তুমি কিছু বোঝ না!

পিয়ারা। ধরে ফেলেছো।—কেমন করে জানলে? হাঁ গা—বল না কেমন করে জানলে? আশ্চর্য! একেবারে ঠিক ধরেছো!

সুজা। আমার সৈন্য অশিক্ষিত। আমি যশোবন্ত সিংহকে ভজাতে পারি—একবার লিখে দেখবো। কিন্তু—আচ্ছা, তুমি কি উপদেশ দেও?

পিয়ারা। আমি তোমাকে উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কেন! তোমায় উপদেশ দিলে ত তুমি তা কখন শোনো না। আমি তোমায় বেশ জানি। তুমি বিষম একগুঁয়ে। আমাকে আমার মত জিজ্ঞাসা কর বটে, কিন্তু তোমার বিপরীত মত দিলেই চটে যাও।

সুজা। তা—হাঁ—তা—যাই বটে।

পিয়ারা। তাই সেই থেকে স্বামী যা বলেন তাতেই আমি পতিব্রতা হিন্দু স্ত্রীর মত হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিই।

সুজা। তাই ত! দোষ আমারই বটে! পরামর্শ চাই বটে, কিন্তু অনুকূল পরামর্শ না দিলেই চটে যাই। ঠিক বলেছো! কিন্তু শোধরাবারও উপায় নাই।

পিয়ারা। না। তোমার উদ্ধারের উপায় থাকলে আমি তোমায় উদ্ধার কর্তাম। তাই আমি আর সে চেষ্টাও করি নে। আপন মনে গান গাই!

সুজা। তাই গাও। তোমার গান যেন সুরা। শত দুঃখ শত যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। কঠিন ঘটনার রাজ্য থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তখন আমার বোধ হয় যেন একটা ঝঙ্কার আমায় ঘিরে রয়েছে। আকাশ, মর্ত্য—আর কিছুই দেখতে পাই না। গাও—কাল যুদ্ধ। সে অনেক দেরি। যা হবার তাই হবে। গেয়ে যাও।

পিয়ারা। তবে তা শুনবার আগে এই পূর্ণজ্যোৎস্নালোকে তোমার মনকে স্নান করিয়ে নাও। তোমার বাসনাপুষ্পগুলিকে প্রেমচন্দন মাখিয়ে নাও—তার পরে আমি গান গাই—আর তুমি তোমার সেই পুষ্পগুলি আমার চরণে দান কর!

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি বেশ বলেছো—যদিও আমি তোমার উপমার ঠিক রসগ্রহণ কর্তে পার্লাম না।

পিয়ারা। চুপ্‌। আমি গান গাই, তুমি শোনো। প্রথমতঃ এই জায়গাটায় হেলান দিয়ে—এই রকম করে' বোসো! তার পরে হাতটা এই জায়গায় এই রকম ভাবে রাখো! তারপরে চোখ বোজো—যেমন খৃস্টানেরা প্রার্থনা করবার সময় চোখ বোজে—মুখে যদিও বলে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও—কিন্তু কার্যতঃ যেটুকু ঈশ্বরের আলো পাচ্ছিল, চোখ বুজে তাও অন্ধকার করে ফেলে!

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি অনেক কথা বলো বটে, কিন্তু যখন এই বক ধার্মিকদের ঠাট্টা কর, তখন যেমন মিষ্টি লাগে—কারণ আমি কোন ধর্মই মানি নে।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল। যেমন বল্লেই একটা তেমন বলা চাই—

সুজা। দারা হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী—ভণ্ড। ঔরংজীব—গোঁড়া মুসলমান—ভণ্ড। মোরাদও মুসলমান—গোঁড়া নয়—ভণ্ড।

পিয়ারা। আর তুমি কোন ধর্মই মানো না—ভণ্ড।

সুজা। কিসে?—আমি কোন ধর্মেরই ভান করি নে। আমি সোজাসুজি বলি যে, আমি সম্রাট্‌ হতে চাই।

পিয়ারা। এইটেই ভণ্ডামি।

সুজা। ভণ্ডামি কিসে! আমি দারার প্রভুত্ব স্বীকার কর্তে রাজি ছিলাম; কিন্তু আমি ঔরংজীব আর মোরাদের প্রভুত্ব মানতে পারি নে। আমি তাদের বড় ভাই।

পিয়ারা। ভণ্ডামি—বড় ভাই হওয়া ভণ্ডামি।

সুজা। কিসে? আমি আগে জন্মেছিলাম।

পিয়ারা। আগে জন্মানো ভণ্ডামি। আর আগে জন্মানোতে তোমার নিজের কোন বাহাদুরি নেই। তার দরুণ তুমি সিংহাসন বেশি দাবি কর্তে পারো না!

সুজা। কেন?

পিয়ারা। আমাদের বাবুর্চি ঐ রহমৎউল্লা তোমার অনেক আগে জন্মেছে। তবে তোমার চেয়ে সিংহাসনের উপর তার দাবি বেশি?

সুজা। সে ত আর সম্রাটের পুত্র নয়।

পিয়ারা। হতে কতক্ষণ।

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি ঐ রকম তর্ক কর্বে? না তুমি গান গাও—যা পারো!

পিয়ারার গীত

তুমি বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ,
(আমি) পারি না যেতে ছাড়ায়ে,
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর—
(কি) প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ।
এ যে যেতে বাজে চরণে এ যে বিরহ বাজে স্মরণে
কোথা যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

সুজা। পিয়ারা! ঈশ্বর তোমাকে তৈরি করেছিলেন কেন? ঐ রূপ, ঐ রসিকতা, ঐ সঙ্গীত! এমন একটা ব্যাপার ঈশ্বর এই কঠিন মর্ত্যভূমে তৈরি করেছিলেন কেন?

পিয়ারা। তোমারি জন্য প্রিয়তম!

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আমেদাবাদ। দারার শিবির। কাল—রাত্রি।

দারা। আশ্চর্য! যে দারা একদিন সেনাপতি নরপতির উপরে হুকুম চালাত, সে নগর হ'তে নগরে প্রতাড়িত হ'য়ে আজ পরের দুয়ারে ভিখারী; আর তার দুয়ারে ভিখারী, যে ঔরংজীবের আর মোরাদের শ্বশুর। এত নীচে নেমে যেতে হবে তা ভাবি নি।

নাদিরা। পুত্র সোলেমানের খবর পেয়েছ কিছু?

দারা। তার খবর সেই এক। মহারাজ জয়সিংহ তাকে পরিত্যাগ ক'রে' সসৈন্যে ঔরংজীবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বেচারী পুত্র জনকতক অবশিষ্ট সঙ্গীমাত্র নিয়ে, (তাকে আর সৈন্য বলা যায় না) হরিদ্বারের পথে লাহোরে আমার উদ্দেশ্যে আসছিল। পথে ঔরংজীবের এক সৈন্যদল তাকে শ্রীনগরের প্রান্তে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। সোলেমান এখন শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহের দ্বারে ভিখারী। কি নাদিরা—কাঁদছ?

নাদিরা। না প্রভু!

দারা। না কাঁদো। কিছু সান্ত্বনা পাবে—যদি কাঁদতেও পার্ত্তাম!

নাদিরা। আবার ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্বে?

দারা। কর্ব। যতদিন এ দেহে প্রাণ আছে, ঔরংজীবের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব না। যুদ্ধ কর্ব। সে আমার বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে' তাঁর সিংহাসন অধিকার করেছে; আমি যতদিন না পিতাকে কারামুক্ত কর্তে পারি, যুদ্ধ কর্ব। কি নাদিরা! মাথা হেঁট কর্লে যে! আমার এ সঙ্কল্প তোমার পছন্দ হচ্ছে না!—কি কর্ব!

নাদিরা। না নাথ! তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তবে—

দারা। তবে?

নাদিরা। নাথ! নিত্য এই আতঙ্ক, এই প্রয়াস, এই পলায়ন কেন?

দারা। কি কর্বে বল, যখন আমার হাতে পড়েছো তখন সৈতে হবে বৈকি?

নাদিরা। আমি আমার জন্য বলছি না প্রভু! আমি তোমারই জন্য বল্‌ছি। একবার আয়নায় নিজের চেহারাখানি দেখ দেখি নাথ—এই অস্থিসার দেহ, এই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, এই শুভ্রায়িত কেশ—

দারা। আজ যদি আমার এ চেহারা তোমার পছন্দ না হয়—কি কর্ব।

নাদিরা। আমি কি তাই বল্‌ছি!

দারা। তোমাদের জাতির স্বভাব। তোমাদের কি! তোমরা কেবল অনুযোগ কর্তে পারো। তোমরা আমাদের সুখে বিঘ্ন, দুঃখে বোঝা!

নাদিরা। (ভগ্নস্বরে) নাথ! সত্যই কি তাই! (হস্তধারণ)

দারা। যাও! এ সময়ে আর নাকি-সুর ভালো লাগে না।

হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান

নাদিরা। (কিছুক্ষণ চক্ষে বস্ত্র দিয়া রহিলেন। পরে গাঢ়স্বরে কহিলেন) দয়াময় আর কেন!—এইখানে যবনিকা ফেলে দাও! সাম্রাজ্য হারিয়েছি, প্রাসাদ সম্ভোগ ছেড়ে এসেছি, পথে—রৌদ্রে, শীতে, অনশনে, অনিদ্রায় কতদিন কাটিয়েছি; সব হেসে সহ্য করেছি, কারণ স্বামীর সোহাগ হারাই নাই।—কিন্তু আজ—(কণ্ঠরুদ্ধ হইল) তবে আর কেন! আর কেন! সব সইতে পারি, শুধু, এইটে সইতে পারি নে। (ক্রন্দন)

সিপারের প্রবেশ

সিপার। মা—এ কি ? তুমি কাঁদ্‌ছ মা !

নাদিরা। না বাবা আমি কাঁদ্‌ছি না—ওঃ, সিপার ! সিপার !

(ক্রন্দন)

সিপার কাছে আসিয়া নাদিরার গলদেশে হাত দিয়া
চক্ষের বস্ত্র সরাইতে গেল

সিপার। মা কাঁদ্‌ছো কেন ? কে তোমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে ? আমি তাকে কখনও ক্ষমা করবো না—আমি—তাকে—

এই বলিয়া সিপার নাদিরার গলদেশ জড়াইয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে
লাগিল। নাদিরা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন

জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। এ কি !—মা কাঁদছে কেন, সিপার ?

নাদিরা। না জহরৎ ! আমি কাঁদ্‌ছি না।

জহরৎ। মা ! তোমার চক্ষে জল ত কখন দেখি নাই। জ্যোৎস্নার মত—রাত্রি যত গভীর, তোমার হাসিটি তত উজ্জ্বল দেখেছি। অনশনে অনিদ্রায় চেয়ে দেখেছি, যে তোমার অধরে সে হাসিটি দুর্দিনের বন্ধুর মত লেগেই আছে—আজ এ কি মা ?

নাদিরা। যন্ত্রণা বাক্যের অতীত জহরৎ। আজ আমার দেবতা বিমুখ হয়েছেন !

দারার পুনঃ প্রবেশ

দারা। নাদিরা ! আমায় ক্ষমা কর ! আমার অপরাধ হয়েছে। বাহিরে গিয়েই বুঝতে পেরেছি।

নাদিরা প্রবলতর বেগে কাঁদিতে লাগিলেন

দারা। নাদিরা ! আমি অপরাধ স্বীকার কর্ছি ! ক্ষমা চাচ্ছি।

তবু—ছিঃ! নাদিরা যদি জান্তে, যদি বুঝতে যে এ অন্তরে কি জ্বালা দিবারাত্র জ্বল্‌ছে—তা হ'লে আমার এই অপরাধ নিতে না।

নাদিরা। আর তুমি যদি জান্তে প্রিয়তম, যে আমি তোমায় কত ভালোবাসি, তা হ'লে এত কঠিন হ'তে পার্ত্তে না!

সিপার। (অস্ফুটস্বরে) তোমায় যে আমি দেবতার মত ভক্তি করি বাবা!

নাদিরা। বৎস! তোমার বাবা আমায় কিছু বলেন নি! আমি বড় বেশি অভিমানিনী—আমারই দোষ।

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। বাহিরে একজন লোক ডাকছেন, খোদাবন্দ!

দারা। কে তিনি?

বাঁদী। শুনলাম তিনি গুজরাটের সুবাদার।

দারা। সুবাদার এসেছেন?

নাদিরা। অমি ভিতরে যাই।

প্রস্থান

দারা। তাঁকে এইখানেই নিয়ে এসো সিপার।

বাঁদীর সহিত সিপারের প্রস্থান

দেখা যাক—যদি আশ্রয় পাই।

সাহা নাবাজ ও সিপারের প্রবেশ

সাহা নাবাজ। বন্দেগি যুবরাজ!

দারা। বন্দেগি সুলতানসাহেব!

সাহা নাবাজ। জাঁহাপনা আমায় স্মরণ করেছেন?

দারা। হাঁ সুলতানসাহেব। আমি একবার আপনার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম।

সাহা নাবাজ। আজ্ঞা করুন!

দারা। আজ্ঞা কর্ব! সে দিন গিয়েছে সুলতানসাহেব; আজ ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি। আজ্ঞা কর্বে এখন—ঔরংজীব।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব! তার আজ্ঞা আমার জন্য নয়।

দারা। কেন সুলতানসাহেব! আজ ঔরংজীব ভারতের সম্রাট্।

সাহা নাবাজ। ভারতের সম্রাট্ ঔরংজীব? যে স্বার্থত্যাগের মুখোশ পরে' বৃদ্ধ পিতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে, স্নেহের মুখোশ পরে' ভাইকে বন্দী করে, ধর্ম্মের মুখোশ পরে' সিংহাসন অধিকার করে—সে সম্রাট্? আমি বরং এক অন্ধ পঙ্গুকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে তাকে সম্রাট্ বলে' অভিবাদন কর্ত্তে রাজি আছি; কিন্তু ঔরংজীবকে নয়।

দারা। সে কি সুলতানসাহেব! ঔরংজীব আপনার জামাতা।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব যদি আমার জামাতা না হ'য়ে আমার পুত্র হোত, আর সেই পুত্র আমার একমাত্র সন্তান হোত ত আমি তা'র সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ কর্ত্তাম! অধর্ম্মকে কখনো বরণ করতে পারি না—আমার জীবন থাকতে না।

দারা। কি কর্বেন স্থির করেছেন?

সাহা নাবাজ। যুবরাজ দারার পক্ষে যুদ্ধ কর্ব। পূর্ব্ব থেকেই তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার এই সামান্য সৈন্য দিয়ে ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তাই আমি সৈন্য সংগ্রহ কর্ছি।

দারা। কি রকমে?

সাহা নাবাজ। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের কাছে সাহায্য ভিক্ষা ক'রে পাঠিয়েছি।

দারা। তিনি সাহায্য কর্ত্তে স্বীকৃত হয়েছেন?

সাহা নাবাজ। হয়েছেন।—কোন ভয় নাই সাহাজাদা। আসুন

—আপনি আজ আমার অতিথি—সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র। আপনি তাঁর মনোনীত সম্রাট্। আমি একজন বৃদ্ধ রাজভক্ত প্রজা। বৃদ্ধ সম্রাটের জন্য যুদ্ধ কর্ব। জয়লাভ না কর্তে পারি, প্রাণ দিতে পার্ব! বৃদ্ধ হয়েছি, একটা পুণ্য করে' পাথেয় কিছু সংগ্রহ করে' নিয়ে যাই।

দারা। তবে আপনি আমায় আশ্রয় দিচ্ছেন?

সাহা নাবাজ। সাহাজাদা! আমি মহৎ নই—আমি একজন মানুষ। আর আমি আজ যা কর্ছি একটা মহা স্বার্থত্যাগ কচ্ছি যে তা মানি না। সাহাজাদা, আজ আমি এত বৃদ্ধ হয়েছি—তবু সাহস করে' বলতে পারি যে, জেনে অধর্ম করি নি; কিন্তু ভালো কাজও বড় একটা করিনি। আজ যদি সুযোগ পেয়েছি—ছাড়বো কেন?

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

জহরৎ উন্নিস'র পুনঃ প্রবেশ

জহরৎ। এত তুচ্ছ অসার অকর্মণ্য আমি! পিতার কোন কাজেই লাগি না। শুদ্ধ একটা বোঝা!—হা রে অধম নারীজাতি! পিতামাতার এই অবস্থা দেখ্ছি, কিছু কর্তে পার্ছি না। মাঝে মাঝে কেবল উষ্ণ অশ্রুপাত।—কিন্তু আমি যাহোক একটা কিছু কব, একটা কিছু—বা পর্বত শিখর হ'তে ঝম্পের মত অসমসাহসিক—তার মত ভয়ঙ্কর।—দেখি।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কাশ্মীরের মহারাজা পৃথ্বীসিংহের প্রমোদোদ্যান। কাল—সন্ধ্যা

সোলেমান একাকী

সোলেমান। এলাহাবাদ থেকে পালিয়ে শেষে এই দূর পার্বত্য কাশ্মীরে আসতে হ'লো। পিতার সাহায্যে বেরিয়েছিলাম। নিষ্ফল হয়েছি।—সুন্দর এই দেশ! যেন একটা কুসুমিত সঙ্গীত, একটা চিত্রিত স্বপ্ন, একটা অলস সৌন্দর্য। স্বর্গের একটি অপ্সরা যেন মর্ত্যে নেমে এসে, ভ্রমণে শ্রান্ত হ'য়ে, পা ছড়িয়ে হিমালয়ের গায়ে হেলে, বাম করতলে কপোল রেখে, নীল-আকাশের দিকে চেয়ে আছে! এ কি সঙ্গীত!

দূরে সঙ্গীত

এ যে ক্রমেই কাছে আস্‌ছে। ঐ যে একখানি সজ্জিত নৌকায় কয়টি সজ্জিতা নারী নিজেরাই নৌকা বেয়ে গাইতে গাইতে আস্‌ছে।—কি সুন্দর! কি মধুর!

একখানি সজ্জিত তরণীর উপর সজ্জিতা রমণীদিগের প্রবেশ ও গীত

বেলা বয়ে যায়—

ছোট্ট মোদের পানসীতরী সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার—ফুল যূঁথি দিয়ে গাঁথা সে,
রেশমী পাল উড়ছে মধুর মধুর বাতাসে।
হেলছে তরী দুলছে তরী—ভেসে যাচ্চে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর;
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে ঘুমের ঘোর,
বাঁশির ধ্বনি, হাসির ধ্বনি উঠছে ছুটে ফোয়ারায়।

পশ্চিমে জ্বলছে আকাশ সাঁঝের তপনে,
পূর্বে ঐ বুনছে চন্দ্র মধুর স্বপনে,
কচ্ছে নদী কুলুধ্বনি, বইছে মৃদু মধুর বায়।

১ম নারী। সুন্দর যুবা! কে আপনি?

সোলেমান। আমি দারা সেকোর পুত্র সোলেমান।

১ম নারী। সম্রাট্ সাজাহানের পুত্র দারা সেকো! তাঁর পুত্র আপনি!

সোলেমান। হাঁ আমি তাঁর পুত্র।

১ম নারী। আর আমি কে, তা যে জিজ্ঞাসা কর্ছ না সোলেমান? আমি কাশ্মীরের প্রধানা নর্ত্তকী—রাজার প্রেয়সী গণিকা। এরা আমার সহচরী!—এসো আমাদের সঙ্গে নৌকায়।

সোলেমান। তোমার সঙ্গে? হায় হতভাগিনী নারী। কি জন্য?

১ম নারী। সোলেমান! তুমি এত শিশু নও কিছু! তুমি আমাদের ব্যবসাবৃত্তি ত জানো।

সোলেমান। জানি। জানি বলেই ত আমার এত অনুকম্পা। এ রূপ, এ যৌবন কি ব্যবসার সামগ্রী? রূপ—শরীর, ভালোবাসা তার প্রাণ। প্রাণহীন শরীর নিয়ে কি কর্ব্ব নারী?

১ম নারী। কেন আমরা কি ভালোবাসতে জানি না?

সোলেমান। শিখবে কোথা থেকে বল দেখি! যারা রূপকে পণ্য করেছে, যারা হাসিটি পর্যন্ত বিক্রয় করে,—তা'রা ভালোবাসবে কেমন করে'? ভালোবাসা যে কেবল দিতে চায়—সে যে ত্যাগীর সুখ—সে সুখ তোমরা কি করে' বুঝবে মা!

১ম নারী। তবে আমরা কি কখন ভালোবাসি না?

সোলেমান। বাসো—তোমরা ভালোবাসো কিংখাবের পাগড়ি,

হীরার আংটি, কার্পেটের জুতো, হাতির দাঁতের ছড়ি। তোমরা হদ্দমদ্দ ভালোবাসতে পারো—কোঁকড়া চুল, পটলচেরা চোখ, সরল নাসা, সরস অধর। আমার এই গৌরবর্ণ চেহারাখানি দেখেছো, কিংবা আমি সম্রাটের পৌত্র শুনেছো, বুঝি তাই মুগ্ধ হয়েছো। এ ত ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা হয় আত্মায় আত্মায়।—যাও মা!

২য় নারী। ঐ রাজা আসছেন।

১ম নারী। আজ এ হেন অসময়ে?—চল।—যুবক! এর প্রতিফল পাবে।

সোলেমান। কেন ক্রুদ্ধ হও মা? তোমাদের প্রতি আমার কোন ঘৃণা বিদ্বেষ নেই! কেবল একটা অনুকম্পা—অসীম—অতলস্পর্শ।

গাইতে গাইতে নারীগণের প্রস্থান

সোলেমান। কি আশ্চর্য—ঐ অপার্থিব রূপ, নয়নের ঐ জ্যোতি, অপ্সরাসম্ভব গঠন, ঐ কিন্নর কণ্ঠ—এত সুন্দর—কিন্তু এত কুৎসিত!

পরিক্রমণ

শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহের প্রবেশ

রাজা। ছিঃ কুমার!

সোলেমান। কি মহারাজ?

রাজা। আমি তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর যথাসম্ভব সুখেও রেখেছিলাম। তোমার জন্য ঔরংজীবের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি।

সোলেমান। আমি ত কখনও অস্বীকার করি নাই মহারাজ।

রাজা। এখনও শায়েস্তা খাঁ তোমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে সম্রাটের পক্ষ হ'য়ে অনেক অনুনয় কর্ছিলেন, প্রলোভন দেখাচ্ছিলেন। আমি তবু স্বীকৃত হই নি!

সোলেমান। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

রাজা। কিন্তু তুমি এত অনুদার, লঘুচিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল তা জান্তাম না।

সোলেমান। সে কি মহারাজ!

রাজা। আমি তোমাকে আমার বহিরুদ্যান বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু তুমি যে তা ছেড়ে আমার প্রমোদ-উদ্যানে প্রবেশ করে' আমার রক্ষিতাদের সঙ্গে হাস্যালাপ কর্ব্বে, তা কখন ভাবি নাই।

সোলেমান। মহারাজ আপনি ভুল বুঝেছেন—

রাজা। তুমি সুন্দর, যুবা রাজপুত্র; কিন্তু তাই বলে'—

সোলেমান। মহারাজ! মহারাজ—আমি—

রাজা। যাও, যুবরাজ! কোন দোষক্ষালনের চেষ্টা নিষ্ফল।

উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে ঔরংজীবের শিবির। কাল—রাত্রি

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। কি অসমসাহসিক এই মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! খিজুয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ রাত্রে আমার মহিলাশিবির পর্যন্ত লুণ্ঠন করে' একটা জলোচ্ছ্বাসের মত আমার সৈন্যের উপর দিয়ে চলে গেল!—অদ্ভুত! যা হোক, সুজার সঙ্গে এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছি!—কিন্তু ওদিকে আবার মেঘ করে' আসছে। আর একটা ঝড় উঠবে। সাহা নাবাজ আর দারা—সঙ্গে যশোবন্ত সিংহ। ভয়ের কারণ আছে। যদি—না তা কর্ব না। এই জয়সিংহকে দিয়েই কর্তে হবে।—এই যে মহারাজ!

মহারাজ জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। জাঁহাপনা আমাকে স্মরণ করেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ, আমি এতক্ষণ ধরে' আপনার প্রতীক্ষা কর্ছিলাম। আসুন—উঃ বিষম গরম পড়েছে।

জয়সিংহ। বিষম গরম! কি রকম একটা ভাপ্ উঠ্ছে যেন!

ঔরংজীব। আমার সর্বাঙ্গে আগুনের ফুল্কি উড়ে যাচ্ছে! আপনার শরীর ভালো আছে?

জয়সিংহ। জাঁহাপনার মেহেরবানে—বান্দা ভালো আছে।

ঔরংজীব। দেখুন মহারাজ! আমি কাল প্রত্যূষে দিল্লী ফিরে যাচ্ছি, আপনিও আমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন কি?

জয়সিংহ। যেরূপ আজ্ঞা হয়—

ঔরংজীব। আমার ইচ্ছা যে আপনি আমার সঙ্গে যান।

জয়সিংহ। যে আজ্ঞে, আমি অষ্টপ্রহরই প্রস্তুত। জাঁহাপনার আজ্ঞা পালন করাই আনন্দ।

ঔরংজীব। তা জানি মহারাজ! আপনার মত বন্ধু সংসারে বিরল। আর আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত।

জয়সিংহ সেলাম করিলেন

ঔরংজীব। মহারাজ! অতি দুঃখের বিষয়, যে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ আমার ভাণ্ডার শিবির লুট করে'ই ক্ষান্ত নহেন। তিনি বিদ্রোহী সাহা নাবাজ আর দারার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

জয়সিংহ। তাঁর বিমূঢ়তা।

ঔরংজীব। আমি নিজের জন্য দুঃখিত নহি। মহারাজই নিজের সর্বনাশকে নিজের ঘরে টেনে আন্‌ছেন।

জয়সিংহ। অতি দুঃখের বিষয়!

ঔরংজীব। বিশেষ, আপনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনার খাতিরে তাঁর অনেক উদ্ধত ব্যবহার মার্জনা করেছি। এমন কি তাঁর শিবির লুণ্ঠনব্যাপারও মার্জনা কর্তে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে—যদি তিনি এখনও নিরস্ত হ'ন।

জয়সিংহ। আমি কি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলবো?

ঔরংজীব। বল্লে ভালো হয়। আমি আপনার জন্য চিন্তিত। তিনি আপনার বন্ধু বলে' আমি তাঁকে আমার বন্ধু কর্তে চাই! তাঁকে শাস্তি দিতে আমার বড় কষ্ট হবে।

জয়সিংহ। আচ্ছা, আমি একবার বুঝিয়ে বল্‌ছি!

ঔরংজীব। হাঁ বল্‌বেন। আর এ কথাও জানাবেন যে, তিনি এ যুদ্ধে যদি কোন পক্ষই না নেন ত আপনার খাতিরে তাঁর সব অপরাধ

মার্জনা কর্ব, আর তাঁকে গুর্জর স্থবা দান কর্তে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে জান্‌বেন।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা উদার!—আমি তাঁকে নিশ্চিত রাজি কর্তে পার্বো।

ঔরংজীব। দেখুন—তিনি আপনার বন্ধু। আপনার উচিত তাঁকে রক্ষা করা।

জয়সিংহ। নিশ্চয়ই।

ঔরংজীব। তবে আপনি এখন আস্থন মহারাজ! দিল্লী যাত্রা কর্বার জন্য প্রস্তুত হৌন!

জয়সিংহ। যে আজ্ঞা। প্রস্থান

ঔরংজীব। "শুধু আপনার খাতিরে।" অভিনয় মন্দ করি নাই! এই রাজপুত জাতি বড় সরল, আর ঔদার্যের বশ! আমি সে বিদ্যাটাও অভ্যাস কর্ছি। বড় ভয়ঙ্কর এ যোগ! সাহা নাবাজ আর যশোবন্ত সিংহ!—আমি কিন্তু প্রধান আশঙ্কা কর্ছি এই মহম্মদকে। তার চেহারা —(ঘাড় নাড়িলেন) কম কথা কয়। আমার প্রতি একটা অবিশ্বাসের বীজ তার মনে কে বপন করে' দিয়েছে। জাহানারা কি?—এই যে মহম্মদ!

মহম্মদের প্রবেশ

মহম্মদ। পিতা আমায় ডেকেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ, আমি কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি, তুমি স্থজার অনুসরণ কর্বে। মীরজুমলাকে তোমার সাহায্যে রেখে গেলাম।

মহম্মদ। যে আজ্ঞে পিতা!

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও। দাঁড়িয়ে রৈলে যে? সে বিষয়ে কিছু বলবার আছে?

মহম্মদ। না পিতা। আপনার আজ্ঞাই যথেষ্ট।

ঔরংজীব। তবে ?

মহম্মদ। আমার একটা আর্জি আছে পিতা!

ঔরংজীব। কী!—চুপ করে' রৈলে যে। বল পুত্র!

মহম্মদ। কথাটা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা কর্ব মনে কর্ছি; কিন্তু এ সংশয় আর বক্ষে চেপে রাখ্তে পারি না। ঔদ্ধত্য মার্জনা কর্বেন।

ঔরংজীব। বল।

মহম্মদ। পিতা! সম্রাট সাজাহান কি বন্দী ?

ঔরংজীব। না! কে বলেছে ?

মহম্মদ। তবে তাঁকে প্রাসাদে রুদ্ধ করে' রাখা হয়েছে কেন ?

ঔরংজীব। সেরূপ প্রয়োজন হয়েছে।

মহম্মদ। আর ছোট কাকা—তাঁকে এরূপে বন্দী করে' রাখা কি প্রয়োজন ?

ঔরংজীব। হাঁ।

মহম্মদ। আর আপনার এই সিংহাসনে বসা—পিতামহ বর্তমানে ?

ঔরংজীব। হাঁ পুত্র!

মহম্মদ। পিতা! (বলিয়া মুখ নত করিলেন)

ঔরংজীব। পুত্র! রাজনীতি বড় কুট। এ বয়সে তা বুঝতে পার্বে না। সে চেষ্টা করো না।

মহম্মদ। পিতা! ছলে সরল ভ্রাতাকে বন্দী করা, স্নেহময় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা, আর ধর্মের নামে এসে সেই সিংহাসনে বসা—এর নাম যদি রাজনীতি হয়, তা হ'লে সে রাজনীতি আমার জন্য নয়।

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার কি কিছু অসুখ করেছে? নিশ্চয়!

মহম্মদ। (কম্পিতস্বরে) না পিতা! আপাততঃ আমার চেয়ে সুস্থকায় ব্যক্তি বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কেহই নাই।

ঔরংজীব। তবে!

মহম্মদ নীরব রহিলেন

আমার প্রতি তোমার অটল বিশ্বাস কে বিচলিত করেছে পুত্র?

মহম্মদ। আপনি স্বয়ং!—পিতা! যতদিন সম্ভব আপনাকে আমি বিশ্বাস করে' এসেছি, কিন্তু আর সম্ভব নয়। অবিশ্বাসের বিষে জর্জ্জরিত হয়েছি।

ঔরংজীব। এই তোমার পিতৃভক্তি!—তা হবে। প্রদীপের নীচেই সর্বাপেক্ষা অন্ধকার!

মহম্মদ। পিতৃভক্তি!—পিতা! পিতৃভক্তি কি আজ আমায় আপনার কাছে শিখ্‌তে হবে! পিতৃভক্তি!—আপনি আপনার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে, তাঁর যে সিংহাসন কেড়ে নিয়েছেন, আমি পিতৃ-ভক্তির খাতিরে সেই সিংহাসন পায়ে ঠেলে দিয়েছি। পিতৃভক্তি! আমি যদি পিতৃভক্ত না হতাম, ত দিল্লীর সিংহাসনে আজ ঔরংজীব বসতেন না, বসতো এই মহম্মদ!

ঔরংজীব। তা জানি পুত্র! তাই আশ্চর্য হচ্ছি।—পিতৃভক্তি হারিও না বৎস!

মহম্মদ। না আর সম্ভব নয় পিতা! পিতৃভক্তি বড় মহৎ, বড় পবিত্র জিনিস, কিন্তু পিতৃভক্তির উপরেও এমন একটা কিছু আছে, যার কাছে পিতা মাতা ভ্রাতা, সব খর্ব হ'য়ে যায়।

ঔরংজীব। তোমার পিতৃভক্তি হারিও না বলছি পুত্র! জেনো ভবিষ্যতে এই রাজ্য তোমার!

মহম্মদ। আমায় রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন পিতা? বলি নাই যে,

কর্তব্যের জন্য ভারত সাম্রাজ্যটা আমি লোস্ট্রখণ্ডের মত দূরে নিক্ষেপ করেছি? পিতামহ সেইদিন এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছিলেন, আপনি আজ আবার এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন? হায়! পৃথিবীতে সাম্রাজ্য কি এতই মহার্ঘ? আর বিবেক কি এতই সুলভ? সাম্রাজ্যের জন্য বিবেক খোয়াবো? পিতা। আপনি বিবেক বর্জ্জন করে' সাম্রাজ্য লাভ করেছেন, সে সাম্রাজ্য কি পরকালে নিয়ে যেতে পার্বেন? কিন্তু এই বিবেকটুকু বর্জ্জন না কর্লে সঙ্গে যেত।

ঔরংজীব। মহম্মদ!

মহম্মদ। পিতা!

ঔরংজীব। এর অর্থ কি?

মহম্মদ। এর অর্থ এই যে, আমি যে আপনার জন্য সব হারিয়ে বসে আছি, সেই আপনাকেও আজ আর হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না—বুঝি তাও হারালাম। আজ আমার মত দরিদ্র কে! আর আপনি—আপনি এই ভারতসাম্রাজ্য পেয়েছেন বটে! কিন্তু তার চেয়ে বড় সাম্রাজ্য আজ হারালেন।

ঔরংজীব। সে সাম্রাজ্য কি?

মহম্মদ। আমার পিতৃভক্তি! সে যে কি রত্ন, সে যে কি সম্পদ—কি যে হারালেন—আজ আর বুঝতে পাচ্ছে'ন না। একদিন পার্বেন বোধ হয়।

প্রস্থান

ঔরংজীব ধীরে ধীরে অপর দিকে প্রস্থান করিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—যোধপুর প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন

যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহ

জয়সিংহ। কিন্তু এই রক্তপাতে লাভ?

যশোবন্ত। লাভ? লাভ কিছুই নাই।

জয়সিংহ। তবে কেন বৃথা রক্তপাত! যখন ঔরংজীবের এ যুদ্ধে জয় হবেই!

যশোবন্ত। কে জানে!

জয়সিংহ। ঔরংজীবকে কখন কোন যুদ্ধে পরাজিত হ'তে দেখেছেন কি?

যশোবন্ত। না, ঔরংজীব বীর বটে! সেদিন আমি তাকে নর্মদা যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারূঢ় দেখেছিলাম মনে আছে—সে দৃশ্য আমি জীবনে কখন ভুলবো না—মৌন তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ভ্রূকুটিকুটিল—তার চারিদিক দিয়ে যে গোলাগুলি ছুটে যাচ্ছে, তার দিকে দৃকপাত নাই। আমি তখন বিদ্বেষে ফেটে মরে' যাচ্ছি কিন্তু অন্তরে তাকে সাধুবাদ না দিয়ে থাকতে পাল্‌'ম না।—ঔরংজীব বীর বটে!

জয়সিংহ। তবে?

যশোবন্ত। তবে আমি খিজুয়ার অপমানের প্রতিশোধ চাই।

জয়সিংহ। সে প্রতিশোধ ত আপনি তাঁর শিবির লুট করে' নিয়েছেন।

যশোবন্ত। না সম্পূর্ণ হয় নি! কারণ, ঔরংজীবের সেই শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ কর্তে কতক্ষণ! যদি লুট করে' চলে না এসে সুজার সঙ্গে যোগ দিতাম তা হ'লে খিজুয়া-যুদ্ধে সুজার পরাজয় হত না। কিংবা যদি আগ্রায় এসে সম্রাট সাজাহানকে মুক্ত করে দিতাম!—কি ভ্রমই হয়ে গিয়েছিল!

জয়সিংহ। কিন্তু তা'তে আপনার কি লাভ হোত? সম্রাট্ দারা হৌন, সুজা হৌন বা ঔরংজীব হৌন—আপনার কি?

যশোবন্ত। প্রতিশোধ!—আমি তাদের সব বিষচক্ষে দেখি; কিন্তু সব চেয়ে বিষচক্ষে দেখি—এই খল ঔরংজীবকে।

জয়সিংহ। তবে আপনি খিজুয়া-যুদ্ধে তাঁ'র সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কেন?

যশোবন্ত। সেদিন দিল্লীর রাজসভায় তা'র সমস্ত কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। হঠাৎ এমন মহত্ত্বের ভাণ কর্লে, এমন ত্যাগের অভিনয় কর্লে, এমন আন্তরিক দৈন্য আবৃত্তি কর্লে যে আমি চমৎকৃত হ'য়ে গেলাম! ভাবলাম—'এ কি! আমার আজন্ম ধারণা, আমার প্রকৃতিগত বিশ্বাস কি সব ভুল! এমন ত্যাগী, মহৎ, উদার, ধার্মিক মানুষকে আমি পাপী কল্পনা করেছিলাম!' এমন ভোজবাজী খেলে—যে সর্বপ্রথম আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম, "জয় ঔরংজীবের জয়।" তার সেদিনকার জয় নর্মদা কি খিজুয়া-যুদ্ধ জয়ের চেয়েও অদ্ভুত, কিন্তু সেদিন খিজুয়া-যুদ্ধক্ষেত্রে আবার আসল মানুষটা দেখলাম—সেই কূট, খল চক্রী ঔরংজীব।

জয়সিংহ। মহারাজ! খিজুয়া-ক্ষেত্রে আপনার প্রতি রূঢ় আচরণের জন্য সম্রাট্ পরে যথার্থ ই অনুতপ্ত হয়েছিলেন!

যশোবন্ত। এই কথা আমায় বিশ্বাস কর্তে বলেন মহারাজ!

জয়সিংহ। কিন্তু সে কথা যাক্; সম্রাট্ তা'র জন্য আপনার কাছে ক্ষমাও চান না, ভিক্ষাও চান না! তিনি বিবেচনা করেন যে, আপনার আচরণে সে অন্যায়ের শোধ হয়ে গিয়েছে। তিনি আপনার সাহায্য চান না। তিনি চান যে, আপনি দারার পক্ষও নেবেন না, ঔরংজীবের পক্ষও নেবেন না। বিনিময়ে তিনি আপনাকে গুর্জর রাজ্য

দিবেন—এইমাত্র। আপনি একটা কল্পিত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের শক্তি ক্ষয় করে' ক্রয় কর্বেন—ঔরংজীবের বিদ্বেষ। আর হাত গুটিয়ে বসে' দেখার বিনিময়ে পাবেন, একটা প্রকাণ্ড উর্বর সুবা—গুর্জর। বেছে নেন। আপনার সর্বস্ব দিয়ে যদি প্রতিহিংসা নিতে চান—নেন। এ সহজ ব্যবসার কথা, শুদ্ধ কেনা বেচা—দেখুন!

যশোবন্ত। কিন্তু দারা—

জয়সিংহ। দারা আপনার কে? সে'ও মুসলমান, ঔরংজীবও মুসলমান। আপনি যদি নিজের দেশের জন্য যুদ্ধে যেতেন ত আমি কথাটি কইতাম না! কিন্তু দারা আপনার কে? আপনি কার জন্য রাজপুত রক্তপাত কর্তে যাচ্ছেন? দারাই যদি জয়ী হয়—তাতে আপনারই বা কি লাভ, আপনার জন্মভূমিরই বা কি লাভ!

যশোবন্ত। তবে আসুন, আমরা দেশের জন্য যুদ্ধ করি! মেবারের রাণা রাজসিংহ, বিকানীরের মহারাজ আপনি, আর আমি যদি মিলিত হই ত এই তিন জনেই মোগল সাম্রাজ্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি—আসুন।

জয়সিংহ। তারপরে সম্রাট হবেন কে?

যশোবন্ত। কে! রাণা রাজসিংহ।

জয়সিংহ। আমি ঔরংজীবের প্রভুত্ব মানতে পারি, কিন্তু রাজসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার কর্তে পারি না।

যশোবন্ত। কেন মহারাজ? তিনি স্বজাতি বলে?

জয়সিংহ। তা বৈকি। জাতির দুর্বাক্য সইব না! আমি কোন উচ্চ প্রবৃত্তির ভান করি না! সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশি পাবো, সেইখানেই যাবো। ঔরংজীব কম দামে বেশি দিচ্ছে! এই ধ্রুব সম্পৎ ত্যাগ করে' অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাই না।

যশোবন্ত। হুঁ!—আচ্ছা মহারাজ আপনি বিশ্রাম করুন গে। আমি ভেবে কাল উত্তর দিব।

জয়সিংহ। সে উত্তম কথা। ভেবে দেখ্‌বেন—এ শুদ্ধ সাংসারিক কেনা বেচা! আজ আমরা স্বাধীন রাজা না হতে পারি, রাজভক্ত প্রজা ত হ'তে পারি। রাজভক্তিও ধর্ম। প্রস্থান

যশোবন্ত। হিন্দুর সাম্রাজ্য কবির স্বপ্ন। হিন্দুর প্রাণ বড়ই শুষ্ক, বড়ই হিম হ'য়ে গিয়েছে। আর পরস্পর জোড়া লাগে না! "স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত প্রজা ত হ'তে পারি।" ঠিক বলেছো জয়সিংহ! কার জন্য যুদ্ধ কর্তে যাবো? দারা আমার কে?—নর্মদার প্রতিশোধ খিজুয়ায় নিয়েছি।

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। একে প্রতিশোধ বল মহারাজ! আমি এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়িয়ে তোমার এই অপৌরুষ—সমভার নিক্তির আধারের মত এই আন্দোলন দেখছি!—খাসা! চমৎকার! বেশ বুঝে গেলে যে প্রতিশোধ নিয়েছো। একে প্রতিশোধ বল মহারাজ? ঔরংজীবের পক্ষ হ'য়ে তা'র শিবির লুঠ করে' পালানোর নাম প্রতিশোধ? এর চেয়ে যে পরাজয় ছিল ভালো এ যে পরাজয়ের উপর পাপের ভার। রাজপুত জাতি যে বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে তা তুমিই এই প্রথম দেখালে!

যশোবন্ত। লুঠ করবার আগে আমি ঔরংজীবের পক্ষ পরিত্যাগ করেছি মহামায়া।

মহামায়া। আর তা'র পশ্চাতে তা'র সম্পত্তি লুঠ করেছো।

যশোবন্ত। যুদ্ধ করে' লুঠ করেছি, অপহরণ করি নাই।

মহামায়া। একে যুদ্ধ বল?—ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার এই ছাড়া কি আর কথা নাই?

দিবারাত্র তোমার তিক্ত ভৎর্সনা শুনবার জন্যই কি তোমায় বিবাহ করেছিলাম ?

মহামায়া। নহিলে বিবাহ করেছিলে কেন মহারাজ ?

যশোবন্ত। কেন ! আশ্চর্য প্রশ্ন !—লোকে বিবাহ করে আবার কেন ?

মহামায়া। হাঁ, কেন ? সম্ভোগের জন্য ? বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য ? তাই কি ?—তাই কি ?

যশোবন্ত। (ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া) হাঁ—এক রকম তাই বলতে হবে বৈকি।

মহামায়া। তবে একজন গণিকা রাখো না কেন ?

যশোবন্ত। ঝড় উঠছে বুঝি !

মহামায়া। মহারাজ ! যদি তোমার পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর্তে চাও, যদি কামের সেবা করতে চাও ত তার স্থান কুলাঙ্গনার পবিত্র অন্তঃপুর নয়—তার স্থান বারাঙ্গনার সজ্জিত নরক ! সেইখানে যাও। তুমি রৌপ্য দিবে, সে রূপ দিবে। তুমি তার কাছে যাবে লালসার তাড়নায় আর সে তোমার কাছে আসবে জঠরের জ্বালায়। স্বামী-স্ত্রীর সে সম্বন্ধ নয়।

যশোবন্ত। তবে ?

মহামায়া। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ভালোবাসার সম্বন্ধ। সে যেমন তেমন ভালোবাসা নয়। সে ভালোবাসা প্রিয়জনকে দিন দিন হেয় করে না, দিন দিন প্রিয়তম করে, সে ভালোবাসা নিজের চিন্তা ভুলে যায়, আর তা'র দেবতার চরণে আপনাকে বলি দেয়, সে ভালোবাসা প্রভাত সূর্যরশ্মির মত যার উপরে পড়ে তাকেই স্বর্ণ-বর্ণ করে' দেয়, ভাগীরথীর বারিরাশির মত যার উপরে পড়ে তাকেই পবিত্র করে' দেয়, দেবতার বরের মত যার উপরে পড়ে তাকেই ভাগ্যবান করে—এ সেই ভালোবাসা ; অচঞ্চল অনুদ্বিগ্ন আনন্দময়—কারণ, উৎসর্গময়।

যশোবন্ত। তুমি আমাকে কি রকম ভালোবাসো মহামায়া ?

মহামায়া। বাসি! তোমার গৌরব কোলে করে' আমি মর্ত্তে পারি—তা'র জন্য আমার এত চিন্তা, এত আগ্রহ যে, সে গৌরব ম্লান হ'য়ে গেছে দেখবার আগে আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি অন্ধ হ'য়ে যাই! রাজপুত-জাতির গৌরব—মাড়বারের গৌরব তোমার হাতে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে দেখবার আগে আমি মর্ত্তে চাই! আমি তোমায় এত ভালোবাসি!

যশোবন্ত। মহামায়া!

মহামায়া। চেয়ে দেখ—ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরিশ্রেণী—দূরে ঐ ধূসর বালু-স্তূপ। চেয়ে দেখ—ঐ পর্বতস্রোতস্বতী—যেন সৌন্দর্যে কাঁপছে। চেয়ে দেখ—ঐ নীল আকাশ যেন সে নীলিমা নিংড়ে বার কর্ছে! ঐ ঘুঘুর ডাক শোন; আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবো যে এই স্থানে একদিন দেবতারা বাস কর্তেন। মাড়বার আর মেবার বীরত্বের যমজপুত্র; মহত্বের নৈশাকাশে বৃহস্পতি ও শুক্র তারা। ধীরে ধীরে সে মহিমার সমারোহ আমার সম্মুখ দিয়ে চলে' যাচ্ছে। এসো চারণবালকগণ! গাও সেই গান।

যশোবন্ত। মহামায়া!

মহামায়া। কথা কয়ো না। ঐ ইচ্ছা যখন আমার মনে আসে আমার মনে হয় যে তখন আমার পূজার সময়! শঙ্খ ঘণ্টা বাজাও; কথা কয়ো না।

যশোবন্ত। নিশ্চয় মস্তিষ্কের কোন রোগ আছে।

ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন

মহামায়া। কে তুমি সুন্দর, সৌম্য, শান্ত, আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে! (চারণবালকগণের প্রবেশ) গাও বালকগণ! সেই গান গাও—আমার জন্মভূমি।

বালকদিগের প্রবেশ ও গীত—

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি ।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িত এমন কালো মেঘে !
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে—
এমন দেশটি—ইত্যাদি—
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় ।
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে ।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !
এমন দেশটি—ইত্যাদি—
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে !
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ?
—ওমা তোমার চরণ দু'টি বক্ষে আমার ধরি'
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি—ইত্যাদি—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—টাণ্ডায় সুজার প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা

পিয়ারা গাহিতেছিলেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ!
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।

সুজার প্রবেশ

সুজা। শুনেছ পিয়ারা, যে দারা ঔরংজীবের কাছে শেষ যুদ্ধেও পরাজিত হয়েছেন?

পিয়ারা। হয়েছেন নাকি!

সুজা। ঔরংজীবের শ্বশুর তরোয়াল হাতে দারার পক্ষে ল'ড়ে মারা গিয়েছে—খুব জমকালো রকম না?

পিয়ারা। বিশেষ এমন কি!

সুজা। নয়? বৃদ্ধ যোদ্ধা নিজের জামাই-এর বিপক্ষে লড়ে' মারা গেল—শুদ্ধ ধর্মের খাতিরে। সোভানাল্লা!

পিয়ারা। এতে আমি 'কেয়াবৎ' পর্যন্ত বলতে রাজি আছি। তা'র উপরে উঠ্‌তে রাজি নই!

সুজা। যশোবন্ত সিংহ যদি এবার দারার সঙ্গে সসৈন্যে যোগ দিত—তা দিলে না। দারাকে সাহায্য ক'র্তে স্বীকৃত হ'য়ে শেষে কিনা পিছু হটলে।

পিয়ারা। আশ্চর্য ত!

সুজা। এতে আশ্চর্য হচ্ছ কি পিয়ারা? এতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই।

পিয়ারা। নেই নাকি? আমি ভাবলাম বুঝি আছে; তাই আশ্চর্য হচ্ছিলাম।

সুজা। মহারাজ যেমন এই খিজুয়া-যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এবার দারাকে ঠিক সেই রকম প্রতারণা করেছে। এর মধ্যে আবার আশ্চর্য কি?

পিয়ারা। তা আর কি—আমি আশ্চর্য হচ্ছি—

সুজা। আবার আশ্চর্য!

পিয়ারা। না না! তা নয়। আগে শেষ পর্যন্ত শোনই।

সুজা। কি?

পিয়ারা। আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি—যে আগে আশ্চর্য হচ্ছিলাম কি ভেবে?

সুজা। আশ্চর্য যদি বল তবে আশ্চর্য হবার ব্যাপার একটা হয়েছে।

পিয়ারা। সেটা হচ্ছে কি?

সুজা। সেটা হচ্ছে এই যে, ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদ, আমার মেয়ের জন্য তা'র বাপের পক্ষ ছেড়ে আমার পক্ষে যোগ দিল কি ভেবে।

পিয়ারা। তা'র মধ্যে আশ্চর্য কি! প্রেমের জন্য লোকে এর চেয়ে অনেক বেশি শক্ত কাজ করেছে। প্রেমের জন্য লোক পাঁচিল টপকেছে, ছাদ থেকে লাফিয়েছে, সাঁতারে নদী পার হয়েছে, আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে, বিষ খেয়ে মরেছে! এটা ত একটা তুচ্ছ ব্যাপার! বাপকে ছেড়েছে। ভারি কাজ করেছে। ও ত সবাই করে! আমি এতে আশ্চর্য হ'তে রাজি নই।

সুজা। কিন্তু—না—এ বেশ একটু আশ্চর্য! সে যাহোক। কিন্তু মহম্মদ আর আমি মিলে এবারে ঔরংজীবের সৈন্যকে বঙ্গদেশ থেকে তাড়িয়েছি।

পিয়ারা। তোমার কি যুদ্ধ ভিন্ন কথা নাই? আমি যত তোমায় ভুলিয়ে রাখতে চাই, তুমি ততই শিষ্‌পা তোলো। রাশ মানতে চাও না।

সুজা। যুদ্ধে একটা বিরাট আনন্দ আছে। তার উপরে—

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। এক ফকির দেখা কর্ত্তে চায় জাঁহাপনা।

পিয়ারা। কি রকম ফকির—লম্বা দাড়ি?

বাঁদী। হাঁ মা! সে বলে যে বড় দরকার, এক্ষণই!

সুজা। আচ্ছা এখানেই নিয়ে এসো।—পিয়ারা তুমি ভেতরে যাও।

পিয়ারা। বেশ, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ! বেশ! আমি যাচ্ছি।

প্রস্থান

সুজা। যাও এখানে তাকে পাঠিয়ে দাও। বাঁদীর প্রস্থান

সুজা। পিয়ারা এক হাস্যের ফোয়ারা—একটা অর্থশূন্য বাক্যের নদী। এই রকম করে' সে আমাকে যুদ্ধের চিন্তা থেকে ভুলিয়ে রাখে।

দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। বন্দেগি সাহাজাদা! সাহাজাদার একখানি চিঠি!

পত্র প্রদান

সুজা। (পত্র লইয়া খুলিয়া পাঠ) এ কি! তুমি কোথা থেকে এসেছো?

দিলদার। পত্রে দস্তখত নেই কি সাহাজাদা!—চেহারা দেখলেই সাহাজাদার বুদ্ধি টের পাওয়া যায়! খুব চাল চেলেছেন।

সুজা। কি চাল?

দিলদার। সাহাজাদা যে সুজার মেয়ে বিয়ে করে'—উঃ—খুব ফিকির করেছেন। সম্মুখ থেকে তীর মারার চেয়ে পিছন দিক্ থেকে—উঃ! বাপ্ কা বেটা কি না।

সুজা। পিছন থেকে তীর মাচ্ছে' কে?

দিলদার। ভয় কি—আমি কি এ কথা সুজা সুলতানকে বল্‌তে যাচ্ছি? চিঠিটা যেন তাঁকে ভুলে দেখিয়ে ফেল্‌বেন না সাহাজাদা!

সুজা। আরে ছাই আমিই যে সুলতান সুজা; মহম্মদ ত আমার জামাই।

দিলদার। বটে! চেহারা ত বেশ যুবা পুরুষের মত রেখেছেন! শুনুন—বেশি চালাকী কর্বেন না। আপনি যদি মহম্মদ হন যা' বল্‌ছি ঠিক বুঝতে পারছেন। আর—যদি সুলতান সুজা হন, ত' যা' বলছি তা'র এক বর্ণও সত্য নয়!

সুজা। আচ্ছা, তুমি এখন যাও! এর বিহিত আমি এখনই কর্চ্ছি—তুমি বিশ্রাম করগে যাও।

দিলদার। যে আজ্ঞে।

সুজা। এ ত মহাসমস্যায় পড়্‌লাম! বাহিরের শত্রুর জ্বালায়ই অস্থির। তার উপর ঔরংজীব আবার ঘরে শত্রু লাগিয়েছে, কিন্তু যাবে কোথায়! হাতে হাতে ব্যবস্থা কচ্ছি। ভাগ্যিস এই পত্র আমার হাতে পড়েছিল—এই যে মহম্মদ!

মহম্মদের প্রবেশ

সুজা। মহম্মদ! পড় এই পত্র।

মহম্মদ। (পড়িয়া) এ কি! এ কার পত্র?

সুজা। তোমার পিতার! স্বাক্ষর দেখছো না? তুমি ঈশ্বরকে

সাক্ষী করে' তাঁকে পত্র লিখেছিলে যে, তুমি যে তোমার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করছো, সে অন্যায় তোমার শ্বশুরের অর্থাৎ আমার প্রতি শাঠ্য দিয়ে পরিশোধ কর্বে।

মহম্মদ। আমি তাঁকে কোন পত্রই লিখি নি। এ কপট পত্র।

সুজা। বিশ্বাস কর্তে পার্লাম না! তুমি আজই এই দণ্ডে আমার বাড়ি পরিত্যাগ কর।

মহম্মদ। সে কি কোথায় যাবো?

সুজা। তোমার পিতার কাছে।

মহম্মদ। কিন্তু আমি শপথ কর্ছি—

সুজা। না, ঢের হয়েছে—আমি সম্মুখ যুদ্ধে পারি কি হারি—সে স্বতন্ত্র কথা। ঘরে শত্রু পুষতে পারি না!

মহম্মদ। আমি—

সুজা। কোন কথা শুন্তে চাই না। যাও, এখনি যাও।

মহম্মদের প্রস্থান

সুজা। হাতে হাতে ব্যবস্থা করেছি। ভারি বুদ্ধি করেছিলে দাদা; কিন্তু যাবে কোথায়! তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আর আমি বেড়াই পাতায় পাতায়!—এই যে পিয়ারা!

পিয়ারার প্রবেশ

সুজা। পিয়ারা! ধরে' ফেলেছি।

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে। বেটা মতলব ফেঁদে এসেছিল। তোমাকে এখনি বল্ছিলাম না যে, এ বেশ একটু খটকা! এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে। জলের মত সাফ হ'য়ে গিয়েছে। তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে।

পিয়ারা। সে কি!

সুজা। বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু—ধন্য ভায়া—বুদ্ধি করেছিলে বটে! কিন্তু পার্লে না। ভারি ধরেছি!—এই দেখ পত্র!

পিয়ারা। (পত্র পড়িয়া) তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। হাকিম দেখাও।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। এ ছল—কপট পত্র বুঝতে পার্ছ না? ঔরংজীবের ছল! এইটে বুঝতে পার্ছ না?

সুজা। না, সেটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি নে।

পিয়ারা। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গিয়েছো—ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে! হেলে ধর্তে পার না, কেউটে ধর্তে যাও। তা, আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও কর্লে না; জামাইকে দিলে তাড়িয়ে! চল, এখন মেয়ে জামাইকে বোঝাইগে।

সুজা। পত্র কপট? তাই নাকি? কৈ তা ত তুমি বল্লে না—তা সাবধান হওয়া ভাল।

পিয়ারা। তাই জামাইকে দিলে তাড়িয়ে!

সুজা। তাই ত! তা হ'লে ভারি ভুল হ'য়ে গিয়েছে বলতে হবে। যা' হোক্ শোন এক ফিকির করেছি। মেয়েকে তার সঙ্গে দিচ্ছি আর যথারীতি যৌতুক দিচ্ছি। দিয়ে মেয়েকে তার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছি, এতে দোষ নাই। ভয় কি—চল জামাইকে তাই বুঝিয়ে বলি। তাই বলে' তাকে বিদায় দেই।

পিয়ারা। কিন্তু বিদায় দেবে কেন?

সুজা। সময় খারাপ। সাবধান হওয়া ভাল। বোঝ না—চল বোঝাইগে। উভয়ে নিক্রান্ত

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জিহন খাঁর গৃহে দরবার-কক্ষ। কাল—রাত্রি

সিপার ও জহরৎ দণ্ডায়মান

জহরৎ। সিপার!

সিপার। কি জহর!

জহরৎ। দেখ্‌ছো!

সিপার। কি?

জহরৎ। যে আমরা এই রকম বন্য জন্তুর মত বন হ'তে বনান্তরে প্রতাড়িত, হত্যাকারীর মত এক গহ্বর থেকে পালিয়ে আর এক গহ্বরে গিয়ে মাথা লুকোচ্ছি; পথের ভিখারীর মত এক গৃহস্থের দ্বারে পদাহত হ'য়ে আর এক গৃহস্থের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি!—দেখ্‌ছো?

সিপার। দেখ্‌ছি; কিন্তু উপায় কি?

জহরৎ। উপায় কি? পুরুষ তুমি—স্থির স্বরে বল্‌ছো "উপায় কি?" আমি যদি পুরুষ হতাম, ত এর উপায় কর্ত্তাম।

সিপার। কি উপায় কর্ত্তে?

জহরৎ। (ছোরা বাহির করিয়া) এই ছোরা নিয়ে গিয়ে দস্যু ঔরংজীবের বুকে বসিয়ে দিতাম।

সিপার। হত্যা!

জহরৎ। হ্যাঁ হত্যা; চম্‌কে উঠলে যে?—হত্যা। নাও এই ছোরা, দিল্লী যাও! তুমি বালক, তোমায় কেউ সন্দেহ কর্বে না—যাও!

সিপার। কখন না। হত্যা কর্ব না।

জহরৎ। ভীরু! দেখছো—মা মর্চ্ছেন! দেখছো—বাবা উন্মাদের মত হ'য়ে গিয়েছেন। বসে' বসে' দেখ্‌ছো!

সিপার। কি কর্ব!

জহরৎ। কাপুরুষ!

সিপার। আমি কাপুরুষ নই জহরৎ! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার পার্শ্বে হস্তিপৃষ্ঠে বসে' যুদ্ধ করেছি। প্রাণের ভয় করি না; কিন্তু হত্যা কর্ব না।

জহরৎ। উত্তম!

প্রস্থান

সিপার। এ নিষ্ফল ক্রোধ ভগ্নি! কোন উপায় নাই!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—নাদিরার কক্ষ। কাল—রাত্রি

খট্বাঙ্গের উপর নাদিরা শয়ানা। পার্শ্বে দারা
অন্য পার্শ্বে সিপার ও জহরৎ—

দারা। নাদিরা! সংসার আমাকে পরিত্যাগ করেছে—ঈশ্বর আমায় পরিত্যাগ করেছেন। একা তুমি আমায় এতদিন পরিত্যাগ কর নাই। তুমিও আমায় ছেড়ে চল্লে!

নাদিরা। আমার জন্য অনেক সহ্য করেছো নাথ! আর—

দারা। নাদিরা! দুঃখের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে তোমায় অনেক কুবাক্য বলেছি—

নাদিরা। নাথ! তোমার দুঃখের সঙ্গিনী হওয়াই আমার পরম গৌরব। সে গৌরবের স্মৃতি নিয়ে আমি পরলোকে চল্লাম—সিপার—বাবা! মা-জহরৎ! আমি যাচ্ছি—

সিপার। তুমি কোথায় যাচ্ছ মা?

নাদিরা। কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি না। তবে যেখানে যাচ্ছি সেখানে বোধ হয় কোন দুঃখ নাই—ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা নাই, রোগ তাপ নাই, দ্বেষ দ্বন্দ্ব নাই।

সিপার। তবে আমরাও সেখানে যাবো মা—চল বাবা! আর সহ্য হয় না।

নাদিরা। আর কষ্ট পেতে হবে না বাছা। তোমরা জিহন খাঁর আশ্রয়ে এসেছো! আর দুঃখ নাই।

সিপার। এই জিহন খাঁ কে বাবা?

দারা। আমার একজন পুরাতন বন্ধু।

নাদিরা। তাঁকে তোমার বাবা দু'বার মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি তোমাদের আদর যত্ন কর্বেন।

সিপার। কিন্তু আমি তাকে কখনও ভালোবাসবো না।

দারা। কেন সিপার?

সিপার। তা'র চেহারা ভাল নয়। এখনই সে তা'র এক চাকরকে ফিসফিস করে' কি বল্ছিল—আর আমার দিকে এ রকম চোরা চাহনি চাচ্ছিল—যে আমার বড় ভয় কর্ল মা। আমি ছুটে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম।

দারা। সিপার সত্য বলেছে নাদিরা! জিহনের মুখে একটা কুটিল হাসি দেখেছি, তা'র চক্ষে একটা হিংস্র দীপ্তি দেখেছি, তা'র নিম্নস্বরে বোধ হচ্ছিল যেন সে একখানা ছোরা শানাচ্ছে। সেদিন যখন সে আমার পদতলে পড়ে' তার প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, তখন সে চেহারা এক রকমের; আর এ আর এক রকমের চেহারা। এ চাহনি, এ স্বর, এ ভঙ্গিমা—আমার অপরিচিত।

নাদিরা। তবু ত তাকে তুমি দু'বার বাঁচিয়েছিলে। সে মানুষ ত, সর্প ত নয়।

দারা। মানুষকে আর বিশ্বাস নেই নাদিরা! দেখছি সে সর্পের চেয়েও খল হয়। তবে মাঝে মাঝে—কি নাদিরা! বড় যন্ত্রণা হচ্ছে!

নাদিরা। না, কিছু না! আমি তোমার কাছে আছি। তোমার স্নেহ দৃষ্টির অমৃতে সব যন্ত্রণা গলে যাচ্ছে; কিন্তু আমার আর সময় নেই—তোমার হাতে সিপারকে সঁপে দিয়ে গেলাম—দেখো!—পুত্র সোলেমানের সঙ্গে—আর দেখা হ'লো না—ঈশ্বর! (মৃত্যু)

দারা। নাদিরা! নাদিরা!—না। সব হিম স্তব্ধ!

সিপার। মা! মা।

দারা। দীপ নির্বাণ হয়েছে।

জহরৎ নিজের বক্ষ সবলে চাপিয়া ঊর্ধ্ব দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।
চারিজন সৈনিক সহ জিহন খাঁর প্রবেশ

দারা। কে তোমরা; এ সময় এ স্থানে এসে কলুষিত কর?

জিহন। বন্দী কর।

দারা। কি! আমায় বন্দী কর্বে জিহন খাঁ!

সিপার। (দেওয়াল হইতে তরবারি লইয়া) কার সাধ্য?

দারা। সিপার, তরবারি রাখো।—এ বড় পবিত্র মুহূর্ত; এ মহাপুণ্য তীর্থ! এখনও নাদিরার আত্মা এখানে পক্ষ গুটিয়ে আছে—পৃথিবীর সুখদুঃখ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে একবার চারিদিকে চেয়ে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। এখনও স্বর্গ থেকে দেবীরা তা'কে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে এসে পৌঁছে নি। তা'কে ত্যক্ত কোরো না—আমায় বন্দী কর্ত্তে চাও জিহন খাঁ?

জিহন। হাঁ সাহাজাদা।

দারা। ঔরংজীবের আজ্ঞায় বোধ হয়!

জিহন। হাঁ সাহাজাদা।

দারা। নাদিরা! তুমি শুন্তে পাচ্ছ না ত! তা হ'লে ঘৃণায় তোমার মৃতদেহ নড়ে উঠ্‌বে, তুমি নাকি ঈশ্বরকে বড় বিশ্বাস কর্ত্তে!

জিহন। এঁকে শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধো। যদি কোন বাধা দেন ত তরবারি ব্যবহার কর্ত্তে দ্বিধা কর্বে না।

দারা। আমি বাধা দিচ্ছি না। 'আমায় বাঁধো। আমি কিছু আশ্চর্য হচ্ছি না। আমি এইরূপই একটা কিছু প্রত্যাশা করে' আস্-

ছিলাম। অন্যে হয়ত অন্যরূপ আশা কর্ত। অন্যে হয়ত ভাব্‌তো যে এ কত বড় কৃতঘ্নতা যে, যাকে আমি দু'বার বাঁচিয়েছি, সে আমায় কপট আশ্রয় দিয়ে বন্দী করে—এ কত বড় নৃশংসতা। আমি তা ভাবি না। আমি জানি জগতে সব—সব উচ্চ প্রবৃত্তি সাপের ভয়ে মাটির মধ্যে মাথা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—উপর দিকে চোখ তুলে চাইতেও সাহস কর্চ্ছে না। আমি জানি পৃথিবীতে ধর্ম এখন স্বার্থসিদ্ধি, নীতি—শাঠ্য, পূজা—খোসামোদ, কর্ত্তব্য—জোচ্চোরি। উচ্চ প্রবৃত্তিগুলো এখন বড় পুরাতন হ'য়ে গিয়েছে। সভ্যতার আলোকে ধর্মের অন্ধকার সরে গিয়েছে! সে ধর্ম যা কিছু আছে এখন বোধ হয় কৃষকের কুটিরে, ভীল কোল মুণ্ডাদের অসভ্যতার মধ্যে—কর জিহন খাঁ, আমায় বন্দী কর!

সিপার। তবে আমায়ও বন্দী কর।

জিহন। তোমায়ও ছাড়্‌ছি না সাহাজাদা! সম্রাটের কাছে প্রচুর পুরস্কার পাব।

দারা। পাবে বৈকি! এত বড় কৃতঘ্নতার দাম পাবে না? তাও কখনও হয়? প্রচুর অর্থ পাবে। আমি কল্পনায় তোমার সেই দীপ্ত মুখখানি দেখ্‌তে পাচ্ছি। কি আনন্দ!—প্রচুর অর্থ পাবে। সঙ্গে করে' পরকালে নিয়ে যেও।

জিহন। তবে আর কি—বন্দী কর!

দারা। কর।—না এখানে না। বাইরে চল। এ স্বর্গে নরকের অভিনয় কেন? এত বড় অভিনয় এখানে! মা বসুন্ধরা! এতখানি বহন কর্চ্ছ! নীরবে সহ্য কর্চ্ছ ঈশ্বর! হাত দু'খানি গুটিয়ে বেশ এই সব দেখ্‌ছো—চল জিহন খাঁ, বাইরে চল।

সকলে যাইতে উদ্যত

দারা। দাঁড়াও, একটা অনুরোধ করে' যাই জিহন খাঁ! রাখ্‌বে কি? জিহন খাঁ, এই দেবীর মৃতদেহ লাহোরে পাঠিয়ে দিও! সেখানে সম্রাট্ পরিবারের কবরভূমিতে যেন তাকে গোর দেওয়া হয়। দেবে কি? আমি তোমাকে দু'বার বাঁচিয়েছি বলেই এ দান ভিক্ষা চাইছি। নৈলে এতটুকুও তোমার কাছে চাইতে পার্‌তাম না—দেবে কি?

জিহন। যে আজ্ঞে যুবরাজ। এ কাজ না কর্‌লে আমার প্রভু ঔরংজীব যে ক্রুদ্ধ হবেন!

দারা। তোমার প্রভু ঔরংজীব! হুঁ—আমার আর কোন ক্ষোভ নাই! চল—(ফিরিয়া) নাদিরা!

এই বলিয়া দারা ফিরিয়া আসিয়া সহসা নাদিরার শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া হস্তদ্বয়ের উপর মুখ ঢাকিলেন, পরে উঠিয়া জিহন খাঁকে কহিলেন—

চল জিহন খাঁ!

সকলে বাহিরে চলিলেন। সিপার নাদিরার মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল

দারা। (রুক্ষভাবে) সিপার!

সিপারের রোদন ভয়ে থামিয়া গেল। সকলে নীরবে বাহিরে চলিয়া গেলেন

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ। কাল—সায়াহ্ন

যশোবন্ত সিংহ ও মহামায়া দণ্ডায়মান

মহামায়া। হতভাগ্য দারার প্রতি কৃতঘ্নতার পুরস্কার স্বরূপ গুর্জর প্রদেশ পেয়ে সন্তুষ্ট আছো ত মহারাজ?

যশোবন্ত। তাতে আমার অপরাধ কি মহামায়া?

মহামায়া। না অপরাধ কি? এ তোমার মহৎ সম্মান, পরম গৌরব।

যশোবন্ত। গৌরব না হ'তে পারে, তবে তার মধ্যে অন্যায় আমি কিছু দেখি নি! দারার সঙ্গে যোগ দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা। দারা আমার কে?

মহামায়া। আর কেউ নয়—প্রভু মাত্র!

যশোবন্ত। প্রভু! এককালে ছিলেন বটে; আর কেউ নয়।

মহামায়া। সত্যই ত! দারা আজ নিয়তিচক্রের নীচে, ভাগ্যের লাঞ্ছিত, মানবের ধিক্কৃত। আর তাঁ'র সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? দারা তোমার প্রভু ছিলেন—যখন তিনি পুরস্কার দিতে পার্ত্তেন, বেত্রাঘাত কর্ত্তে পার্ত্তেন।

যশোবন্ত। আমাকে!

মহামায়া। হায় মহারাজ! 'ছিলেন' এর কি কোন মূল্য নাই? অতীতকে কি একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো? বর্ত্তমান থেকে একেবারে কি তাকে বিচ্ছিন্ন করে' দিতে পারো? একদিন যিনি তোমার দয়ালু প্রভু ছিলেন, আজ তোমার কাছে কি তাঁর কোন মূল্য নাই? ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার সঙ্গে আমার তর্ক কর্বার সম্বন্ধ নয়।

আমি যা উচিত বিবেচনা কর্ছি তাই করে' যাচ্ছি। তোমার কাছে উপদেশ চাই না।

মহামায়া। তা চাইবে কেন? যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসে, বিশ্বাসঘাতক হয়ে ফিরে এসে, কৃতঘ্ন হয়ে ফিরে এসে—তুমি চাও, আমার ভক্তি! না?

যশোবন্ত। সে কি বড় বেশি প্রত্যাশা মহামায়া!

মহামায়া। না সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ক্ষত্রিয় বীর তুমি—ক্ষত্রকুলের অবমাননা করেছো! জানো সমস্ত রাজপুতনা তোমায় ধিক্কার দিচ্ছে! বল্‌ছে যে ঔরংজীবের শ্বশুর সাহ নাবাজ দারার পক্ষ হ'য়ে তা'র জামাতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে' মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্ল, আর তুমি দারাকে আশা দিয়ে শেষে কাপুরুষের মত সরে দাঁড়ালে!—হায় স্বামী! কি বলবো, তোমার এই অপমানে আমার শিরায় অগ্নিস্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে অপমান তোমাকে স্পর্শও কর্ছে না! আশ্চর্য বটে!

যশোবন্ত। মহামায়া—

মহামায়া। আর কেন! যাও তোমার নূতন প্রভু ঔরংজীবের কাছে যাও।

সক্রোধে প্রস্থান

যশোবন্ত। উত্তম! তাই হবে। এতদূর অবজ্ঞা! বেশ তাই হবে।

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদে সাজাহানের কক্ষ। কাল—রাত্রি

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। আবার কি দুঃসংবাদ কন্যা! আর কি বাকি আছে? দারা আবার পরাজিত হয়ে বাখরের দিকে পালিয়েছে। সুজা বন্য আরাকানের রাজার গৃহে সপরিবারে ভিক্ষুক! মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী। আর কি দুঃসংবাদ দিতে পারো কন্যা?

জাহানারা। বাবা! এ আমার দুর্ভাগ্য যে আমিই আপনার নিকট রোজ দুঃসংবাদের বস্তা বহে' আনি; কিন্তু কি কর্ব বাবা! দুর্ভাগ্য একা আসে না!

সাজাহান। বল। আর কি?

জাহানারা। বাবা, ভাই দারা ধরা পড়েছে।

সাজাহান। ধরা পড়েছে?—কি রকমে ধরা পড়লো?

জাহানারা। জিহন খাঁ তাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

সাজাহান। জিহন খাঁ! জিহন খাঁ! কি বলছিস্ জাহানারা? জিহন খাঁ!

জাহানারা। হাঁ বাবা।

সাজাহান। পৃথিবীর কি অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে!

জাহানারা। শুনলাম, পরশু দারা আর তা'র পুত্র সিপারকে এক কঙ্কালসার হাতির পিঠে বসিয়ে দিল্লীনগর প্রদক্ষিণ করিয়ে আনা হয়েছে। তাদের পরিধানে ময়লা শাদা কাপড়। তা'দের এই অবস্থা দেখে সেই রাজপুরীর একটি লোক নেই যে কাঁদেনি।

সাজাহান। তবু তা'দের মধ্যে কেউ দারাকে উদ্ধার কর্তে ছুটলো না? কেবল শশকের মত ঘাড় উঁচু করে দেখলে? তা'রা কি পাষাণ?

জাহানারা। না বাবা! পাষাণও উত্তপ্ত হয়। তারা থাক। ঔরংজীবের ভাড়া করা বন্দুকগুলি দেখে তা'রা সব ত্রস্ত; যেন একটা জাদুকরের মন্ত্র-মুগ্ধ; কেউ মাথা তুলতে সাহস কর্চ্ছে না। কাঁদ্‌ছে—তাও মুখ লুকিয়ে—পাছে ঔরংজীব দেখতে পায়।

সাজাহান। তার পর?

জাহানারা। তার পরে ঔরংজীব দারাকে খিজিরাবাদে একটা জঘন্য গৃহে বন্দী করে' রেখেছে।

সাজাহান। আর সিপার আর জহরৎ?

জাহানারা। সিপার তা'র পিতার সঙ্গ ছাড়ে নি। জহরৎ এখন ঔরংজীবের অন্তঃপুরে।

সাজাহান। ঔরংজীব এখন দারাকে নিয়ে কি কর্বে জানিস?

জাহানারা। কি কর্বে তা জানি না—কিন্তু—কিন্তু—

সাজাহান। কি জাহানারা!

জাহানারা। যদি তাই করে বাবা!

সাজাহান। কি! কি জাহানারা? মুখ ঢাকছিস্ যে! তা—কি সম্ভব!—ভাই কি ভাইকে হত্যা কর্বে?

জাহানারা। চুপ্। ও কার পদশব্দ! শুন্তে পেয়েছে!—বাবা আপনি কি কর্লেন! কি কর্লেন!

সাজাহান। কি করেছি?

জাহানারা। ও কথা উচ্চারণ করলেন!—আর রক্ষা নাই।

সাজাহান। কেন?

জাহানারা। হয়ত ঔরংজীব দারাকে হত্যা কর্ত্ত না! হয়ত এত বড় পাতক তারও মনে আস্‌তো না; কিন্তু আপনি সে কথা তা'র মনে করিয়ে দিলেন! কি কর্‌লেন! কি কর্‌লেন! সর্বনাশ করেছেন।

সাজাহান। ঔরংজীব ত এখানে নাই। কে শুনেছে?

জাহানারা। সে নাই, কিন্তু এই দেওয়াল ত আছে, বাতাস ত আছে, এই প্রদীপ ত আছে। আজ সব যে তা'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে? আপনি ভাব্‌ছেন যে এ আপনার প্রাসাদ?—না, ঔরংজীবের পাষাণ হৃদয়! ভাবছেন এ বাতাস? তা নয়, এ ঔরংজীবের বিষাক্ত নিশ্বাস! এ প্রদীপ নয়—এ তা'র চক্ষের জল্লাদ দৃষ্টি! এ প্রাসাদে, এ রাজপুরে, এ সাম্রাজ্যে, আপনার আমার একজন বন্ধু আছে ভেবেছেন বাবা? না নেই! সব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সব খোসামুদের দল! জোচ্চোরের দল!—এ কার ছায়া?

সাজাহান। কে?

জাহানারা। না কেউ নয়। ওদিকে কি দেখছেন বাবা!

সাজাহান। দেব লাফ?

জাহানারা। সে কি বাবা!

সাজাহান। দেখি যদি দারাকে রক্ষা কর্তে পারি!—তাকে তা'রা হত্যা কর্তে যাচ্ছে। আর আমি এখানে নারীর মত, শিশুর মত নিরুপায়। চোখের উপরে এই দেখছি অথচ খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, বেঁচে রয়েচি, কিছু কর্ছি না!—দেই লাফ।

জাহানারা। সে কি বাবা! এখান থেকে লাফ দিলে যে নিশ্চিত মৃত্যু!

সাজাহান। হ'লেই বা! দেখি যদি বাঁচাতে পারি।—যদি পারি।

জাহানারা। বাবা! আপনি জ্ঞান হারিয়েছেন? মরে' গেলে আর দারাকে রক্ষা কর্বেন কি করে'?

সাজাহান। তা বটে! তা বটে! আমি মরে' গেলে দারাকে বাঁচাবো কি করে'? ঠিক বলেছিস্! তবে—তবে—আচ্ছা একবার ঔরংজীবকে এখানে নিয়ে আস্তে পারিস নে জাহানারা?

জাহানারা। না বাবা, সে আস্‌বে না। নইলে আমি যে নারী—আমি তার সঙ্গে হাতে হাতে লড়ে' দেখতাম। সেদিন মুখোমুখি হ'য়ে পড়েছিলাম, কিছু কর্ত্তে পারি নি, সেই জন্য আমার পর্যন্ত আর বাইরে যাবার হুকুম নেই। নৈলে একবার হাতে হাতে লড়ে' দেখ্‌তাম।

সাজাহান। দিই লাফ! দেবো লাফ? লম্ফ প্রদানে উদ্যত

জাহানারা। বাবা, উন্মত্ত হবেন না।

সাজাহান। সত্যই ত আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি!—না না না। আমি পাগল হব না! ঈশ্বর! এই শীর্ণ দুর্বল জরাজীর্ণ নেহাৎই অসহায় সাজাহানকে দেখ ঈশ্বর! তোমার দয়া হচ্ছে না? দয়া হচ্ছে না? পুত্র পিতাকে বন্দী করে' রেখেছে—যে পুত্র তার ভয়ে একদিন কাঁপতো—এতখানি অবিচার, এতখানি অত্যাচার, এতখানি অস্বাভাবিক ব্যাপার তোমার নিয়মে সৈছে? সৈতে পাচ্ছে! আমি কি পাপ করেছিলাম খোদা—যে আমার নিজের পুত্র—ওঃ!

জাহানারা। একবার যদি এখন তাকে মুখোমুখি পাই তা হ'লে—

দন্তঘর্ষণ

সাজাহান। মমতাজ! বড ভাগ্যবতী তুমি, তাই আগেই মরে' গিয়েছো।—জাহানারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। তোকে আশীর্বাদ করি—

জাহানারা। কি বাবা?

সাজাহান। যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।

এই বলিয়া সাজাহান চলিয়া গেলেন

জাহানারা বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন

স্থান—ঔরংজীবের বহিঃকক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

ঔরংজীব একখানি পত্রিকাহস্তে বেড়াইতেছিলেন

ঔরংজীব। এই দারার মৃত্যুদণ্ড!—এ কাজীর বিচার!—আমার অপরাধ কি!—আমি কিন্তু—না, কেন—এ বিচার! বিচারকে কলুষিত কর্ব কেন! এ বিচার।

দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। এ হত্যা!

ঔরংজীব। (চমকিয়া) কে!—দিলদার!—তুমি এখানে?

দিলদার। আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আছি জাঁহাপনা। দেখে নেবেন। আর আমি যদি এখানে না থাকতাম, তা হ'লেও এ হত্যা—

ঔরংজীব। (কম্পিত স্বরে) হত্যা!—না দিলদার এ কাজীর বিচার!

দিলদার। সম্রাট্ স্পষ্ট কথা বল্‌বো?

ঔরংজীব। বল।

দিলদার। সম্রাট্! আপনি হঠাৎ কেঁপে উঠ্‌লেন যে! আপনার স্বর যেন শুষ্ক বাতাসের উচ্ছ্বাসের মত বেরিয়ে এলো। কেন জাঁহাপনা! সত্য কথা বল্‌বো?

ঔরংজীব। দিলদার!

দিলদার। সত্য কথা—আপনি দারার মৃত্যু চান।

ঔরংজীব। আমি?

দিলদার। হাঁ—আপনি।

ঔরংজীব। কিন্তু এ কাজীর বিচার।

দিলদার। বিচার! জাঁহাপনা, সে কাজীরা যখন দারার মৃত্যুদণ্ড

উচ্চারণ কর্ছিল, তখন তা'রা ঈশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে ছিল না। তখন তা'রা জাঁহাপনার সহাস্য মুখখানি কল্পনা কর্ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তাদের গৃহিণীদের নূতন অলঙ্কারের ফর্দ কর্ছিল। বিচার! যেখানে মাথার উপর প্রভুর আরক্ত চক্ষু চেয়ে আছে, সেখানে আবার বিচার! জাঁহাপনা ভাব্ছেন যে সংসারকে খুব ধাপ্পা দিলেন। সংসার কিন্তু মনে মনে খুব বুঝলো; কেবল ভয়ে কথাটি কইল না! জোর করে' মানুষের বাক্‌রোধ কর্তে পারেন, তাকে গলা টিপে মেয়ে ফেলতে পারেন; কিন্তু কালোকে শাদা কর্তে পারেন না। সংসার জান্‌বে, ভবিষ্যৎ জান্‌বে যে বিচারের ছল করে, আপনি দারাকে হত্যা করিয়েছেন—আপনার সিংহাসনকে নিরাপদ কর্বার জন্য।

ঔরংজীব। সত্য না কি!—দিলদার তুমি সত্য কথা বলেছো! তুমি আজ দারাকে বাঁচালে! তুমি আমার পুত্র মহম্মদকে ফিরিয়ে দিয়েছো। আজ আমার ভাই দারাকে বাঁচালে! যাও শায়েস্তা খাঁকে ডেকে দাও।

দিলদারের প্রস্থান

দারা বাঁচুন, আমায় যদি তা'র জন্য সিংহাসন দিতে হয় দেব! এতখানি পাপ—যাক, এ মৃত্যুদণ্ড ছিঁড়ে ফেলি—(ছিঁড়িতে উদ্যত) না, এখন না। শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে এটা ছিঁড়ে এ মহত্ত্বটুকু কাজে লাগাবো—এই যে শায়েস্তা খাঁ।

শায়েস্তা খাঁ ও জিহন খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন

সেনাপতি! বিচারে ভাই দারার প্রাণদণ্ড হয়েছে।

জিহন। ঐ বুঝি সেই দণ্ডাজ্ঞা? আমাকে দেন খোদাবন্দ, আমি নিজে কাজ হাসিল করে' আসছি। কাফেরের প্রাণদণ্ড নিজে হাতে দেবার জন্য আমার হাত সুড়সুড় করছে। আমায় দেন।

ঔরংজীব। কিন্তু তাঁ'কে মার্জনা করেছি।

শায়েস্তা। সে কি জাঁহাপনা—এমন শত্রুকে মার্জ্জনা!—আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী।

ঔরংজীব। তা জানি। তার জন্যই ত তাঁকে মার্জ্জনা কর্বার পরম গৌরব অনুভব কচ্ছি।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! এ গৌরব ক্রয় কর্ত্তে আপনার সিংহাসনখানি বিক্রয় কর্ত্তে হবে।

ঔরংজীব। যে বাহুবলে এ সিংহাসন অধিকার করেছি, সেই বাহুবলেই তা রক্ষা কর্ব।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! একটা মহাবিপদকে ঘাড়ে করে' সমস্ত জীবন রাজ্য শাসন কর্ত্তে হবে! জানেন সমস্ত প্রজা, সৈন্য, দারার দিকে? সেদিন দারার জন্য তা'রা বালকের মত কেঁদেছে; আর জাঁহাপনাকে অভিশাপ দিয়েছে। তা'রা যদি একবার সুযোগ পায়—

ঔরংজীব। কি রকমে?

শায়েস্তা। জাঁহাপনা দারাকে অষ্ট প্রহর পাহারা দিতে পার্বেন না। জাঁহাপনা সফরে গেলে সৈন্যগণ যদি কোন দিন কোন সুযোগে দারাকে মুক্ত ক'রে দেয়—তা হ'লে জাঁহাপনা—বুঝ্ছেন?

ঔরংজীব। বুঝ্ছি।

শায়েস্তা। তার উপর বৃদ্ধ সম্রাট্ও দারার পক্ষে। আর তাঁকে সৈন্যেরা মানে তাদের গুরুর মত, ভালবাসে পিতার মত।

ঔরংজীব। হুঁ, (পরিক্রমণ) না হয় সিংহাসন দেবো।

শায়েস্তা। তবে এত শ্রম করে' তা অধিকার করার প্রয়োজন কি ছিল? পিতাকে সিংহাসনচ্যুত, ভ্রাতাকে বন্দী—বড় বেশি দূর এগিয়েছেন জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। কিন্তু—

জিহন। খোদাবন্দ! দারা কাফের! কাফেরকে ক্ষমা কর্বেন আপনি খোদাবন্দ! এই ইস্‌লাম ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আপনি আজ ঐ সিংহাসনে বসেছেন—মনে রাখ্‌বেন। ধর্ম্মের মর্যাদা রাখ্‌বেন।

ঔরংজীব। সত্য কথা জিহন খাঁ! আমি নিজের প্রতি সব অন্যায় অবিচার ঘাড় পেতে নিতে পারি; কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা সৈব না। শপথ করেছি—হাঁ, দারার মৃত্যুই তার যোগ্য দণ্ড। জিহন আলি খাঁ, নেও মৃত্যুদণ্ড!—রোসো দস্তখৎ করে' দিই। (দস্তখৎ)

জিহন। দিউন জাঁহাপনা! আজ রাত্রেই দারার ছিন্নমুণ্ড জাঁহাপনাকে এনে দেখাবো—বাহিরে আমার অশ্ব প্রস্তুত।

ঔরংজীব। আজই!

শায়েস্তা। (মৃত্যুদণ্ড ঔরংজীবের হস্ত হইতে লইয়া) আপদ যত শীঘ্র যায় তত ভালো।

জিহনকে দণ্ডাজ্ঞা দিলেন

জিহন। বন্দেগি জাঁহাপনা!

প্রস্থানোদ্যত

ঔরংজীব। রোস দেখি। (দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ, পাঠ ও প্রত্যর্পণ) আচ্ছা—যাও।

জিহন গমনোদ্যত হইলে, ঔরংজীব আবার তাহাকে ডাকিলেন

ঔরংজীব। রোস দেখি! (দণ্ডাজ্ঞা পুনরায় গ্রহণ ও পুনরায় প্রত্যর্পণ) আচ্ছা—যাও।

জিহন আলির প্রস্থান

ঔরংজীব। (আবার জিহনের দিকে গেলেন; আবার ফিরিলেন,

তারপরে ক্ষণেক ভাবিলেন ; পরে কহিলেন) না কাজ নেই।—জিহন আলি ! জিহন আলি ! না চলে গেছে। শায়েস্তা খাঁ !

শায়েস্তা। খোদাবন্দ !

ঔরংজীব। কি কর্লাম !

শায়েস্তা। জাঁহাপনা বুদ্ধিমানের কার্যই করেছেন।

ঔরংজীব। কিন্তু যাক—

ধীরে ধীরে প্রস্থান

শায়েস্তা। ঔরংজীব ! তবে তোমারও বিবেক আছে ?

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—খিজিরবাদের কুটীর। কাল—রাত্রি

সিপার একটি শয্যার উপরে নিদ্রিত, দারা একাকী জাগিয়া তাহার পানে চাহিয়া ছিলেন

দারা। ঘুমাচ্ছে—সিপার ঘুমাচ্ছে। নিদ্রা! সবসন্তাপহারিণী নিদ্রা! আমার সিপারকে সর্ব দুঃখ ভুলিয়ে রেখো—বৎস প্রবাসে আমার সঙ্গে হিমে উত্তাপে বড় কষ্ট পেয়েছে, তাকে তোমার যথাসাধ্য সান্ত্বনা দাও! আমি অক্ষম। সন্তানকে রক্ষা করা, খাদ্য দেওয়া, বস্ত্র দেওয়া - পিতার কাজ! তা আমি পারি নি—বৎস !—তুই ক্ষুধায় অবশ হয়েছিস, আমি খাদ্য দিতে পারি নি। শীতে গাত্রবস্ত্র দিতে পারি নি—আমি নিজে খেতে পাই নি, শুতে পাই নি—সে দুঃখ আমার বক্ষে সে রকম কখন বাজে নি বৎস, যেমন তোর দুঃখ, তোর দৈন্য অবমাননা আমার বক্ষে বেজেছে! বৎস! প্রাণাধিক আমার, তোর পানে আজ চেয়ে দেখ্‌ছি, আর আমার মনে হচ্ছে আজ যে সংসারে আর কেউ নেই—কেবল তুই আর আমি আছি। আমার এত দুঃখ, আজ আমি কারাগারে বন্দী, তবু তোর মুখখানির পানে চাইলে সব দুঃখ ভুলে যাই।

দিলদারের প্রবেশ

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি—এ—কি দৃশ্য!

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি ছিলাম পূর্বে সুলতান মোরাদের বিদূষক। এখন আমি সম্রাট ঔরংজীবের সভাসদ্।

দারা। এখানে কি প্রয়োজন?

দিলদার। প্রয়োজন কিছুই নাই। একবার দেখা কর্ত্তে এসেছি।

দারা। কেন যুবক? আমাকে ব্যঙ্গ কর্ত্তে? কর।

দিলদার। না যুবরাজ! আমি ব্যঙ্গ কর্ত্তে আসি নি। আর যদিই ব্যঙ্গ কর্ত্তে আসতাম, ত এ দৃশ্য দেখে সে ব্যঙ্গ গলে' অশ্রু হ'য়ে টস্ টস্ করে' মাটিতে পড়তো—এই দৃশ্য! সেই যুবরাজ দারা আজ এই! (ভগ্নস্বরে) ভগবান্!

দারা। এ কি যুবক! তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে যে—কাঁদ্‌ছো! কাঁদো।

দিলদার। না কাঁদ্‌বো না। এ বড় মহিমময় দৃশ্য!—একটা পর্বত ভেঙে পড়ে রয়েছে, একটা সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছে, একটা সূর্য মলিন হ'য়ে' গিয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের একদিকে সৃষ্টি আর একদিকে ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে। সংসারেও তাই। এ একটা ধ্বংস—বিরাট, পবিত্র, মহিমময়!

দারা। তুমি একজন দার্শনিক দেখছি যুবক!

দিলদার। না যুবরাজ, আমি দার্শনিক নই, আমি বিদূষক, পারিষদ-পদে উঠেছি, দার্শনিক-পদে এখনও উঠি নি! তবে ঘাস খেতে খেতে মাঝে মাঝে এক একবার মুখ তুলে চাওয়ার নাম যদি দর্শন হয়, তা হ'লে আমি দার্শনিক! সাহাজাদা, মূর্খে ভাবে যে প্রদীপ জ্বলাই স্বাভাবিক, প্রদীপ নেভা অন্যায়; যে গাছ গজিয়ে ওঠাই উচিত, মরে' যাওয়া উচিত নয়; যে মানুষের সুখটি ঈশ্বরের কাছে প্রাপ্য, দুঃখটি তাঁর অত্যাচার; কিন্তু তা'রা একই নিয়মের দুইটি দিক্!

দারা। যুবক, আমি তা ভাবি না—তবু—দুঃখে হাস্‌তে পারে কে? মর্ত্তে চায় কে? আমি মর্ত্তে চাই না।

দিলদার। যুবরাজ! আপনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা আমি আজ রহিত করে' এসেছি। আপনি কারাগার হ'তে মুক্ত হ'তে চান যদি, আসুন তবে। আমার বস্ত্র পরিধান করুন—চলে যান'! কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না। আসুন, দু'জনে বেশ পরিবর্ত্তন করি।

দারা। তারপরে তুমি!

দিলদার। আমি মর্ত্তে চাই। মর্ত্তে আমার বড় আনন্দ! এ সংসারে কেউ নেই যে আমার জন্য শোক করবে!

দারা। তুমি মর্ত্তে চাও!!!

দিলদার। হাঁ, আমি মর্বার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম সাহাজাদা। মর্ত্তে আমি বড় ভালোবাসি! আপনার কাছে যে আজ কি কৃতজ্ঞ হ'লাম তা আর কি বল্‌বো।

দারা। কেন?

দিলদার। মর্বার একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসুন।

দারা। দয়াময়! এই-ই স্বর্গ! আবার কি!—না যুবক! আমি যাবো না।

দিলদার। কেন? মর্বার এমন সুযোগও ভিক্ষা করে' পাবো না সাহাজাদা? পদধারণ

দারা। আমি তোমায় মর্ত্তে দিতে পারি না। আর বিশেষতঃ এই বালককে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

জিহন খাঁর প্রবেশ

জিহন। আর কোথাও যেতে হবে, না। এই দারার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা।

দিলদার। সে কি!

জিহন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন সাহাজাদা! ঘাতক উপস্থিত।

দিলদার। তবে সম্রাট মত বদলেছেন?

জিহন। হাঁ দিলদার! তুমি এখন অনুগ্রহ করে' বাহিরে যাও। আমাদের কার্য—আমরা করি।

দারা। ঔরংজীব তার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে নিশ্বাস ফেল্‌বার জন্য আমাকে আধকাঠা জমিও দিতে পারে না? আমি এই অধম কুঁড়ে ঘরে আছি, গায়ে এই ছেঁড়া ময়লা কাপড়, খাদ্য খান দুই পোড়া রুটি। তাও সে দিতে পারে না?

দিলদার। তুমি একটু অপেক্ষা কর জিহন আলি! আমি সম্রাটের আদেশ নিয়ে আসি।

জিহন। না দিলদার। সম্রাটের এই আজ্ঞা যে, আজই রাত্রিকালে সাহজাদার ছিন্নমুণ্ড তাঁকে গিয়ে দেখাতে হবে।

দারা। আজই রাত্রে! এত শীঘ্র! এ মুণ্ড তার চাই-ই! নৈলে তার নিদ্রায় ব্যাঘাত হচ্ছে!—এ মুণ্ডের এত দাম আগে জান্তাম না।

জিহন। আজই রাত্রে আপনার মুণ্ড না নিয়ে যেতে পার্লে আমাদের প্রাণ যাবে।

দারা। ওঃ! তবে আর তুমি কি কর্বে জিহন খাঁ। উত্তম! তবে আমায় বধ কর! যখন সম্রাটের আজ্ঞা।—আজ কে সম্রাট্, কে প্রজা! —হাসছো?—হাসো।

জিহন। আপনি প্রস্তুত?

দারা। প্রস্তুত বৈ কি। আর প্রস্তুত না হ'লেই বা তোমাদের কি যায় আসে। (দিলদারকে) একদিন এই জিহন আলি খাঁ-ই আমার

কাছে করযোড়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। আমি তা দিয়েছিলাম। আজ—বিধি!—তোমার রচনা-কৌশল—চমৎকার!

জিহন। সম্রাটের আজ্ঞা! কাজীর বিচার! আমি কি কর্ব সাহাজাদা?

দারা। সম্রাটের আজ্ঞা! কাজীর বিচার! তা বটে! তুমি কি কর্বে! যাও বন্ধু তোমার সঙ্গে আমার এই প্রথম আর এই শেষ দেখা।

দিলদার। পার্লাম না। রক্ষা কর্তে পার্লাম না যুবরাজ! তবে এই বুঝি দয়াময়ের ইচ্ছা। বুঝ্‌তে পাচ্ছি না; কিন্তু বুঝি, এর একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, এর একটা মহৎ পরিণাম আছে। নইলে এতখানি নির্মমতা এতখানি পাপ কি বৃথাই যাবে? জেনো যুবরাজ! তোমার মত বলির একটা প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কি সে প্রয়োজন আমি তা বুঝ্‌ছি না; কিন্তু আছেই প্রয়োজন! হৃষ্টমনে প্রাণ বলি দাও।

দারা। নিশ্চয়ই, কিসের দুঃখ! একদিন ত যেতে হবেই! তবে দু'দিন আগে, দু'দিন পিছে! আমি প্রস্তুত। আমায় বিদায় দাও বন্ধু! তোমার সঙ্গে এই ক্ষণমাত্রের দেখা; তুমি কে তা জানি না, তবু বোধ হচ্ছে যেন তুমি বহুদিনের পুরাতন বন্ধু।

দিলদার। তবে যান যুবরাজ! এখানে আমাদের শেষ দেখা।

প্রস্থান

দারা। এখন আমায় বধ কর—জিহন আলি!

জিহন। নাজীর!

দুইজন ঘাতকের প্রবেশ

জিহন সঙ্কেত করিল

দারা। একটু রোস। একবার—সিপার, সিপার—না! কেন ডাকলাম!

সিপার। (উঠিয়া) বাবা!—একি! এরা কা'রা বাবা!—আমার ভয় কচ্ছে।

দারা। এরা আমায় বধ কর্ত্তে এসেছে। তোমার কাছে বিদায় নেবার জন্য তোমাকে জাগিইছি। আমাকে বিদায় দাও বৎস! (আলিঙ্গন) এখন যাও। জিহন খাঁ, তুমি বোধ হয় এত বড় পিশাচ নও যে আমার পুত্রের সম্মুখে আমায় বধ কর্বে! একে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।

জিহন। (একজন ঘাতককে) একে ঐ ঘরে নিয়ে যাও।

সিপার। (একজন ঘাতকের দ্বারা ধৃত হইয়া) না আমি যাবো না। আমার বাবাকে বধ কর্বে! কেন বধ কর্বে! (ঘাতকের হাত ছাড়াইয়া আসিল) বাবা—আমি তোমায় ছেড়ে যাবো না।

এই বলিয়া সিপার সজোরে দারার পা জড়াইয়া ধরিল

দারা। আমায় জড়িয়ে ধরে' কি কর্বে বৎস! আঁকড়ে ধরে' কি আমাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্বে? যাও বৎস! এরা আমায় বধ কর্বে। তুমি সে দৃশ্য দেখতে পার্বে না।

ঘাতকদ্বয় চক্ষু মুছিতে লাগিল

জিহন। নিয়ে যাও।

ঘাতক পুনর্বার সিপারকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে আসিল

সিপার। (চীৎকার করিয়া) না, আমি যাবো না। আমি যাবো না—

এই বলিয়া সিপার সেই ঘাতকের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল

দারা। দাঁড়াও। আমি ওকে বুঝিয়ে বল্‌ছি। তার পরে ও আর কোন আপত্তি কর্বে না—ছেড়ে দাও!

ঘাতক তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সিপার দারার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

দারা। (সিপারের হাত ধরিয়া) সিপার!

সিপার। বাবা!

দারা। সিপার—প্রিয়তম বৎস আমার! আমাকে বিদায় দে। তুই এতদিন এত দুঃখেও আমাকে ছাড়িস নি—হিমে, রৌদ্রে, অনশনে, অনিদ্রায় আমার সঙ্গে অরণ্যে, মরুভূমে বেড়িয়েছিস্—তবু আমাকে ছাড়িস্ নি। আমি যন্ত্রণায় অন্ধ হ'য়ে তোর বুকে ছুরি মার্ত্তে' গিয়েছিলাম, তবু আমায় ছাড়িস্ নি। আমার প্রবাসে, যুদ্ধে, কারাগারে, প্রাণের মত বুকের মধ্যে শোণিতের সঙ্গে মিশে ছিলি, আমায় ছাড়িস্ নি! আজ তোর নিষ্ঠুর পিতা—(বলিতে বলিতে দারার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পরে বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া দারা কহিলেন)—তোর নিষ্ঠুর পিতা আজ তোকে ছেড়ে যাচ্ছে।

সিপার। বাবা! মা গিয়েছেন—তুমিও—

ক্রন্দন

দারা। কি কর্ব! উপায় নাই বৎস! আমায় আজ মর্ত্তে' হবে। আমার দেহ ছেড়ে যেতে আজ আমার তত কষ্ট হচ্ছে না বৎস, তোকে ছেড়ে যেতে আজ আমার যে কষ্ট হচ্ছে। (চক্ষু মুছিলেন) যাও বৎস! এরা আমাকে বধ কর্বে। সে বড় ভীষণ দৃশ্য। সে দৃশ্য তুমি দেখ্তে পার্বে না।

সিপার। বাবা! আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো—আমি যাবো না!

দারা। সিপার! কখনও তুমি আমার কথার অবাধ্য হও নি। কখনও ত—(চক্ষু মুছিলেন) যাও বৎস! আমার শেষ আজ্ঞা—আমার এই শেষ অনুরোধ রাখো। যাও—আমার কথা শুন্বে না? সিপার, বৎস! যাও!

সিপার নতমুখে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দারা ডাকিলেন—সিপার!

সিপার ফিরিল

দারা। একবার—শেষবার বুকে ধ'রে নেই। (বক্ষে আলিঙ্গন) ওঃ—এখন যাও বৎস!

সিপার মন্ত্রমুগ্ধবৎ নতমুখে একজন ঘাতকের সহিত কক্ষান্তরে চলিয়া গেল

দারা। (ঊর্দ্ধমুখে বক্ষে হাত দিয়া) ঈশ্বর! পূর্বজন্মে কি মহাপাপ করেছিলাম! ওঃ যাক্, হয়ে' গিয়েছে। নাজীর তোমার কার্য কর।

জিহন। ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে কাজ শেষ করে' নিয়ে এসো, এখানে দরকার নাই।

ঘাতকদ্বয়ের সহিত দারা প্রস্থান করিলেন

জিহন। আমার প্রাণদাতার হত্যাটা সম্মুখে নাই দেখলাম।—ঐ কুঠারের শব্দ; ঐ মৃত্যুর আর্তনাদ!

নেপথ্যে। ও! ও! ও!

জিহন। যাক্ সব শেষ!

সিপার। (কক্ষান্তর হইতে) বাবা! বাবা! (দরজা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিল)

ঘাতক দারার ছিন্নমুণ্ড লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল

জিহন। দাও, মুণ্ড আমায় দাও। আমি সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবো!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর দরবার গৃহ। কাল—প্রাতঃ

ময়ূর সিংহাসনে ঔরংজীব। সম্মুখে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ, যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ, দিলীর খাঁ ইত্যাদি

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞামত মহারাজকে গুর্জর প্রদেশ দিয়েছি।

যশোবন্ত। তার বিনিময়ে জাঁহাপনাকে আমি আমার সেনা-সাহায্য স্বেচ্ছায় দিতে এসেছি!

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! ঔরংজীব দু'বার কাউকে বিশ্বাস করে না। তথাপি আমরা মহারাজ জয়সিংহের খাতিরে মাড়বার-রাজকে সম্রাটের রাজভক্ত প্রজা হ'বার দ্বিতীয় সুযোগ দিব।

জয়সিংহ। জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আমি বুঝেছি; যে ছলেই হোক্ বা শক্তি-বলেই হোক, জাঁহাপনা যখন সিংহাসন অধিকার করে' সাম্রাজ্যে একটা শান্তিস্থাপন করেছেন, তখন কোনরূপে সে শান্তিভঙ্গ কর্ত্তে যাওয়া পাপ।

ঔরংজীব। আমি এ কথা মহারাজের মুখে শুনে সুখী হ'লাম। মহারাজকে এখন তবে আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য কর্ত্তে পারি বোধ হয়?

যশোবন্ত। নিশ্চয়।

ঔরংজীব। উত্তম মহারাজ!—উজীরসাহেব! সুলতান সুজা এখন আরাকানরাজার আশ্রয়ে?

মীরজুম্‌লা। গোলাম তাঁকে আরাকানের সীমা পর্য্যন্ত প্রতাড়িত করে' রেখে এসেছে।

ঔরংজীব। উজীরসাহেব, আমরা আপনার বাহুবলের প্রশংসা করি।—সেনাপতি! কুমার মহম্মদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে' রেখে এসেছেন?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। বেচারী পুত্র! কিন্তু জহরৎ জানুক যে আমাদের কাছে এক নীতি। পুত্র মিত্র বিচার নাই।

জয়সিংহ। নিঃসন্দেহে জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। হতভাগ্য দারার মৃত্যু আমাদের সমস্ত জয়কে ম্লান করে' দিয়েছে; কিন্তু ভাই, পুত্র যাউক, ধর্ম্ম প্রবল হউক।—ভাই মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে কুশলে আছেন, সেনাপতি?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। মূঢ় ভাই। নিজের দোষে সাম্রাজ্য হারালে! আর আমি মক্কাযাত্রার মহাসুখে বঞ্চিত হ'লাম!—খোদার ইচ্ছা। দিলীর খাঁ! আপনি কুমার সোলেমানকে কি রকমে বন্দী কর্লেন?

দিলীর। জাঁহাপনা! শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহ কুমারকে সসৈন্য আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হন। তা'তে কুমার আমাদের পরিত্যাগ কর্ত্তে বাধ্য হ'লেন। আমি তারপরেই জাঁহাপনার পত্র পেয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' জাঁহাপনার আদেশ মত বল্লাম যে, "কুমার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র, সম্রাট্ তাঁ'কে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, তাঁ'কে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করায় ক্ষাত্রধর্ম্মের অন্যথা হবে না।" শ্রীনগরের রাজা প্রথমে কুমারকে আমার হস্তে অর্পণ করতে অস্বীকৃত হ'লেন। পরদিনই তিনি কুমারকে রাজ্য থেকে বিদায় দিলেন। কারণ বুঝ্‌লাম না।

ঔরংজীব। অভাগা কুমার! তারপর।

দিলীর। কুমার তিব্বত যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; কিন্তু পথ না জানার দরুন সমস্ত রাত্রি ঘুরে প্রভাতে আবার শ্রীনগরের প্রান্তে এসে উপস্থিত হন। তার পর আমি সসৈন্যে গিয়ে—তাঁ'কে বন্দী করি—এতে আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে' থাকে, খোদা আমায় রক্ষা করুন! আমি ব্যক্তি বিশেষের ভৃত্য নহি। আমি সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষ। সম্রাটের আজ্ঞা-পালন কর্তে আমি বাধ্য!

ঔরংজীব। তা'কে এখানে নিয়ে আসুন খাঁ সাহেব!

দিলীর। যে আজ্ঞে! প্রস্থান

ঔরংজীব। জিহন আলি খাঁকে নাগরিকগণ হত্যা করেছে মহারাজ?

জয়সিংহ। হাঁ খোদাবন্দ! শুন্‌লাম জিহন খাঁরই প্রজারা তা'কে হত্যা করেছে।

ঔরংজীব। পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড খোদা দিয়েছেন!—এই যে কুমার!

সোলেমান সমভিব্যাহারে দিলীর খাঁর প্রবেশ

এই যে কুমার—কুমার সোলেমান!—কি কুমার! শির নত করে' রয়েছো যে?

সোলেমান। সম্রাট্—(বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইলেন)

ঔরংজীব। বল, কি বল্‌ছিলে বল বৎস!—তোমার কোন ভয় নাই! তোমার পিতার মৃত্যুর আবশ্যক হয়েছিল। নহিলে—

সোলেমান। জাঁহাপনা, আমি আপনার কৈফিয়ৎ চাহি নাই। আর দিগ্বিজয়ী ঔরংজীবের আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবারও প্রয়োজন নাই। কে বিচার কর্বে! আমাকে বধ করুন। জাঁহাপনার ছুরিতে যথেষ্ট ধার আছে, তা'তে বিষ মেশানোর প্রয়োজন কি!

ঔরংজীব। সোলেমান! আমরা তোমাকে বধ কর্ব না। তবে—

সোলেমান। ও 'তবে'র অর্থ জানি সম্রাট! মৃত্যুর চেয়ে ভীষণ একটা কিছু কর্তে চান। সম্রাটের মনে যদি একটা নিষ্ঠুর কার্য কর্বার প্রবৃত্তি জাগে, ত শত্রুর তার বাড়া আর কোন ভয় নেই; কিন্তু যদি দু'টো নিষ্ঠুর কার্য তাঁর মনে পড়ে তবে যেটি বেশি নিষ্ঠুর সেইটেই ঔরংজীব কর্বেন তা জানি। তাঁ'র প্রতিহিংসার চেয়ে তাঁ'র দয়া ভয়ঙ্কর। আদেশ করুন সম্রাট্—তবে—

ঔরংজীব। ক্ষুব্ধ হয়ো না কুমার।

সোলেমান। না! আর কেন—ওঃ! মানুষ এমন মৃদু কথা কৈতে পারে, আর এত বড় দুরাত্মা হ'তে পারে!

ঔরংজীব। সোলেমান, তোমায় আমরা পীড়ন কর্তে চাই না। তোমার কোন ইচ্ছা থাকে যদি ত বল। আমি অনুগ্রহ কর্ব।

সোলেমান্। আমার এক ইচ্ছা জাঁহাপনা, আমাকে যথাসাধ্য পীড়ন করুন। আমার পিতৃহন্তার কাছে আমি করুণার এক কণাও চাই না। সম্রাট্! মনে করে' দেখুন দেখি যে কি করেছেন? নিজের ভাইকে—একই মা'য়ের গর্ভের সন্তান, একই পিতার স্নেহসিক্ত নয়নের তলে লালিত, শিরায় একই রক্ত—যার চেয়ে সংসারে আপন আর কেউ নেই—সেই ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। যে শৈশবে ক্রীড়ার সঙ্গী, যৌবনে স্নেহময় সহপাঠী; যার প্রতি কেউ রোষকটাক্ষ কর্লে সে কটাক্ষ নিজের বক্ষে বজ্রসম বাজা উচিত; যাকে আঘাত থেকে রক্ষা কর্বার জন্য নিজের বুক এগিয়ে দেওয়া উচিত; তাকে—তাকে আপনি হত্যা করেছেন। আর এ এমন ভাই! আপনি চাইলে এ সাম্রাজ্য আপনাকে যিনি এক মুঠো ধূলার মত ফেলে দিতে পার্তেন, যিনি আপনার কোন অনিষ্ট করেন নি, যাঁর একমাত্র অপরাধ যে তিনি

সর্বজনপ্রিয়—এমন ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। পরকালে যখন তাঁ'র সঙ্গে দেখা হবে, তাঁ'র মুখপানে চাইতে পার্বেন ?—হিংস্র! পিশাচ! শয়তান!—তোমার অনুগ্রহে আমি পদাঘাত করি।

ঔরংজীব। তবে তাই হোক্। আমি তবে তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম!—নিয়ে যাও। (অবতরণ) আল্লার নাম কর সোলেমান!

বালকবেশিনী জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। আল্লার নাম কর ঔরংজীব!

সোলেমান তাহার হাত ধরিলেন

সোলেমান। এ কে? জহরৎ উন্নিসা!!!

জহরৎ। ছেড়ে দাও। কে তুমি? পাপাত্মাকে আমি বধ কর্বো। ছেড়ে দাও—দাও!!

সোলেমান। সে কি জহরৎ! ক্ষান্ত হও--হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়। পাপে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি পার্তাম ত সম্মুখ যুদ্ধে এর শির নিতাম; কিন্তু হত্যা—মহাপাপ।

জহরৎ। ভীরু সব। পিতার কুলাঙ্গার পুত্রগণ! চলে' যাও। আমি আমার পিতার বধের প্রতিশোধ নেবো। ছেড়ে দাও ঐ—ভণ্ড দস্যু, ঘাতক—

মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন

ঔরংজীব। মহৎ উদার যুবক!—যাও তোমায় আমি বধ কর্ব না! শায়েস্তা খাঁ একে গোয়ালিয়র দুর্গে নিয়ে যাও।—আর দারার কন্যাকে আমার পিতার নিকটে আগ্রার প্রাসাদ দুর্গে নিয়ে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আরাকান-রাজপ্রাসাদ। কাল—রাত্রি

সুজা ও পিয়ারা

সুজা। নিয়তি আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে শেষে যে এই বন্য আরাকানের রাজার আশ্রয়ে এনে ফেল্‌বে তা কে জান্‌তো।

পিয়ারা। আবার কোথায় নিয়ে যাবে তাই বা কে জানে?

সুজা। বন্য রাজা কি রটিয়েছে জানো?

পিয়ারা। কি! খুব জাঁকালো রকম কিছু একটা নিশ্চয়। শীঘ্র বল কি রটিয়েছে? শুনবার জন্য হাঁপিয়ে ম'রে যাচ্ছি!

সুজা। বর্বর রটিয়েছে যে আমি চল্লিশ জন অশ্বারোহী নিয়ে এসেছি—আরাকান জয় কর্তে।

পিয়ারা। বিশ্বাস কি!—শুনেছি ব্যক্তিয়ার খিলিজি সতের জন অশ্বারোহী নিয়ে বাঙ্গালা দেশ জয় করেছিলেন।

সুজা। অসম্ভব। ওটা কেউ বিদ্বেষবশে রটিয়েছে নিশ্চয়। আমি বিশ্বাস করি না।

পিয়ারা। তাতে ভারি যায় আসে।

সুজা। পিয়ারা! রাজা কি আজ্ঞা দিয়েছে জানো?—রাজা আমাদের কাল প্রভাতে এখান থেকে চলে' যেতে আজ্ঞা দিয়েছে।

পিয়ারা। কোথায়? নিশ্চয় তিনি আমাদের খুব একটা ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গার বন্দোবস্ত করেছেন?

সুজা। পিয়ারা তুমি কি কঠিন ঘটনার রাজ্যে একবার ভুলেও এসে নাম্‌বে না! এতেও পরিহাস!

পিয়ারা। এতে পরিহাস কর্তে নেই বুঝি? আগে বল্‌তে হয়। আচ্ছা, এই নেও গম্ভীর হচ্ছি।

সুজা। হাঁ গম্ভীর হ'য়ে শোনো! আর এক কথা শুন্‌বে? শোনো যদি, চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসবে, ক্রোধে কণ্ঠরোধ হবে, সর্বাঙ্গে আগুন ছুট্‌বে।

পিয়ারা। ও বাবা!

সুজা। তবে বলি শোন!—দুরাত্মা আমাদের আশ্রয়দানের মূল্য স্বরূপ কি চায় জানো? সে তোমাকে চায়!—কি, স্তব্ধ হয়ে' রৈলে যে, কর পরিহাস।

পিয়ারা। নিশ্চয়। আমার রাজার প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল! এই রাজা সমজদার বটে।

সুজা। পিয়ারা! ও রকম ক'রো না। আমি ক্ষেপে যাবো। এটা তোমার কাছে পরিহাস হ'তে পারে, কিন্তু এ আমার কাছে মর্মশেল।—পিয়ারা! তুমি আমার কে তা জানো?

পিয়ারা। স্ত্রী বোধ হয়।

সুজা। না। তুমি আমার রাজ্য, সম্পৎ, সর্বস্ব—ইহকাল পরকাল! আমি রাজ্য হারিয়েছি—কিন্তু এতদিন তার অভাব অনুভব করি নি—আজ কর্‌লাম।

পিয়ারা। কেন?

সুজা। যা আমার কাছে জীবন-মরণের কথা, তাই নিয়ে তুমি পরিহাস কর্চ্ছ!

পিয়ারা। না, এ বড় বাড়াবাড়ি; দোজপক্ষে অনেকে বিয়ে করে; কিন্তু তোমার মত কেউ উচ্ছন্ন যায় নি।

সুজা। না। আমি বুঝেছি! তুমি শুধু মুখে পরিহাস কর্চ্ছ; কিন্তু অন্তরে গুমরে মরে' যাচ্ছো। তোমার মুখে হাসি, চোখে জল।

পিয়ারা। ধরেছ! না। কে বল্লে আমার চোখে জল! এই নাও, (চক্ষু মুছিলেন) আর নাই।

সুজা। এখন কি কর্বে ভেবেছো?

পিয়ারা। আমায় বেচে দাও।

সুজা। পিয়ারা! যদি আমাকে ভালোবাসো ত ও মারাত্মক পরিহাস রেখে দাও। শোন—আমি কি কর্ব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। আমিও জানি না। ঔরংজীবের দ্বারস্থ হব?—না। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। কি! কথা কচ্ছ না যে পিয়ারা!

পিয়ারা। ভাব্‌ছি।

সুজা। ভাবো।

পিয়ারা। (ক্ষণেক ভাবিয়া) কিন্তু পুত্র কন্যারা?

সুজা। কি?

পিয়ারা। কিছু না।

সুজা। আমি কি কর্ব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। বুঝ্‌তে পার্ছি না। আত্মহত্যা কর্তে ইচ্ছা হয়—তবে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না।

পিয়ারা। আর আমি যদি সঙ্গে যাই?

সুজা। সুখে মর্তে' পারি।—না, আমার জন্য তুমি মর্তে' যাবে কেন!

পিয়ারা। না, তাই হোক্।—কাল প্রভাতে আমাদের নির্বাসন নয়। কাল যুদ্ধ হবে। এই চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়েই এই রাজ্য আক্রমণ কর; করে' বীরের মত মর। আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মর্ব! আর পুত্র কন্যারা—তা'রা নিজের মর্যাদা নিজে রক্ষা কর্বে আশা করি।—কি বল?

সুজা। বেশ; কিন্তু তাতে কি লাভ হবে?

পিয়ারা। তদ্ভিন্ন উপায় কি! তুমি ম'রে গেলে আমাকে কে রক্ষা কর্বে! আজ তুমি এতদিন বীরের মত জীবন ধারণ করেছো, বীরের মত মর। এই বন্য রাজাকে এই ঘৃণ্য প্রস্তাব করার যোগ্য প্রতিফল দাও।

সুজা। সেই ভালো। কাল তবে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মর্ব।

পিয়ারা। তবে আমাদের ইহ জীবনের এই শেষ মিলন রাত্রি?

সুজা। আজ তবে হাসো, কথা কও, গাও—যা দিয়ে আমাকে এতদিন ছেয়ে দিতে, ঘিরে বসে' থাকতে। একবার শেষবার দেখে নেই, শুনে নেই। তোমার বীণাটি পাড়ো। গাও—স্বর্গ মর্ত্যে নেমে আসুক! ঝঙ্কারে আকাশ ছেয়ে দাও। তোমার সৌন্দর্যে একবার এ অন্ধকারকে ধাঁধিয়ে দাও দেখি। তোমার প্রেমে আমাকে আবৃত করে' দাও। রোস, আমি আমার অশ্বারোহীদের বলে' আসি। আজ সারা রাত্রি ঘুমাবো না।

প্রস্থান

পিয়ারা। মৃত্যু। তাই হোক! মৃত্যু—যেখানে সব ঐহিক আশার শেষ, সুখদুঃখের সমাধি; মৃত্যু—যে গাঢ় নিদ্রা আর এখানে জাগে না, যে অন্ধকার এখানে আর প্রভাত হয় না; যে স্তব্ধতা এখানে আর ভাঙ্গে না। মৃত্যু—মন্দ কি। একদিন তো আছেই। তবে দিন থাকতে মরা ভালো। আজ তবে এই রূপ নির্বাণোন্মুখ শিখার মত উজ্জ্বলতম প্রভায় জ্বলে' উঠুক; এই গান তারস্বরে আকাশে উঠে নক্ষত্ররাজ্য লুঠে নিক; আজিকার সুখ বিপদের মত কেঁপে উঠুক, আনন্দ দুঃখের মত কেঁপে উঠুক, সমস্ত জীবন একটি চুম্বনে মরে' যাক্! আজ আমাদের শেষ মিলন-রাত্রি।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় সাজাহানের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—রাত্রি

বাহিরে ঝটিকা বৃষ্টি বজ্র ও বিদ্যুৎ

সাজাহান ও জহরৎ উন্নিসা

সাজাহান। কা'র সাধ্য দারাকে হত্যা করে ? আমি সম্রাট্ সাজাহান, আমি স্বয়ং তা'কে পাহারা দিচ্ছি! কা'র সাধ্য!—ঔরংজীব?—তুচ্ছ! আমি যদি চোখ রাঙ্গাই, ঔরংজীব ভয়ে কাঁপবে। আমি যদি বলি ঝড় উঠুক, ত ঝড় ওঠে; যদি বলি যে বাজ পড়ুক, ত বাজ পড়ে

মেঘগর্জন

জহর। উঃ কি গর্জন! বাহিরে পঞ্চভূতের যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। আর ভিতরে এই অর্ধোন্মাদ পিতামহের মনের মধ্যে সেই যুদ্ধ চলেছে। (মেঘগর্জন) ঐ আবার!

সাজাহান। অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও! অসি, ভল্ল, তীর, কামান নিয়ে ছোটো। তা'রা আস্‌ছে—তা'রা আস্‌ছে।—যুদ্ধ কর্ব! রণবাদ্য বাজাও! নিশান উড়াও!—ঐ তা'রা আস্‌ছে। দূর হ, রক্তলোলুপ শয়তানের দূত! আমায় চিনিস্ না! আমি সম্রাট সাজাহান। সরে দাঁড়া!

জহর। ঠাকুর্দা, উত্তেজিত হবেন না! চলুন, আপনাকে শুইয়ে রেখে আসি।

সাজাহান। না! আমি সরে' গেলেই তা'রা দারাকে বধ কর্বে। —কাছে আসিস্ না খবর্দার!

জহরৎ। ঠাকুর্দা—

সাজাহান। কাছে আসিস্ না। তোদের নিশ্বাসে বিষ আছে,

সে নিশ্বাস বদ্ধ জলার বাতাসের চেয়ে বিষাক্ত, পচা হাড়ের চেয়ে দুর্গন্ধ! আর এক পা এগোসনে বলছি।

জহরৎ। ঠাকুর্দা। রাত্রি গভীর। শোবেন আসুন।

জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। কি করুণ দৃশ্য! পিতৃহারা বালিকা পুত্রহারা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। অথচ তা'র নিজের বুকের মধ্যে ধুধু করে' আগুন জ্বলে যাচ্ছে। কি করুণ! দেখে যাও ঔরংজীব! তোমার কীর্তি দেখে যাও!

জহরৎ। পিসীমা! তুমি উঠে এলে যে?

জাহানারা। মেঘের গর্জনে ঘুম ভেঙ্গে গেল!—বাবা আবার উন্মাদের মত বক্‌ছেন?

জহরৎ। হাঁ পিসীমা।

জাহানারা। ঔষধ দিয়েছ?

জহরৎ। দিয়েছি; কিন্তু এবার জ্ঞান হ'তে বিলম্ব হচ্ছে কেন জানি না।

সাজাহান। কে কর্লে! কে কর্লে!

জহরৎ। কি ঠাকুর্দা!

সাজাহান। মেরেছে। মেরেছে! ঐ রক্ত ছুটে বেরোচ্ছে! ঘর ভেসে গেল!—দেখি! (ছুটিয়া গিয়া দারার কল্পিত-রক্তে হস্ত দু'খানি মাখিয়া) এখনও গরম—ধোঁয়া উঠ্‌ছে!

জাহানারা। বাবা! এত রাত্রি হয়েছে, এখনও শো'ন্‌নি?

সাজাহান। ঔরংজীব! আমার পানে তাকিয়ে হাস্‌ছো! হাস্‌ছো! —না দুরাত্মা! তোমায় শাস্তি দিব। দাঁড়া ঘাতক! হাত জোড় করে' দাঁড়া!—কি! ক্ষমা চাচ্ছিস্?—ক্ষমা!! ক্ষমা নাই। আমার পুত্র

বলে' ক্ষমা কর্ব ভেবেছিস ?—না ! তোকে তুষানলে দগ্ধ কর্বার আজ্ঞা দিলাম ! যাও, নিয়ে যাও।

জাহানারা। বাবা, শো'ন্ গে যান্ !

জহরৎ। আসুন দাদা আমার !

হাত ধরিলেন

সাজাহান। কি মমতাজ ! তুমি ওর হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছ ! না আমি ক্ষমা কর্ব না। বিচার করেছি। দারাকে মেরেছে।

জাহানারা। না বাবা, মারে নি। ঘুমোন্ গে যান !

সাজাহান। মারে নি ? মারে নি—সত্য, মারে নি ? তবে এ কি দেখ্লাম ! স্বপ্ন ?

জাহানারা। হাঁ বাবা স্বপ্ন।

সাজাহান। তবু ভালো, কিন্তু বড় দুঃস্বপ্ন ! যদি সত্য হয় ! —কি জহরৎ কাঁদছিস্ যে !—তবে এ স্বপ্ন নয় ? স্বপ্ন নয় !—ও হো—হো—হো—হো—।

মেঘগর্জন

জহরৎ। একি হচ্ছে বাইরে ! আজ রাত্রিই কি পৃথিবীর শেষ রাত্রি !—সব ক্ষেপে গিয়েছে, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মাটি—সব ক্ষেপে গিয়েছে !—উঃ কি ভয়ঙ্কর রাত্রি !

সাজাহান। এ সব কি জাহানারা ?

জাহানারা। বাবা ! রাত্রি গভীর ! ঘুমোন্। আপনি ত উন্মাদ নন।

সাজাহান। না, আমি উন্মাদ নই। বুঝ্তে পেরেছি, বুঝ্তে পেরেছি !—বাইরে ও সব কি হচ্ছে জাহানারা ?

জাহানারা। বাইরে একটা প্রলয় হ'চ্ছে' যাচ্ছে। ঐ—শুনুন বাবা— মেঘের গর্জন ! ঐ শুনুন—বৃষ্টির শব্দ। ঐ শুনুন—বাতাসের হুঙ্কার !

মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি হচ্ছে। বৃষ্টি জলপ্রপাতের মত নেমে আসছে। আর ঘঞ্ঝা সেই বৃষ্টির ধারা মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সাজাহান। দে বেটারা! খুব দে, খুব দে: পৃথিবী নীরব হয়ে' সব সহ্য কর্বে। ও তোদের জন্ম দিয়েছিল কেন!—ও তোদের বুকে করে' মানুষ করেছিল কেন! তোরা বড় হইছিস্। আর মান্‌বি কেন!—ওর যেমনি কর্ম তেমনি ফল। দে বেটারা। কি কর্বে ও? রাশি রাশি গৈরিক জ্বালা উদ্গমন কর্বে? করুক, সে গৈরিক জ্বালা আকাশে উঠে দ্বিগুণ জোরে তারই বুকে এসে লাগবে। সে সমুদ্র তরঙ্গ তুলে ক্রোধে ফুলে উঠ্‌বে! উঠুক, সে তরঙ্গ তার নিজের বক্ষের উপরেই দীর্ঘশ্বাসে ছড়িয়ে পড়বে; তার অন্তর্নিরুদ্ধ বাষ্পে সে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠ্‌বে? কিছু ভয় নেই! তাতে সে নিজেই ফেটে যাবে। তোদের কিছু কর্তে পার্বে না—অথর্ব বুড়ী বেটি। ও বেটী কেবল শস্য দিতে পারে, বারি দিতে পারে, পুষ্প দিতে পারে। আর কিছু পারে না। দে, ওর বুকের উপর দিয়ে দলে' দলে' চষে' দিয়ে যা! ও কিছু কর্তে পার্বে না—দে বেটারা!—মা, একবার গর্জে' উঠতে পারো মা? প্রলয়ের ডাকে ডেকে, শত সূর্যের প্রভায় জ্বলে উঠে, ফেটে চৌচির হ'য়ে—মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে একবার ছুটকে যেতে পারো মা—দেখি, ওরা কোথায় থাকে?

দন্তঘর্ষণ

জাহানারা। বাবা! বৃথা এই ক্রোধে কি হবে! শোবেন আসুন।

মেঘগর্জন

জহরৎ। উঃ! কি রাত্রি পিসীমা! উঃ কি ভয়ঙ্কর!

সাজাহান। ইচ্ছা কর্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড় বৃষ্টি

অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর এই শাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা কর্চ্চে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছা কর্চ্চে যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বা'র করে' তা ঈশ্বরকে দেখাই! ঐ আবার গর্জ্জন!—মেঘ! বার বার কি নিষ্ফল গর্জ্জন কর্চ্চ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে' দিতে পারো? অন্ধকার? কি অন্ধকার হয়েছো! তোমার পিছনে ঐ সূর্য্য, নক্ষত্রগুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেল্‌তে পারো?

মেঘগর্জ্জন

জাহানারা। ঐ আবার!

তিনজনে একত্রে। উঃ! কি রাত্রি!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গোয়ালিয়র দুর্গ। কাল—প্রভাত

সোলেমান ও মহম্মদ

সোলেমান। শুনেছো মহম্মদ! বিচারে কাকার প্রাণদণ্ড হয়েছে।

মহম্মদ। বিচারে নয় দাদা, বিচারের নামে। এক ব্যক্তি ছিলেন এই কাকা! আজ তাঁ'রও শেষ হ'লো!

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার শ্বশুরের কিসে মৃত্যু হয়?

মহম্মদ। ঠিক জানি না। কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক জলমগ্ন হ'ন। কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক যুদ্ধে নিহত হ'ন। পুত্রকন্যারা আত্মহত্যা করে!

সোলেমান। তা হ'লে তাঁ'র পরিবারের আর কেউ রৈল না!

মহম্মদ। না।

সোলেমান। তোমার স্ত্রী শুনেছে?

মহম্মদ। শুনেছে। কাল সারারাত্রি কেঁদেছে; ঘুমায় নি।

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার এত বড় দুঃখ! সৈতে পাচ্ছ?

মহম্মদ। আর তোমার এ বড় সুখ! পিতামাতার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলে, আর দেখা হ'লো না।

সোলেমান। আবার সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ! মহম্মদ, তুমি এত নিষ্ঠুর!—তোমার পিতা কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, আমাকে নিত্য এই রকম দগ্ধ কর্তে! কোথায় আমায় সান্ত্বনা দেবে—

মহম্মদ। দাদা! যদি এই বক্ষের রক্ত দিলে তোমার কিছুমাত্র সান্ত্বনা হয় ত বল আমি ছুরি এনে এইক্ষণেই আমার বুকে বসিয়ে দিই।

সোলেমান। সত্য বলেছো মহম্মদ! এ দুঃখে সান্ত্বনা নাই। যদি সম্পূর্ণ বিস্মৃতি এনে দিতে পারো, যদি অতীত একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো—দাও!

মহম্মদ। এমন কোন এক ঔষধ নাই কি দাদা! এমন একটা বিষ নাই যে—

সোলেমান। ঐ দেখ মহম্মদ!—সিপারকে দেখ!

সেতুর উপর সিপারের প্রবেশ

সোলেমান। ঐ দেখ। বালককে—আমার ছোট ভাই সিপারকে দেখ! দেখ ঐ মূক স্থিরমূর্ত্তি! বুকের উপর বাহু বদ্ধ করে' একদৃষ্টে দূর শূন্যের দিকে চেয়ে আছে—নির্বাক্! এমন ভয়ানক করুণ দৃশ্য কখনো দেখেছো মহম্মদ?—এর পরে আর নিজের দুঃখের কথা ভাব্‌তে পারো?

মহম্মদ। উঃ কি ভয়ানক!—সত্য বলেছো! আমাদের দুঃখ উচ্চারণ করা যায়; কিন্তু এ দুঃখ বাক্যের অতীত। বালক যখন কাঁদে তখন যদি কাছে একটা ভীষণ আর্তনাদ উঠে, অমনি বালকের ক্রন্দন ভয়ে থেমে যায়। তেমনই আমাদের দুঃখ এর কাছে ভয়ে নীরব হ'য়ে যায়।

সোলেমান। ঐ দেখ চক্ষু দু'টি মুদ্রিত করে', দুই হস্ত মর্দন কর্চ্ছে! যেন যন্ত্রণায় হাহাকার কর্ত্তে চাচ্ছে, তবু বাক্‌স্ফূর্তি হচ্ছে না—সিপার! সিপার! ভাই!

সিপার একবার সোলেমানের দিকে চাহিয়া পরে চলিয়া গেল

মহম্মদ। দাদা!

সোলেমান। মহম্মদ!

মহম্মদ। আমায় ক্ষমা কর।

সোলেমান। তোমার দোষ কি!

মহম্মদ। না দাদা, আমায় ক্ষমা কর! এত পাপের ভার পিতা সৈতে পার্বে না। তাই তার অর্দ্ধেক ভার আমি নিজের ঘাড়ে নিলাম! আমি ঘোরতর পাপী! আমায় ক্ষমা কর।

জানু পাতিলেন

সোলেমান। ওঠো ভাই! মহৎ উদার, বীর! তোমায় ক্ষমা কর্ব আমি! তুমি যা সইছ, স্বেচ্ছায় ধর্মের জন্য সইছ! আমি শুধু হতভাগ্য।

মহম্মদ। তবে বল আমার প্রতি তোমার কোনও বিদ্বেষ নাই। ভাই বলে' আমায় আলিঙ্গন কর।

সোলেমান। ভাই আমার।

আলিঙ্গন

মহম্মদ। ঐ দেখ তা'রা কাকাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্চে!

সোলেমান সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন—সেতুর উপরে প্রহরিগণ-বেষ্টিত মোরাদ প্রবেশ করিলেন

মোরাদ। (উচ্চৈঃস্বরে) আল্লা! আমার পাপের শাস্তি আমি পাচ্ছি। দুঃখ নাই; কিন্তু ঔরংজীব বাদ যায় কেন?

নেপথ্যে। কেউ বাদ যাবে না। নিক্তির ওজনে ফিরে যাবে!

সোলেমান। ও কা'র স্বর?

মহম্মদ। আমার স্ত্রীর।

নেপথ্যে। তা'র যে শাস্তি আস্‌ছে, তা'র কাছে তোমার এ শাস্তি ত পুরস্কার।—কেউ বাদ যাবে না। কেউ বাদ যায় না।

মোরাদ। (সোল্লাসে) তা'রও শাস্তি হবে! তবে আমায় বধ্য ভূমিতে নিয়ে চল। আর দুঃখ নাই—

সপ্রহরী মোরাদ চলিয়া গেলেন

সোলেমান। মহম্মদ! এ কি! তুমি যে একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে রয়েছো? কি দেখ্‌ছো?

মহম্মদ। নরক। এ ছাড়া কি আরো একটা নরক আছে? সে কি রকম খোদা?

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ঔরংজীবের বহিঃকক্ষ। কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। যা করেছি—ধর্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হোত—(বাহিরের দিকে চাহিয়া) উঃ কি অন্ধকার!—কে দায়ী? আমি! এ বিচার, ও কি শব্দ?—না বাতাসের শব্দ!—এ কি! কোন মতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর কর্তে পার্ছি না। রাত্রে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না, (দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ কি স্তব্ধ! এত স্তব্ধ কেন! (পরিক্রমণ; পরে সহসা দাঁড়াইয়া) ও কি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির?—সুজার রক্তাক্ত দেহ! মোরাদের কবন্ধ! যাও সব! আমি বিশ্বাস করি না। ঐ তা'রা আবার আমায় ঘিরে নাচ্ছে!—কে তোমরা? জ্যোতির্ময়ী ধূমশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও।—চলে যাও—ঐ মোরাদের কবন্ধ আমায় ডাকছে; দারারও মুণ্ড আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাস্ছে—এ কি সব!—ওঃ! (চক্ষু ঢাকিলেন; পরে চাহিয়া) যাক্! চলে গিয়েচে!—উঃ—দেহে দ্রুত রক্তস্রোত বইছে! মাথার উপর যেন পর্বতের ভার।

দিলদারের প্রবেশ

ঔরংজীব। (চমকিয়া) দিলদার?

দিলদার। জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। এ সব কি দেখলাম?—জানো?

দিলদার। বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি। তবে আরম্ভ হয়েছে?

ঔরংজীব। কি?

দিলদার। অনুতাপ! জান্তাম, হতেই হবে! এত বড় অস্বাভাবিক আচরণ—নিয়মের এত বড় ব্যতিক্রম—প্রকৃতির কি বেশি দিন সয়? সয় না।

ঔরংজীব। নিয়মের কি ব্যতিক্রম দিলদার?

দিলদার। এই বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে' রাখা! জানেন জাঁহাপনা, আপনার পিতা আপনার নির্মমতায় আজ উন্মাদ!- তার উপর উপর্য্যুপরি এই ভ্রাতৃহত্যা! এত বড পাপ কি অমনি যাবে?

ঔরংজীব। কে বলে আমি ভ্রাতৃহত্যা করেছি? এ কাজীর বিচার!

দিলদার। চিরকালটা পরকে ছলনা করে' কি জাঁহাপনার বিশ্বাস জন্মেছে যে নিজেকে ছলনা কর্তে পারেন? সেইটেই সকলের চেয়ে শক্ত! ভাইকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পারেন, কিন্তু বিবেককে শীঘ্র টুঁটি টিপে মারতে পারেন না! হাজার তার গলা চেপে ধরুন, তবু তার নিম্ন, গভীর আচ্ছাদিত ভগ্নধ্বনি—হৃদয়ের মধ্যে থেকে থেকে বেজে উঠবে—এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

ঔরংজীব। যাও তুমি এখান থেকে। কে তুমি দিলদার যে ঔরংজীবকে উপদেশ দিতে এসেছো?

দিলদার। কে আমি ঔরংজীব? আমি মির্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ!

ঔরংজীব। নিয়ামৎ খাঁ হাজী!—এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামৎ খাঁ!

দিলদার। হাঁ ঔরংজীব। আমি সেই নিয়ামৎ খাঁ; শোনো, আমি রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে ঘটনাক্রমে এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্তের মধ্যে পড়েছিলাম। 'সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জঘন্য

বিদূষক সেজেছি, একবার একটা সামান্য চাকুরিতেও নেমেছি ; কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ এখান থেকে বেরোচ্ছি—মনে হয় যে সেটুকু না নিয়ে গেলে ছিল ভালো। ঔরংজীব! ভেবেছিলে যে আমি তোমার রৌপ্যের জন্য এতদিন তোমার দাসত্ব কর্ছিলাম? বিদ্যার এখনও এ তেজ আছে যে সে ঐশ্বর্যের মস্তকে পদাঘাত করে। আমি চল্লাম সম্রাট্!

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। জনাব।

দিলদার। না, আমায় ফেরাতে পার্বে না ঔরংজীব!—আমি চল্লাম। তবে একটা কথা বলে যাই। মনে ভাব্ছো যে এই জীবন-সংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে? না, এ তোমার জয় নয় ঔরংজীব! এ তোমার পরাজয়। বড পাপের বড শাস্তি।—অধঃপতন! তুমি যত ভাব্ছো উঠ্ছো, সত্যসত্য তুমি ততই পড়ছো। তারপর যখন তোমার যৌবনের নেশা ছুটে যাবে, যখন শাদা চোখে দেখ্বে, যে নিজের আর স্বর্গের মধ্যে কি মহা ব্যবধান খনন করেছো, তখন তার পানে চেয়ে তুমি শিউরে উঠ্বে। মনে রেখো।

প্রস্থান

ঔরংজীব নতশিরে বিপরীত দি:ক চলিয়া গেলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদ-অলিন্দ। কাল—অপরাহ্ণ

জাহানারা, জহরৎ উন্নিসা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন

জাহানারা। জহরৎ উন্নিসা! ঔরংজীবের মত এমন সৌম্য, সহাস্য, মনোহর পাষণ্ড দেখেছো কি মা!

জহরৎ। না। আমার একটা ভয় হয় পিসীমা! ভিতরে এত ক্রূর, বাহিরে এত সরল; ভিতরে এত প্রবল, বাহিরে এত স্থির; ভিতরে এত বিষাক্ত; আর বাহিরে এত মধুর!—এও কি সম্ভব! আমার ভয় হয়!

জাহানারা। আমার কিন্তু একটা ভক্তি হয়। বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে যাই যে, মানুষ এমন হাস্‌তে পারে—আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের লোলুপ চাহনি চাইতে পারে; এমন মৃদু কথা কইতে পারে—যখন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে; ঈশ্বরের কাছে এমন হাত জোড় কর্তে পারে—যখন ভিতরে নূতন শয়তানী মতলব কর্ছে।—বলিহারি!

জহরৎ। ঠাকুর্দাকে এই রকম বন্দী করে' রেখেছেন অথচ রাজকার্যে তাঁ'র উপদেশ চেয়ে পাঠাচ্ছেন। তাঁ'র সম্মুখে তাঁর পুত্রদের একে একে হত্যা কর্ছেন—অথচ প্রতিবারই তাঁ'র ক্ষমা চেয়ে পাঠাচ্ছেন। যেন কত লজ্জা, কত সঙ্কোচ!—অদ্ভুত! ঐ যে ঠাকুর্দা আস্‌ছেন।

সাজাহানের প্রবেশ

সাজাহান। দেখ কেমন সেজেছি জাহানারা, দেখ জহরৎ উন্নিসা! ঔরংজীব এ রত্ন সব পাছে চুরি ক'রে নেয়—তাই আমি পরে' পরে' বেড়াচ্ছি। কেমন দেখাচ্ছে! (জহরৎকে) আমাকে তোর বিয়ে কর্তে ইচ্ছে হচ্ছে না?

জহরৎ। আবার জ্ঞান হারিয়েছেন! উন্মত্ততা মাঝে মাঝে চন্দ্রের উপর শরতের মেঘের মত এসে চলে' যাচ্ছে।

সাজাহান। (সহসা গম্ভীর হইয়া) কিন্তু খবরদার! বিয়ে করিস্ নি। (নিম্নস্বরে) ছেলে হ'লে তোকে কয়েদ করে' রেখে দেবে, তোর গহনা কেড়ে নেবে! বিয়ে করিস্ না।

জাহানারা। দেখছো মা! এ উন্মত্ততা নয়। এর সঙ্গে জ্ঞান জড়ানো রয়েছে। এ যেন একটা ছন্দে বিলাপ।

জহরৎ। জগতে যত রকম করুণ দৃশ্য আছে জ্ঞানী উন্মাদের মত করুণ দৃশ্য বুঝি আর নাই! একটা সুন্দর প্রতিমা যেন ভেঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়ে র'য়েছে।—উঃ বড় করুণ! চক্ষে বস্ত্র দিয়া প্রস্থান

সাজাহান। আমি উন্মাদ হই নাই জাহানারা। গুছিয়ে বলতে পারি—চেষ্টা কর্লে গুছিয়ে বলতে পারি!

জাহানারা। তা জানি বাবা।

সাজাহান। কিন্তু আমার হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছে। এত বড় দুঃখ ঘাড়ে করে' যে বেঁচে আছি, তাই আশ্চর্য! দারা, সুজা, মোরাদ—সবাইকে মার্লে? আর তাদের একটা ছেলেও রৈল না প্রতিহিংসা নিতে!—সব মার্লে!

ঔরংজীবের প্রবেশ

সাজাহান। এ কে? (সভীত বিস্ময়ে) এ—যে সম্রাট্!

জাহানারা। (আশ্চর্যে) তাই ত, ঔরংজীব!

ঔরংজীব। পিতা!

সাজাহান। আমার মণিমুক্তা নিতে এসেছ! দেবো না, দেবো না! এক্ষণই সব লোহার মুগুর দিয়ে গুঁড়ো করে' ফেল্‌বো।

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। (সম্মুখে আসিয়া) না পিতা আমি মণিমুক্তা নিতে আসি নি।

জাহানারা। তবে বোধ হয় পিতাকে বধ কর্ত্তে এসেছো। পিতৃ-হত্যাটা আর বাকি থাকে কেন! হ'য়ে যাক।

সাজাহান। বধ কর্বে। আমায় হত্যা কর্বে! কর ঔরংজীব! আমাকে হত্যা কর! তার বিনিময়ে এই সব মণিমুক্তা তোমায় দেবো; আর—মর্বার সময় তোমায় এই অনুগ্রহের জন্য আশীর্বাদ করে' মর্ব। এই লোল বক্ষ খুলে দিচ্ছি। তোমার ছুরি বসিয়ে দাও।

ঔরংজীব। (সহসা জানু পাতিয়া) আমাকে এর চেয়ে আরও অপরাধী কর্বেন না পিতা! আমি পাপী! ঘোরতর পাপী। সেই পাপের প্রদাহে জ্বলে' পুড়ে যাচ্ছি। দেখুন পিতা—এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরগত চক্ষু, এই শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ তা'র সাক্ষ্য দিবে।

সাজাহান। শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছ! সত্য, শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছ!

জাহানারা। ঔরংজীব! ভূমিকার প্রয়োজন নাই। এখানে একজন আছে সে তোমায় বেশ জানে। নূতন কি শয়তানী মতলব করে' এসেছো বল। কি চাও এখানে?

ঔরংজীব। পিতার মার্জ্জনা।

জাহানারা। মার্জ্জনা! এটা ত খুব নূতন রকম করেছো ঔরংজীব।

ঔরংজীব। আমি জানি ভগ্নী—

জাহানারা। স্তব্ধ হও।

সাজাহান। বলতে দেও জাহানারা! বল। কি বল্‌তে চাও ঔরংজীব?

ঔরংজীব। কিছু বলতে চাই না। শুধু আপনার মার্জ্জনা চাই।

জাহানারা ব্যঙ্গ হাসি হাসিলেন

ঔরংজীব। (একবার জাহানারার পানে চাহিয়া পরে সাজাহানকে কহিলেন) যদি এ প্রার্থনা কপট বিবেচনা করেন, ত পিতা আসুন আমার

সঙ্গে। আমি এই দণ্ডে প্রাসাদ দুর্গের দ্বার খুলে দিচ্ছি ; আর আপনাকে আগ্রায় সিংহাসনে সর্বজনসমক্ষে বসিয়ে সম্রাট্ ব'লে অভিবাদন কর্ছি। এই আমার রাজমুকুট আপনার পদতলে রাখ্লাম।

এই বলিয়া ঔরংজীব মুকুট খুলিয়া সাজাহানের পদতলে রাখিলেন

সাজাহান। আমার হৃদয় গলে' যাচ্ছে, গলে' যাচ্ছে !

ঔরংজীব। আমায় ক্ষমা করুন পিতা।

চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন

সাজাহান। পুত্র !

ঔরংজীবকে ধরিয়া উঠাইয়া পরে নিজের চক্ষু মুছিলেন

জাহানারা। এ উত্তম অভিনয় ঔরংজীব !

সাজাহান। কথা কস্ নে জাহানারা ! পুত্র আমার পা জড়িয়ে আমার ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি ? হা রে বাপের মন। এতদিন ধরে' তোর হৃদয়ের নিভৃতে বসে' এইটুকুর জন্য আরাধনা কর্ছিলি ! এক মুহূর্তে এই ক্রোধ গলে' জল হ'য়ে গেল।

ঔরংজীব। আসুন পিতা—আপনাকে আবার আগ্রার সিংহাসনে বসাই। বসিয়ে মক্কায় গিয়ে আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করি।

সাজাহান। না, আমি আর সম্রাট হ'য়ে বস্তে চাই না। আমার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ কর পুত্র! এ মণিমুক্তা মুকুট তোমার ! আর মার্জনা। ঔরংজীব—ঔরংজীব ! না সে সব মনে কর্ব না ! ঔরংজীব ! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা কর্লাম।

চক্ষু ঢাকিলেন

জাহানারা। পিতা ! দারার হত্যাকারীকে ক্ষমা !

সাজাহান। চুপ ! জাহানারা ! এ সময়ে আমার সুখে আর ঘা দিস্

নে। তাদেব তো আর ফিরে পাবো না। সাত বৎসর দুঃখে কেটেছে, এতদিন বড় জ্বালায় জ্বলেছি। শোকে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছি। দেখেছিস্ ত— একদিন সুখী হ'তে দে! তুইও ঔরংজীবকে ক্ষমা কর মা।

ঔরংজীব। আমাকে ক্ষমা কর ভগ্নী।

জাহানারা। চাইতে পার্চ্ছ? পিতার মত আমার স্থবিরত্ব হয় নি। রাজদস্যু। ঘাতক। শঠ।

সাজাহান। তোর মত মাতৃহারা জাহানারা—তোরই মত বেচারী। ক্ষমা কর্। ওর মা যদি এখন বেঁচে থাকতো, সে কি কর্ত জাহানারা? —তাই সেই মায়ের ব্যথা যে সে আমাব কাছে জমা রেখে গিয়েছে। কি জাহানারা? তবু নিস্তব্ধ। চেয়ে দেখ্ এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে— দেখ্ সে কি স্বচ্ছ। চেযে দেখ্ ঐ আকাশেব দিকে—দেখ্ সে কি গাঢ়! চেয়ে দেখ ঐ কুঞ্জবনের দিকে—দেখ সে কি সুন্দর। আর চেয়ে দেখ্ ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু, ঐ অনন্ত আক্ষেপেব আপ্লুত বিয়োগের অমব-কাহিনী —ঐ স্থির মৌন নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মন্দির, ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্ —সে কি করুণ। তাদের দিকে চেযে ঔরংজীবকে ক্ষমা কর—আর ভাব্‌তে চেষ্টা কর্ যে—এ সংসারকে যত খারাপ্ ভাবিস্—সে তত খারাপ নয়। জাহানারা।

জাহানারা। ঔরংজীব। এখানে তোমার জয় সম্পূর্ণ হলো। ঔরংজীব—আমার এই জীর্ণ মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে আমি তোমায় ক্ষমা কর্লাম।

মুখ ঢাকিলেন

বেগে জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। কিন্তু আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক! পৃথিবী শুদ্ধ যদি তোমায় ক্ষমা করে, আমি কর্ব না। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি;

ক্রুদ্ধ ফণিনীর উষ্ণ নিশ্বাসে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। সে অভিশাপের ভৈরব ছায়া যেন একটা আতঙ্কের মত তোমার আহারে বিহারে—তোমার পিছনে পিছনে ফিরে। নিদ্রায় সেই অভিশাপের পর্বতভার যেন তোমার বক্ষে চেপে ধরে। সেই অভিশাপের বিকট ধ্বনি যেন তোমার সকল বিজয়বাদ্যে বেসুরো বেজে উঠে। তুমি আমার পিতাকে হত্যা করে' যে সাম্রাজ্য অধিকার করেছো, আমি অভিশাপ দেই, যেন তুমি দীর্ঘকাল বাঁচো, আর সেই সাম্রাজ্য ভোগ কর; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয়; যেন সে পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে, যাতে মর্বার সময় তোমার ঐ উত্তপ্তললাটে ঈশ্বরের করুণার এক কণাও না পাও।

সাজাহান, ঔরংজীব ও জাহানারা তিনজনেই শির অবনত করিলেন

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ২৩, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্তৃক মুদ্রিত

টীকা

টীকা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তাই ত!……দুঃসংবাদ দারা।—নাটকের বিষাদময় পরিণামের ইঙ্গিত সাজাহানের প্রথম উক্তিটিতেই সূচিত হচ্ছে।

সুজা বঙ্গদেশে……যোগ দিয়েছে।—নাটকের ঘটনাকাল ও উপস্থাপ্য বিষয় সম্পর্কে এখানে আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য, সুজা নিজেকে রাজমহলে সম্রাট বলে ঘোষণা করে ১৭৫৭ সালের নভেম্বরে এবং মোরাদ কিছু পরে, ডিসেম্বরের ৫ তারিখে।

তাতে কি অপরাধ…ভাবী সম্রাট্।—জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজ্যলাভে অগ্রাধিকার মোগল রাজত্বে প্রথাসিদ্ধ ছিল না। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

কাল রাত্রে……দুঃস্বপ্ন দেখেছি। ভাবী অশুভ ঘটনার নাট্যরীতি-সিদ্ধ পূর্বছায়াপাত। দারার উপরেও যে এর প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে তাতে দারার দুর্বলতা ধরা পড়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আমি হাস্য পরিহাস……ব্যঙ্গের ধুম হয়ে ওঠে।—দিলদার-চরিত্র দ্রষ্টব্য।

মোরাদ এদিকে……সম্ভোগ মজ্জিত। ইতিহাসে ও নাটকে মোরাদের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য লাভ করেছে।

আমাদের যুদ্ধে জয় হয়েছে।—ধর্মাট যুদ্ধে।

দিলদারের কৌতুকাবহ ব্যঙ্গোক্তি বহুস্থলে King Lear নাটকে একাধিক চরিত্রের সংলাপের প্রতিধ্বনিমাত্র। কোন কোন স্থানে ভাবানুবাদ, কোথাও বা মূলের অনুসরণে সংলাপসৃষ্টির প্রয়াস এই দৃশ্যে এবং দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দিলদারের উক্তিগুলির অর্থ বুদ্ধিহীন মোরাদের অবোধ্য এবং মোরাদের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে তার ব্যঙ্গ মোরাদের হাসি আকর্ষণ করেছে। সে ভাবছে তার বিদূষক সরল মানুষ। অবসর-বিনোদনের উপযুক্ত কৌতুককর বাক্য-বিন্যাস ছাড়া আর কিছু তার কাছে আশা করা চলে না। ঔরংজীবের কাছে তার বাক্যের অন্তর্গর্ভ অর্থ সহজেই ধরা পড়েছে।

আমি শুনেছি যে·····খুব বুদ্ধি।—সাজাহানের পুত্রদের পিতৃদ্রোহ সম্পর্কে ইঙ্গিত।

দয়াময় মানুষকে দাঁত·····তার জন্য পয়সা খরচ করে।—মূর্খ মোরাদ বোঝে না হাসির অধিকার—প্রাণিমাত্রসুলভ নয়। মানুষেরই এটা বিশেষ অধিকার। কিন্তু মোরাদের হাস্যরসের ক্ষেত্রে প্রবেশ অনধিকার। বিধাতা হাসির সহজ অধিকারে তাকে বঞ্চিত করেছেন। তার অর্থব্যয় করে বিদূষক রেখে হাস্যরস-রসিক হবার চেষ্টাকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে।

ঈশ্বর নাক দিয়েছিলেন······নাকের উপর চশমা পরে।—নিম্নোদ্ধৃত অংশ তুলনীয় :—

Fool······Thou canst tell why one's nose stands i' the middle one's face ?

Lear. No.

Fool. Why to keep one's eyes of either

side's nose, that what a man cannot smell out, he may spy into.

[King Lear, Act I, Sc. V].

আমি সসৈন্যে নর্মদাতীরে......পতন হবেই। যশোবন্তসিংহের চরিত্রে বীরোচিত মহিমা নাট্যপ্রয়োজনে আরোপিত হচ্ছে। যশোবন্তের আক্রমণে দ্বিধার প্রকৃত কারণ এই যে, ঔরংজীবের অভিপ্রায় সম্যক বুঝে সেই অনুসারে যশোবন্তকে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া বা দৌত্য দ্বারা সন্ধির প্রয়াস করা বিষয়ে দ্বিধান্বিত হতে হয়েছিল। সাজাহানের নির্দেশ এসম্পর্কে অনেকটা দায়ী ছিল। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয় দৃশ্য

সুজা-পিয়ারার এই প্রথম দৃশ্যে এবং পরবর্তী অন্যান্য দৃশ্যে দম্পতীর বিশ্রম্ভালাপ কৌতুক-মাধুর্যে সঙ্গীতে প্রেমে এমন একটা কমেডি-সুলভ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে, মূল নাটকের আপন প্রয়োজনকে এমন কোণ-ঠাসা করে ফেলেছে যে একে অস্থানোপচিত ও অবাঞ্ছিত বলতে আমাদের দ্বিধাবোধ হয় না।

এখনই মহারাজ জয়সিংহ ...পড় কি আছে জানো ?—দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে সুজা বলছে 'জয়সিংহ আমাকে সম্রাটের যে দস্তখৎ দেখিয়ে-ছিলেন- -সে দস্তখৎ দারার জাল।' জয়সিংহের প্রদর্শিত পত্র যে জাল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সাজাহান বা দারার নয়, জয়সিংহের কপটা-চারের নিদর্শন।

চতুর্থ দৃশ্য

ধর্মাট যুদ্ধে পরাজিত ও পলায়িত যশোবন্ত সিংহের মুখের উপর মহামায়া যে দুর্গদ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল কিংবদন্তী-নির্ভর কাহিনীটিকে

কর্নেল টড তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন কিন্তু ইতিহাস থেকে এ কাহিনীর কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। যশোবন্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিল,—সত্য। রাজপুত সৈন্যদের ইতিহাসে পলায়ন বৃত্তান্ত সুলভ নয়, এ ও সত্য। যেখানে পশ্চাৎপদ হওয়া যুদ্ধনীতির-ই অঙ্গ সেখানেও এরা পরাজয় নিশ্চিত জেনে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছে। আখম-ই-আলমগিরিতে ঔরংজীবের উইল বলে কথিত দলিলের এক অংশের স্যর যদুনাথ কৃত নিম্নোক্ত অনুবাদে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে :—

'The Turani people have ever been soldiers. They are very expert in making charges, raids, night-attacks and arrests. They feel no suspicion, despair or shame when commanded to make a retreat in the very midst of a fight, which means, in other words, 'when the arrow is drawn back',—and they are a hundred stages remote from the crass stupidity of the Hindustanis, who would part with their heads but not leave their positions (in battle).'

ধর্মাট যুদ্ধে কাশিম খাঁর সৈন্যেরা চুপ করে এক পাশে সরে রইল। যখন দেখল ঔরংজীবের সৈন্যেরা তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন তারা সোজা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। যশোবন্তের অল্পমাত্র অবশিষ্ট রাজপুত সৈন্যদের উপর বন্যার মত বিপক্ষ বাহিনী এসে পড়ল—সামনে থেকে ঔরংজীব, বাঁ দিক থেকে মোরাদ এবং ডান দিক থেকে সফ শিকন খাঁর সৈন্যদল। 'The Maharajah, who had received two wounds, wanted to drive his horse into the advancing enemy's ranks and get slain. But his generals and ministers seized his bridle and dragged

his horse out of the field, and took the road to Jodhpur."

অতএব যশোবন্তের পলায়ন ভীরুর পলায়ন নয়। নাটকে যশোবন্তের বীরত্বের দিকটা এই দৃশ্যে ধরা পড়েনি।

পঞ্চম দৃশ্য

ঔরংজীব ও মোরাদকে অবলম্বন করে অতি ক্ষুদ্র একটি দৃশ্যে নাট্যকার সামুগড় যুদ্ধের প্রস্তুতি ত্বরা ষড়যন্ত্র—সব মিলে একটা বিরাট আলোড়নের আভাষ দর্শকচিত্তে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছেন। ঔরংজীবের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তৎপরতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রতি দর্শকের অনবহিত থাকবার উপায় নেই।

চম্বল নদীর পার হবার জায়গাগুলিতে দারা হানা দিয়ে বসেছিল, খেয়াগুলি বন্ধ ছিল। ঔরংজীব স্থানীয় এক জমিদারের সহায়তায় ঢোলপুরের ৪০ মাইল দূরে ভাদাগুলিতে হাঁটু-জল একটা জায়গা দিয়ে নদী পার হল। শুধু এই জায়গাটিতে দারার সৈন্যের থানা ছিল না। কিন্তু সব ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না জেনেও এ দৃশ্যের রসাস্বাদন সম্ভব। ইতিহাস থেকে উপাদান নিয়ে তাকে নাট্যকার এই দৃশ্যে যে ভাবে ব্যবহার করেছেন তার ফলে অভীষ্ট নাট্যরসের ক্ষেত্রে তার প্রাণ-ধর্মের যথার্থ মুক্তিলাভ ঘটেছে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সামুগড়ের যুদ্ধে ঔরংজীবের জয়লাভের পর জয়সিংহ বুঝেছে ঔরংজীবের পক্ষে যোগদান করাই বুদ্ধিমানের কাজ। নীতি, প্রভুভক্তি প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থে প্রশংসিত বৃত্তিগুলির তার কাছে কোন মূল্য নেই। রাজনীতির খেলায় সুবিধা-নীতি ছাড়া অন্য কোন নীতির স্থান

নেই। এ খেলায় জয়সিংহ যেমন ইতিহাসে তেমনি নাটকে পাকা খেলোয়াড।

দিলীর খাঁর চরিত্রকে জয়সিংহের পাশাপাশি রেখে নাট্যকার তার মধ্যে নাটোচিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছেন। দিলীর খাঁ যোদ্ধা, কিন্তু রাজনীতির চালে তার 'বুদ্ধিটা ঠিক খেলে না'। জয়সিংহের ইঙ্গিতে ও অনুসরণে সে সোলেমানের পক্ষ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নতজানু যুবরাজ-পুত্রের প্রার্থনায় সে সোলেমানের অনুবর্তী হল। দিলীর খাঁর মধ্যে মানবিক ধর্মের এখনও কিছু অবশেষ আছে।

সমগ্র দৃশ্যের মধ্যে যে কৌতূহলোদ্বেগ-সঞ্চারী গতিবেগ স্পন্দমান হয়ে উঠেছে তাতে এর অভিনেয়তা গুণ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না।

যুদ্ধের ভবিষ্যৎফল·····দারার তারা নেমে যাচ্ছে।—সে যুগে ফলিত জ্যোতিষের প্রভাব সম্পর্কে স্যর যতুনাথ লিখেছেন, 'All classes alike were sunk in the densest superstition. Astrology governed every act of life among rich and poor alike.'

সপ্তম দৃশ্য

জাহানারার শেষ উক্তিতে যে অতি নাটকীয়তা প্রকাশমান তা উপেক্ষা করলে এ দৃশ্যের নাট্যসাফল্য সুনির্দিষ্ট। মহম্মদ স্থলতান প্রশংসনীয় সৌজন্য রক্ষা করে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করেছে, সাজাহানকে বন্দী করেছে। মহম্মদকে রাজমুকুটের বিনিময়ে একবার মাত্র দুর্গের বাইরে যাবার স্বাধীনতা প্রার্থনা করে সাজাহান ব্যর্থ হয়েছেন। বলা বাহুল্য, সাজাহান-মহম্মদের সংলাপমূলক এই দৃশ্যটি অনৈতিহাসিক।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না······তরবারি খুলে? একি!—King Lear নাটকের প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের Lear-এর উক্তি তুলনীয় :—

Does any here know me ?—This is not Lear :
Does Lear walk thus ? speak thus ? Where are his eyes ?
Either his notion weakens, his discernings
Are lethargied—Ha ! walking ? 'tis not so.—
Who is it that can tell me who I am ?

একি কন্যা!····· কি হয়েছে মা ?—মর্মাঘাতে সাজাহানের বাস্তবতা বোধ যে বিলুপ্তপ্রায় হয়েছে এ উক্তি তারই সংকেত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভাবছিলাম জাঁহাপনা······সে গুলো বোধ হয় উড়তো।—মাছ জলে ডুবে থাকে বলে জেলে যখন জাল নিয়ে আসে তখন দেখতে পায় না। পাখীর দৃষ্টি রুদ্ধ নয়, দূর থেকে শিকারীকে সে দেখতে পায় এবং ডানা মেলে উড়ে পালাতে পারে। মোরাদ ঔরংজীবের জালে ধরা পড়তে চলেছে, দৃষ্টি রুদ্ধ বলে নিজের বিপদ বুঝতে পারছে না।

হাঁসের মত জানোয়ার···আবার আকাশে ওড়ে!—এ হাঁসটি ঔরংজীব, হাঁস জল স্থল ও আকাশ-পথ প্রয়োজন মত গ্রহণ বর্জন করে। ফকিরি নিয়ে মক্কায় যাওয়া, মোরাদের সঙ্গে সৌভ্রাত্র বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ও তার সঙ্গে শত্রু-সমুচিত ব্যবহার করা—এ সবই ঔরংজীবের প্রয়োজন দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

দয়াময় পা দু'টো······মাথা ঠিক রাখা শক্ত হয়। ঔরংজীবের সঙ্গে বুদ্ধির খেলা খেলতে যাওয়া মোরাদের পক্ষে চরম মূর্খত।। চিন্তা-

শক্তির নির্দেশে কর্মেন্দ্রিয় পা চলে থাকে, ঔরংজীবের দ্বারা বুদ্ধিহীন মোরাদ নিয়ন্ত্রিত হবে এইটাই স্বাভাবিক! তুলনীয়ঃ—

Fool. It a man's brains were in's heels, were't not in danger of kibes? [Kiug Lear, Act I, Sc. V]

দিলদার। ভাবছিলাম জাঁহাপনা, যে মাছগুলোর ডানা না থেকে যদি পাখা থাকতো তা হলে সেগুলো বোধ হয় উড়তো।

মোরাদ। আরে, মাছের যদি পাখা থাকতো, তা হলে সে ত পাখীই হত।

দিলদার। তা বটে, ঐটুকু আগে ভাবিনি। তাই গোলে পড়েছিলাম।

তুলনীয়—

Fool. The reason why the seven stars are not more than seven is a pretty reason.

Lear. Because they are not eight.

Fool. Yes, indeed: thou wouldst make a great fool. [Ibid]

তুমি কি কাজ করতে.........আর কিছু পারি না জাঁহাপনা।

তুলনীয়—

Lear. What services canst thou do?

Kent. I can keep honest counsel, ride, run, mar a curious tale in telling it; and deliver a plain message bluntly.

[Act I, Sc. IV]

ঔরংজীব। কে তুমি?

দিলদার। আমি একজন বেজায় পুরানো…চড়ুয়ের চেয়ে লম্পট।

Lear. What hast thou been ?

Edgar,…false of heart, light of ear, bloody of hand, hog in sloth, fox in stealth, wolf in greediness, dog in madness, lion in prey.

[Act III, Sc. IV]

দ্বিতীয় দৃশ্য

এই দৃশ্য থেকে বন্দী সাজাহানের অসহায় দশা দেখানো হয়েছে। এই অসহায়তার মধ্যেও তাঁর মনোজগতে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন বা মানস চলিষ্ণুতা চরিত্রটিতে যে প্রাণধর্মের সঞ্চার করেছে অভিনয় কালে তার স্পর্শ সহজেই রসজ্ঞ দর্শকের চিত্তে পৌছয়। সাজাহানের মুখের ভাষা নাটকের গৌরব, কিন্তু এই ভাষার চমৎকৃতি নয়, ভাবের গতি নাটকের ভাষাকে সজীব এবং অভিনয়কে প্রাণবান করে তোলে।

প্রথম দৃশ্যে দারার পরাজয়ের ফলে যে নিজের পরিণাম কি হবে সে বিষয়ে সাজাহানের চিন্তা নেই, শঙ্কা নেই। পরবর্তী দৃশ্যে তিনি বন্দী হয়েছেন। তখনও রাজমুকুটের বিনিময়ে ক্ষণিক স্বাধীনতা লাভ করে প্রজাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রভুভক্তির ফলে ঔরংজীবকে দমন করতে পারবেন এমন শিশু-সুলভ কল্পনা ও প্রয়াস তাঁকে সামাজিকগণের সহানুভূতির পাত্র করে তুলেছে। আলোচ্য দৃশ্যে ঔরংজীবের সিংহাসন আরোহণের সংবাদ পাওয়া গেছে। সাজাহানের কর্মোদ্যমের পরিপূর্ণ অবসান এই দৃশ্য থেকে লক্ষিত হয়। একদিন যে তিনি দয়ার্দ্র-হৃদয় সুশাসক ছিলেন এই অভিমানে এখনও তিনি প্রজার কৃতজ্ঞতা ও সমর্থনের ভরসা রাখেন মোহভঙ্গ এ দৃশ্যে এখন-ও ঘটেনি।

তৃতীয় দৃশ্য

মরুতাপ-তৃষ্ণাপীড়িত সপরিবার দারার দুরবস্থা ও চিত্তবিক্ষেপ এখানে নাট্যবস্তু রচনা করেছে। দারার প্রার্থনা ও গোরক্ষকরমণীর উক্তিতে অতিনাটকীয়তার আভাষ আছে। ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে মানবতার আলোকরেখা সঞ্চারে নাট্যকার এখানে ব্যাপৃত।

চতুর্থ দৃশ্য

সুজা-পিয়ারার পূর্ববর্তী দৃশ্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্য, বর্তমান দৃশ্যে পরিলক্ষ্যমাণ। প্রণয়-কৌতুকলীলার সব মাধুর্য ও সমস্ত দুর্বলতার মধ্যে এখানে নবীনত্ব শুধু এই যে, পিয়ারা-চরিত্রে দৃশ্যের অন্তভাগে আকস্মিকভাবে ভাব-গভীরতা দেখা দিয়েছে। উপরিভাগের লঘু চপল ঊর্মিভঙ্গে চকিতে স্থৈর্য ও প্রশান্তির ব্যাকুল স্পর্শসঞ্চার চরিত্রটিকে নোতুন আলোকবৃত্তের মধ্যভাগে স্থাপন করেছে। যে-ভাষায় সে তার অন্তরের আকুলতা প্রকাশ করেছে গদ্য বলে তাতে যদি অতিনাটকীয়তার সুর বাজে তা হলেও বলা যেতে পারে যে এর ভাবটা মেকি নয়, কাব্য ভাষায় এটা মানিয়ে যেত।

সুজার উত্তর যখন অনুকূল হল না তখন তার স্বগতোক্তিতে ব্যর্থসাধনার বেদনা ভাষা পেয়েছে।

পঞ্চম দৃশ্য

নাটকের মঞ্চ-সফল দৃশ্যগুলির অন্যতম আলোচ্য দৃশ্যে ঔরংজীব, জাহানারা এবং যশোবন্তের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রাজপুত বীরত্ব-গর্বের অতিনাটকীয় প্রকাশে রঙ্গমঞ্চ যখন সামাজিকদের শঙ্কামিশ্র কৌতূহলের আকর্ষণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে তখন মঞ্চাভিনয়ে অপরিমেয় বিস্ময় ও বিচিত্র

সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জাহানারার প্রবেশ ঘটেছে। পারস্পরিক সংলাপের সংঘর্ষে ঔরংজীবের শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে। উভয়ের সুদীর্ঘ ভাষণের মধ্য দিয়ে উভয়ের চরিত্রের অনাবিষ্কৃতপূর্ব কতকগুলি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাজাহানের সুশাসন, প্রজারঞ্জকতা, বর্তমান বন্দীদশা, ন্যায়-ধর্মের শোচনীয় অবমাননা অসূর্যম্পশ্যা সম্রাট-কন্যার আবেগকম্পিত উদাত্ত কণ্ঠে সভাগৃহে বর্ণিত হয়েছে। সভাসদ্‌গণের প্রভুভক্তির প্রশংসা, ঔরংজীবকে সিংহাসনে রাখা না-রাখা যে তাদেরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তারাই যে রাজশক্তি—এই গৌরবের সসম্ভ্রম আরোপ এবং সম্রাট কন্যার ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা ও অনবগুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশের নাটকীয় সম্মোহ একমুখী শক্তিতে সভাসদ্‌গণের ভাবাবেগের মর্মমূল সাজাহানের দিকে অবনমিত করেছে। যে প্রতিকূল বায়ুপ্রবাহের বলে সভাসদ্‌গণ মুহূর্তের ভাবাবেগ বিস্মৃত হয়ে ঔরংজীবের আজ্ঞার অনুবর্তী হয়েছে তার উপাদান বিচিত্র। জাহানারার যে ভাবাবেগ ছিল ঔরংজীবের বক্তৃতায়ও তা আছে কিন্তু দুইয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। জাহানারার আবেদন অতীতকে কেন্দ্র করে। যে-সাজাহান বৃদ্ধ, অথর্ব, রাজ্যশাসনবশ্মি দৃঢ় হস্তে ধারণ করতে অসমর্থ তাঁর অতীতের সুশাসন ও বর্তমান বন্দীদশা স্মরণ করে সমবেদনা প্রকাশ করা যেতে পারে, আত্মসমর্পণ করা চলে না। ঔরংজীব অতি-প্রত্যক্ষ, একান্ত-বাস্তব বর্তমানকে গুরুত্ব দিয়ে অ-মুসলমানোচিত মুসলমান দারার শাসনের কল্পিত চিত্রের ভয়াবহ অরাজকতার দিকে সভাগৃহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ জাহানারার আবেদন ন্যায়ধর্ম ও মানবধর্মের নামে। নীতি হিসাবে এর যতই মর্যাদা থাক, ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংকীর্ণ পরিসরের অনুভবগম্য বাস্তব-সীমার মধ্যে স্থান না পেলে মানুষের কল্পনায় গভীরভাবে রেখাপাত করবার ক্ষমতা এর নেই। দূর গগনচারী ইন্দ্রধনু-রাগরঞ্জিত অভ্রবৎ এই নীতি দারা নামক একটি বিশেষ মানুষের অপশাসনের কাছে নতি স্বীকার

করে শেষ পর্যন্ত শিশুর হাতের কাটা-রংচঙে ঘুড়ির মত ধূলিশয্যা লাভ করেছে।

জাহানারার যা কিছু চেষ্টা, তার বৃদ্ধ পিতার জন্য, নিজের জন্য নয়। ঔরংজীবের প্রয়াসও যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, রাজ্যলোভ বা বিষয়মোহ যে তার নেই, সে যে মক্কা-যাত্রার চিন্তা স্বপ্ন ধ্যান অবলম্বন করেই সিংহাসনে উপবেশন করেছে সে-কথা বক্তৃতার অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। স্থূলদর্শী মুসলমান সভাসদ্‌বর্গের মনে স্বভাবতঃই এর প্রভাব জাহানারার নিঃস্বার্থ প্রয়াসের পরিমিত উল্লেখের চেয়ে অনেক বেশী হয়েছে।

হিন্দুসেনাপতি জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহের পৃথক পৃথক প্রশস্তি মূলক উল্লেখে ঔরংজীব রাজসভার হিন্দু অংশকেও আপন পক্ষে আকর্ষণ করেছে। জাহানারার ভাষণে নির্বিশেষ সাধারণের প্রতি আবেদন ছিল, ব্যক্তির অভিমান জাগিয়ে তোলবার মত কিছু ছিল না।

ঔরংজীবের বাচনভঙ্গীতে নাট্যক্রিয়ার যোগসাধনের ফলে গুরুত্ব এবং বিশ্বসনীয়তা এসেছে। সিংহাসনের পদতলে রাজমুকুট খুলে রাখা, মক্কাযাত্রার জন্য প্রস্তুতির নির্দেশদান, বক্তৃতায় মাঝে মাঝে ছেদের অবকাশে শ্রোতাদের মুখমণ্ডলে প্রতিক্রিয়ার সন্ধান, দুরূহ রাজ্যভার বহনকল্পে পরস্পর-বিদ্বেষী সভাসদ্‌গণকে আহ্বান তার অনুকূলে সভাসদ্‌বর্গের অভিপ্রায়কে চালিত করেছে। যে-ঔরংজীবকে পূর্ববর্তী দৃশ্যগুলিতে নাট্যকার মঞ্চস্থ করেছেন সে স্বল্পভাষী, কর্মতৎপর, চক্রান্তকারী, তীক্ষ্ণধী। আলোচ্য দৃশ্যে প্রয়োজনের অনুরোধে সে যে বাক্যবিন্যাসে অপটু নয়, লোকচরিত্রে সে যে অভিজ্ঞ এবং সে যে কতদূর অভিনয়-দক্ষ এই বিষয়ে সামাজিকদের তার সম্পর্কে নোতুন ধারণার অবকাশ মিলেছে।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি···কোন অভাব হবে না—এই দৃশ্যেই ঔরংজীবের একটি উক্তিতে আছে, 'পিতা পূর্ববৎই সুখে স্বচ্ছন্দে আগ্রার

প্রাসাদে আছেন।' তা যে তিনি ছিলেন না এটাই প্রকৃত সত্য। সাজাহানের মৃত্যুর প্রায় একমাস পরে জাহানারার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় অবশ্য জাহানারার সঙ্গে ঔরংজীব শোভন ও কোমল ব্যবহার করেন। ১৬৮১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জাহানারার মৃত্যু হয়। সম্রাটের অন্তঃপুরে জাহানারার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আমরণ অক্ষুণ্ণ ছিল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঔরংজীবের শিবিরে খিজুয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে দৃশ্য। এ যুদ্ধে যশোবন্ত সিংহ যে ভূমিকা নিয়েছিল সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। যশোবন্তের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ক্ষেত্র রচনা হয়েছে আলোচ্য দৃশ্যে। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে অথবা বর্তমান দৃশ্যে যশোবন্তের যে থিয়েটারি ভাষা ও তরবারি আস্ফালন প্রকাশ পেয়েছে ঔরংজীবের সুরক্ষিত রাজসভায় বা সৈন্য-শিবিরে ইতিহাসের যশোবন্ত সিংহের যে স্বপ্নেরও অতীত ছিল একথা নাট্যকার খেয়াল রাখবার দরকার বোধ করেননি।

দৃশ্যারম্ভে ঔরংজীবের স্বগতোক্তিটি নাটকীয় তাৎপর্যে চিহ্নিত এবং অভিনয়-কুশল নটের লোভের সামগ্রী।

দ্বিতীয় দৃশ্য

খিজুয়া যুদ্ধের জন্য সুজার প্রস্তুতি বর্তমান দৃশ্যের উপজীব্য বিষয়। সুজার যুদ্ধ-মন্ত্রণা পিয়ারার সঙ্গে, তাঁর মন্ত্রী পিয়ারা। স্বভাবতঃই

যুদ্ধ-মন্ত্রণা অবিলম্বে প্রণয়-গুঞ্জনে পরিণত হয়, কৌতুক রঙ্গ পরিহাস রসিকতার প্লাবনে সামান্য একটা যুদ্ধের তুচ্ছ চিন্তা-ভাবনা তৃণখণ্ডের মত ভেসে যায়। বর্তমান দৃশ্যেও তার ব্যতিক্রম নেই।

তৃতীয় দৃশ্য

পরাস্ত পলায়িত দারার জীবনের যে অধ্যায়টি এখানে রূপ পেয়েছে তাতে পারিবারিক জীবনের দুর্দশাটা বড়ো হয়ে উঠেছে। মহনীয়তার যে আরোপের ফলে আগ্রার সিংহাসনের মনোনীত উত্তরাধিকারী ভারত সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বহুবর্ণ আলোকচ্ছটায় মণ্ডিত হয়ে দুর্দশার মুহূর্তে দর্শকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলবে বর্তমান দৃশ্যে অথবা অন্য কোন দৃশ্যেই তার সন্ধান পাওয়া যায় না।

সাহানাবাজের সহায়তার ফলেই যে দারা নোতুন যুদ্ধোদ্যমে লিপ্ত হতে পেরেছিল এটা ঐতিহাসিক সত্য কিন্তু সাহানাবাজের চরিত্রের প্রভুভক্তি ও ন্যায়বোধ নাট্যকারের আরোপের ফল। বস্তুতঃ সাহানাবাজের ঔরংজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ রাজনৈতিক, ন্যায়বোধ প্রণোদিত নয়।

চতুর্থ দৃশ্য

সোলেমান কাশ্মীররাজের আশ্রয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে, ভূমিকায় তা বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। যে-ব্যক্তিগত কারণ এই দৃশ্যে নির্দিষ্ট হয়েছে তা নাট্যকারের মৌলিক কল্পনার ফল। নাট্যব্যাপারের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠেনি এমন নীতিগর্ভ বক্তৃতা ব্যবহার সোলেমান চরিত্রটিকে দুর্বল করেছে। নাট্যকারের অনাট্যোচিত প্রচার-প্রবণতা এর জন্য দায়ী।

পঞ্চম দৃশ্য

সাহানাবাজের মুখে শোনা গেছে যে যশোবন্ত সিংহ দারাকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। বর্তমান দৃশ্যে যশোবন্ত সিংহকে নিজের পক্ষে আকর্ষণ করবার চেষ্টায় ঔরংজীব কূটবুদ্ধি জয়সিংহকে নিয়োগ করছে।

ঔরংজীবের সঙ্গে সংলাপে মহম্মদ সুলতানের যে ছবিটা ফুটে উঠেছে তার সবটা রং নাট্যকারের মৌলিক কল্পনার দান। পিতৃভক্তি ও নীতিবোধের যে অভাব সাজাহানের তৃতীয় পুত্রটির চরিত্রে অতি-প্রকট তার নিজের পুত্রের মধ্যে সেই দুটি গুণের উপস্থাপনার দ্বারা উভয় চরিত্রের বৈপরীত্য সংস্থানের চেষ্টা এখানে সহজেই ধরা পড়ে। দৃশ্যটিতে ঔরংজীবের নীতিগত পরাজয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু ঔরংজীব-মহম্মদের সংলাপ অংশ একান্ত অতিনাটকীয় এবং নাট্যকারের নীতিবাদী মনের প্রচার-প্রবণতার প্রতিসরণ এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যে-মহম্মদকে অনতিবিলম্বে সুজার শিবিরে দেখা যাবে ঔরংজীবের সঙ্গে তার বিরোধের ভূমিকা আলোচ্য দৃশ্যে নাট্যকার রচনা এবং সামাজিকগণকে ভাবী ঘটনার জন্য প্রস্তুত করেছেন।

আমি কিন্তু প্রধান আশঙ্কা···কম কথা কয়।—ক্ষীণদেহ ও চিন্তা-প্রবণ ক্যাসিয়াসের সম্পর্কে সীজারের (জুলিয়াস সীজার নাটকে) সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়েছিল, এবং সে সন্দেহ মিথ্যা হয়নি। ঔরংজীব মহম্মদকে সন্দেহ করেছে তার চেহারা দেখে এবং স্বল্পভাষিতা লক্ষ্য করে। তার সন্দেহও মিথ্যা হয়নি। সীজার ও ঔরংজীবের সংলাপের এই অংশ সাম-ঞ্জস্যপূর্ণ। সীজারের ক্যাসিয়াস সম্পর্কে উক্তির অবশিষ্ট অংশ এই নাটকের ঔরংজীবের সঙ্গে অনেকটা মেলে।

Yond Cassius has a lean and hungry look ;
He thinks too much : such men are dangerous ;
... ...
He reads much ;
He is a great observer, and he looks
Quite through the deeds of men : he loves no plays,
As thou dost Antony ; he hears no music :
Seldom he smiles, and smiles in such a sort
As if he mock'd himself, and scorn'd his spirit
That could be mov'd to smile at anything.
Such men as he be never at heart's ease
Whiles they behold greater than themselves ;
And therefore are they very dangerous.

অবশ্য মহম্মদের ও ক্যাসিয়াসের প্রকৃতি ভিন্ন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

জয়সিংহর প্রবোচনায় যশোবন্ত সিংহ দারার পক্ষ ত্যাগ করে ঔরংজীবের পক্ষে যোগদান করতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। ঔরংজীবের অভিনয়ে বিশ্বাস করেই যে সে ঔরংজীবের পক্ষে প্রথমতঃ খিজুয়া যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এটুকু যশোবন্ত সিংহের বিশ্বাসঘাতকতা প্রচ্ছন্ন করবার জন্য নাট্যকার কর্তৃক তার চরিত্রের সমুন্নয়নের প্রয়াসের ফল।

রাজপুতদের আত্মবিরোধ যে ঔরংজীবের শক্তিকে দৃঢ় করেছিল এই ঐতিহাসিক সত্য ঔরংজীবের বিরুদ্ধে মাড়ওয়ার, বিকানীর ও মেবারের সম্মিলিত ত্রিশক্তির প্রতিরোধ প্রস্তাব এবং জয়সিংহ কর্তৃক তার প্রত্যাখ্যানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এ জাতীয় প্রস্তাবে যশোবন্ত চরিত্রটি

জয়সিংহের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু জয়সিংহ যেন যশোবন্ত অপেক্ষা অনেক বেশী বাস্তব। সংসার জয়সিংহের কাছে একটা হাট। বস্তুতঃ এই সুবিধাবাদী বেনে-বুদ্ধি সে যুগে উত্তরাধিকার নিয়ে বিবদমান রাজপুতদের পক্ষাবলম্বী সৈন্য-সেনাপতিদের একমাত্র কর্মনিয়ন্তা ছিল, কোন ন্যায়-নীতি বা বিবেকবুদ্ধি নয়।

চেয়ে দেখ—ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরিশ্রেণী······আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে! প্রকৃতি, স্বদেশ এবং অধ্যাত্মবোধের একাত্ম সম্মিলন যে উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের মধ্যে কাব্যোচিত ভাষায় এখানে প্রকাশমান তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটক থেকে নিয়ে উদাহৃত হচ্ছে। মৈত্রী-করুণা-সেবার আদর্শ নিয়ে যে নবধর্ম মালিনীর অন্তরে আবির্ভূত হয়েছে তার মূলে প্রকৃতি থেকে সঞ্চারিত এক অনন্য-সাধারণ উপলব্ধি। অথচ এ অনুভূতি অধ্যাত্মানুভূতির সগোত্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

দেখো দেখো নীলাম্বরে
মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ পেয়েছে প্রকাশ।
কী বৃহৎ লোকালয়, কী শান্ত আকাশ—
এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে—ওই রাজপথ,
ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির—
স্তব্ধচ্ছায়া তরুরাজি—দূরে নদীতীর,
বাজিছে পূজার ঘণ্টা। আশ্চর্য পুলকে
পূরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে।

নিশ্চয় মস্তিষ্কের কোন রোগ আছে!—এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র নিমেষে যশোবন্ত সিংহের মধ্যে যে সুস্থ স্বাভাবিক বস্তু আমরা আশা করতে পারি তাকে প্রকাশ করেছে এবং

রোম্যাণ্টিক অনুভূতির সম্পর্কে যে ভাষ্য রচনা করেছে নাট্যোচিত ভাবসংঘাত এবং চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশের ফলে তা একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কপটপত্র রচনায় ঔরংজীব যে সিদ্ধহস্ত ছিল এই ঐতিহাসিক সত্যের উপর ভিত্তি করে ফকিরবেশী দিলদারকে ঔরংজীবের পত্রবাহী করে বর্তমান দৃশ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে ভাষায় ও যে সুরে পত্রবাহক সম্রাট সাজাহানের পুত্রের সঙ্গে কথা বলেছে নেহাৎ নাটকের চরিত্র বলেই তাতে তার গর্দান যায় নি। ইতিহাসের সুজা আর যাই হোক নির্বোধ ছিল না। এ বিষয়ে পিয়ারার মন্তব্য, 'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গিয়েছ—ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে! ছেলে ধরতে পার না, কেউটে ধরতে যাও।' দিলদারের চাতুরী বড় বেশী স্বচ্ছ কিন্তু নাটকের সুজাকে নাট্যকার এতেই ভুলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জহরৎ সিপারকে গুপ্তহত্যায় প্ররোচিত করছে, কিন্তু সিপার নারাজ। কাপুরুষ বলে জহরৎ তাকে ধিক্কার দিলে তার প্রত্যুক্তি, 'আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার পার্শ্বে হস্তিপৃষ্ঠে বসে যুদ্ধ করেছি। প্রাণের ভয় করি না, কিন্তু হত্যা করব না।' সিপার যে হাতীর পিঠে তার পিতার পাশে যুদ্ধ করেছে এটা ইতিহাস সমর্থিত সত্য, অতএব বালক

বলে কেউ তাকে সন্দেহ করবে না জহরতের এমন আশ্বাস ঠিক নির্ভর-যোগ্য নয়। দারার সঙ্গে সিপারকে যখন বন্দী করা হয় তখন তার বয়স ১৪ বৎসর। সিংহাসনের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানের পর ঔরংজীব আর বৃথা রক্তপাত করেনি। পরবর্তী কালে ঔরংজীব সিপারের সঙ্গে স্বীয় কন্যা জুবদৎ উন্নিসার বিবাহ দিয়েছিল।

সিপারকে নাট্যকার অনেক জায়গায় একেবারেই শিশু করে রেখেছেন। এই অসামঞ্জস্য সমর্থনযোগ্য নয়।

তৃতীয় দৃশ্য

নাদিরার মৃত্যু ও জিহন খাঁর (মালিক জিওন) বিশ্বাসঘাতকতা এই দৃশ্যের উপজীব্য বিষয়। ইতিহাস বলে, দারার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ এই লোকটির কাছে আশ্রয় নেবার সঙ্কল্প থেকে বিরত হবার জন্য দারাকে পরামর্শ দিয়েছিল। আপন নির্বুদ্ধিতার ফলে দারা সে পরামর্শে কর্ণপাত করেনি। নাটকে জিহন খাঁ সম্পর্কে নাদিরার অবিশ্বাস প্রকাশ পায় নি, সিপার ও দারার সন্দেহের আভাস পরবর্তী ঘটনার ভূমিকা রচনা ও মৃদু কৌতূহলোদ্বেগ সৃষ্টি করেছে মাত্র।

বন্দী হবার মুহূর্তে দারার মুখে একটি বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে। এ বক্তৃতা সমগ্রভাবে না হলেও আংশিকভাবে থিয়েটারি। 'সভ্যতার আলোকে ধর্মের অন্ধকার সরে গিয়েছে। সে ধর্ম যা কিছু আছে এখন বোধ হয় কৃষকের কুটিরে ভীল কোল মুণ্ডাদের অসভ্যতার মধ্যে।'— এখানে গদ্যভাষায় যা বলা হয়েছে তা সংস্কৃত নাটকের চরিত্র অনুষ্টুভ ছন্দে বলত এবং যাত্রার চরিত্র একটি বিশুদ্ধ তাল-লয়-সমন্বিত সঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশ করত। ইতিহাসের দারা এমন দার্শনিকোচিতভাবে আত্মসমর্পণ করে নি, তাকে বন্দী করতে বল প্রয়োগ করতে হয়েছে। এমন কি কারাকক্ষে যখন তাকে হত্যা করা হয় সে মুহূর্তেও সে প্রাণপণে

আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। একখানা ছোট কলমকাটা ছুরি সে গোপনে নিজের কাছে রেখেছিল, সশস্ত্র ঘাতকগণের সঙ্গে এই অতি দুর্বল প্রহরণ নিয়ে সে আত্মরক্ষাকল্পে শেষ যুদ্ধ করেছে।

নাদিরার মৃত্যু এবং তার অব্যবহিত পরবর্তী মুহূর্তে মৃতদেহের সম্মুখেই দারার বন্দী হওয়া ঐতিহাসিক সত্য নয়। ঘটনাসংস্থান ব্যাপারে আলোচ্য দৃশ্যে এ বিষয়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করে নাট্যকার জিহন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতাকে অধিকতর ঘৃণার্হ করে তুলেছেন।

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বিধান্বিত যশোবন্ত সিংহ শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে ঔরংজীবের পক্ষে যোগদান করেছিল। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সে-সংবাদ যশোবন্তের নিজের মুখে শোনা যাবে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণ ব্যতীত অপর যে একটি কারণের, ইতিহাস তাকে প্রকাশ না করলেও, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটকের রচয়িতারা সন্ধান রাখেন তেমন একটি কারণ মহামায়ার সঙ্গে সংলাপে প্রকাশ পাচ্ছে। অতি-নীতিবাদিনী অভিভাবিকা-স্বরূপিণী পত্নীর উচ্চগ্রামে বাঁধা সুরে ন্যায়-নীতি-দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত বাক্য যশোবন্তসিংহ-নামা ভদ্রলোকটির জীবন অসহ করে তুলেছে এবং বাক্যের প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে যশোবন্ত তার কাজ দিয়ে স্বামীর প্রতিবাদ জানিয়েছে। ঔরংজীবের পক্ষে যোগদান করে সে মহামায়াকে আঘাত করেছে।

উৎসমুখ থেকে সমুদ্রসঙ্গম পর্যন্ত মহানদীর ধারা অনুসরণ করতে গেলে পথে যে ক্ষীণকায়া শাখানদী তার বল হরণ করেছে এবং যে-উপনদী তার পুষ্টিবিধান করেছে সংযোগস্থলে তাদের হিসেব নেওয়া যদি-বা চলে সে শাখানদী ও উপনদীগুলির পৃথক গতিপথ স্বতন্ত্রভাবে চোখে পড়ে না। মূল উপজীব্য নাট্যব্যাপারের সঙ্গে যশোবন্ত সিংহের কোথায় যোগ

নাটকমধ্যে তার নির্দেশের প্রয়োজন হয়ত ছিল। কিন্তু মহামায়া-যশোবন্তের উপধারার আত্যন্তিক অনুসরণ মূল ধারা থেকে সামাজিক-মানসকে অহেতুক ভাবে দীর্ঘ কাল বিক্ষিপ্ত করেছে। গঠন-শিল্পের এই শৈথিল্য সম্পর্কে ভূমিকায় আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম দৃশ্য

দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের পরে এই দৃশ্যে সাজাহানকে আবার দেখা যাচ্ছে। এই অন্তর্বর্তী কালে পুরো তেরটা দৃশ্যের অভিনয় হয়ে গেছে। সাজাহানের স্মৃতি সামাজিক চিত্তে এতক্ষণে ঝাপ্‌সা হয়ে আসবার কথা। (ভূমিকা অংশে মঞ্চে সাজাহানের এই সুদীর্ঘকাল অনুপস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

দারার বন্দীদশা ও হত্যা সম্ভাবনা সম্পর্কে চিন্তিত বিভ্রান্ত-মস্তিষ্ক নিরুপায় সাজাহানের, 'দেই লাফ। দেব লাফ।' অভিনয়-নিপুণ নটের লোভের সামগ্রী।

এই শীর্ণ দুর্বল জরাজীর্ণ···আমার নিজের পুত্র—ওঃ!—যে সাজাহা-নের জীবনের প্রথমভাগ প্রার্থনায়, ধর্মকথাশ্রবণে এবং গভীর আত্মসমর্পণে কেটেছিল এই আর্তরব তাঁরই স্মারক। প্রথম দৃশ্যের আত্মপ্রত্যয় এখানে শেষ ধূলিশয্যা বিস্তার করেছে।

জাহান্যরা···যেন পুত্র না হয়।—ভূমিকা অংশের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ দৃশ্য

আলোচ্য দৃশ্যে ঔরংজীবের চরিত্রের যে অংশ প্রকাশ পাচ্ছে সে বিষয়ে এবং এ দৃশ্যের নাটকীয়তা গুণ সম্পর্কে ভূমিকায় আলোচনা করা হয়েছে

ঔরংজীবের সুবিধাবাদী বিবেকবুদ্ধিকে ধিক্কার দেবার মত প্রগল্‌ভতা

দিলদার কেমন করে আয়ত্ত করল সামাজিকদের মনে এই প্রশ্ন আসে। দ্বিতীয়তঃ ইতিহাসের ঔরংজীব রওশনারা শায়েস্তা খাঁ প্রভৃতির পরামর্শে মোল্লাদের বিধান দণ্ডাজ্ঞায় সমর্থন জানিয়েছিল। দারার হত্যা অপরের প্ররোচনা ও সমর্থনের উপরে যে কিছু পরিমাণ নির্ভর করেছিল এই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর বর্তমান দৃশ্যে ঔরংজীবের নাট্যসম্মত দ্বিধা গড়ে উঠেছে। ইতিহাসের ঔরংজীব বোধ হয় বিশেষ বিবেক-দংশন অনুভব করে নি। দারার ছিন্নমুণ্ড দর্শনে তার মুখমণ্ডলে এবং ক্রিয়াকলাপে যে পৈশাচিক উল্লাস প্রকাশ পেয়েছিল ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। দারার শব নিয়ে দিল্লীতে শোভাযাত্রা এ বিষয়ে অন্যতর প্রমাণ।

সপ্তম দৃশ্য

বর্তমান দৃশ্যে দারার হত্যা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুবরাজ দারা যে আত্মস্থ থাকতে পারেনি, ভয়াহত পশুর মত চীৎকার করেছে, বিলাপ করেছে, ইতিহাসে তার বর্ণনা রয়েছে। বাঁচবার হাস্যকর প্রয়াসে কলম-কাটা একখানা ছোট ছুরি সে ব্যবহার করেছিল। সিপারকে তার বুক থেকে সবলে ঘাতকেরা ছিন্ন করে নিয়েছে এবং মৃত্যুভীত পশুর মত চীৎকাররত দারার দেহে ঘাতক অস্ত্রাঘাত করেছে। পরম করুণ নাট্যকার যুবরাজকে চিত্তের এই দীনতা থেকে রক্ষা করেছেন ইতিহাসের উলঙ্গ সত্যের উপর একখানি অনতিস্বচ্ছ আবরণ বিস্তার করে। তথাপি চরিত্রের এই সমুন্নয়ন প্রয়াসেও করুণরসের আতিশয্য কোন ট্র্যাজেডির গভীর মহিমা দারার চরিত্রে সঞ্চারিত হয়নি। দিলদার যাকে বলেছে, 'এ একটা ধ্বংস—'বিরাট, পবিত্র, মহিমময়!' তা নাট্যকারের কল্পনায় হয়ত ছিল, প্রকাশের গৌরব তার ভাগ্যে জোটেনি।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত দারাকে পলায়নের সুযোগ দিয়ে দিলদার তার স্থানে নিজে রাজরোষের ভাগী হতে চেয়েছে। পরার্থে আত্মত্যাগ সবদেশে ও সব কালেই অভিনন্দিত হয়েছে সত্য কিন্তু এই আত্মত্যাগের ইচ্ছার কার্যকারণ সম্পর্কের মত একটা জোরালো বিশ্বাসযোগ্য হেতু প্রদর্শন না করলে সাধারণ মানুষের জীবনে তা সঙ্গতিহীন উদ্ভট ব্যাপার হয়ে ওঠে। দিলদার-এর আত্মত্যাগবাসনা যে কেন এমন উদগ্র হয়ে উঠল তার কোন বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা নেই।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চতুর্থ অঙ্কের অবসানের সঙ্গে ঔরংজীবের সিংহাসন নিষ্কণ্টক হয়েছে। গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, নাটকের নাট্যব্যাপারের যে অংশটা ঘটনাগত তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বর্তমান দৃশ্যের প্রথমেই যশোবন্ত সিংহের মুখে শোনা যাচ্ছে যে 'ছলেই হোক বা শক্তিবলেই হোক' ঔরংজীব 'সিংহাসন অধিকার করে সাম্রাজ্যে একটা শান্তিস্থাপন করেছেন।' তবে এখনও পুরো একটা অঙ্কের প্রয়োজন কোথায়? এই অঙ্কের কাজ শুধু পূর্ববর্তী অঙ্কগুলির অবলম্বনহীন ঘটনাসূত্রগুলিকে চরম পরিণাম দান করা এবং বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত সামাজিক মানসে প্রশান্তি আনয়ন। দারার ভাগ্য তার শেষ পরিণাম লাভ করেছে। সুজা মোরাদ প্রভৃতির সম্পর্কেও একটা সমাপ্তিরেখা নির্দেশ করা চাই। এই সমস্ত আঘাত-সংঘাত যেখানে একমুখী হয়ে হৃৎপিণ্ডর বিদীর্ণ করেছে সেখানে অন্ততঃ একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তির প্রলেপের প্রয়োজন। সামাজিকগণ সেই অপেক্ষায়, সাজাহানের পরিণাম সন্দর্শনের অপেক্ষায় নাট্যকারের মুখ চেয়ে আছেন। অকরুণ ইতিহাস সাজাহানকে কোন আশ্বাস দেয় নি। সাহিত্যিকের স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য এই ক্ষতিপূরণের ভার গ্রহণ করেছে।

বলা বাহুল্য সোলেমানের মুখে যে ভর্ৎসনাবাক্য এই দৃশ্যে শোনা যাচ্ছে ইতিহাসে সে অতিনাটকীয়তার স্থান ছিল না এবং জহরৎ উন্নিসার এই গুপ্তহত্যার প্রয়াস একান্ত কাল্পনিক।

তৃতীয় দৃশ্য

বর্তমান দৃশ্যের ঘটনাকাল—রাত্রি। ঝটিকা বৃষ্টি বজ্র ও বিদ্যুৎ-এর সমন্বয়ে রাত্রি বিভীষিকাময়ী। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই রাত্রিতে অর্ধোন্মত্ত সাজাহানের হাহাকার King Lear নাটকে রাত্রিকালে প্রান্তর মধ্যে দুর্যোগের রাত্রিতে লিয়ারের চিত্তক্ষোভ স্মরণ করিয়ে দেয়, 'দে বেটারা। খুব দে, খুব দে' ইত্যাদি সুদীর্ঘ উক্তিটির সঙ্গে এবং এই দৃশ্যের শেষ উক্তিটির সঙ্গে King Lear নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম দুটি উক্তি এক সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। King Lear-এর উক্তি দুটি পর পর উদ্ধৃত হচ্ছে :—

Blow, winds. and crack your cheeks! rage! blow!
You cataracts and hurricanoes, spout
Till you have 'drench'd our steeples, drowned the cocks!
You sulphurous and thought-executing fires,
Vaunt couriers of oak-cleaving thunderbolts,
Singe my white head! And thou all-shaking thunder
Strike flat the thick rotundity of the world!
Crack nature's moulds, all germens spill at once,
That make ingrateful man!

* * *

Rumble thy bellyful! Spit! fire! spout! rain!
Nor rain, wind. thunder, fire are my daughters:
I tax not you, you elements, with unkindness;
I never gave you kingdom, call'd you children;
You owe me no subscription: then let fall

Your horrible pleasure ; here I stand, your slave,
A poor, infirm, weak, and despis'd old man :—
But I call you servile ministers,
That will with two pernicious daughters join
Your high-engender'd battles 'gainst a head
So old and white as this. O ! O ! 'tis foul !

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। মনে করবার প্রয়োজন নেই যে সাজাহান ও কিং লিয়ার চরিত্রের সামঞ্জস্য আছে বলে সাজাহান চরিত্র কিং লিয়ারের ছাঁচে ঢালা। উভয় চরিত্রে সামঞ্জস্য যতটুকু তার চেয়ে বৈসাদৃশ্য অনেক বেশি প্রবল।